৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ ☐ আনন্দবাজার প্রকাশন ☐ চার টাকা

আনন্দমেলা

প্রচ্ছদকাহিনী
ড্র্যাকুলার মুখোমুখি
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প
হিমানীশ গোস্বামীর উপন্যাস
আনন্দ বাগচীর কাব্য-কাহিনী
বিজ্ঞান ☐ কমিকস
কুইজ ☐ খেলাধুলো

ত্বকে আসুক চির বসন্ত

কি শীতে...

কি গ্রীষ্মে...

কি বর্ষায়...

বোরো ক্যালেন্ডুলা অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম—সতেজ আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বকে'র সাথী এতে আছে প্রাকৃতিক উপাদান—ক্যালেন্ডুলা ও হাইড্রাসটিস ভেষজে'র উপকারী নির্য্যাস। বোরো ক্যালেন্ডুলা অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম—প্রতিকূল আবহাওয়ায় আপনার ত্বকে'র চিরকালীন সুরক্ষা। ঠোঁট ফাটা, ছোটো খাটো কাটা-ছড়া আর পোড়া'র ক্ষতকেও চটপট সারিয়ে তোলে। বোরো ক্যালেন্ডুলার ভেষজ পরশ, ত্বকে'র যত্ন—সারা বরষ।

বোরো ক্যালেন্ডুলা*
অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম

HL এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন

Mileage/HL/1-86

ধারাবাহিক উপন্যাস
ডোরাকাটা জামা
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ২৩
নীলমূর্তি রহস্য
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৬১
সম্পূর্ণ উপন্যাস
ভয়ংকর বাংলোয়
হিমানীশ গোস্বামী ৩০

প্রচ্ছদ কাহিনী
ড্র্যাকুলার মুখোমুখি
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০

সত্যিই ছিল ড্র্যাকুলা
নিল ও'ব্রায়েন ৫৫
ড্র্যাকুলা কমিকস ৫৭
অ্যাডভেঞ্চার
তিন দিকে জল, নীল জল
অরিন্দম দেবনাথ ৪৭
শার্লক হোমসের গল্প
গ্রিক দোভাষীর বিপদ
সার আর্থার কোনান ডয়েল ৬৪

গল্প
বটুকদাদার গল্প
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৮

সবুজ বেনারসি
কৃষ্ণা বসু ৭৯
টঙ্গোর ক্যালকেশিয়ান
শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৯০

পশ্চাৎপট
ফেব্রুয়ারি : শুদ্ধির মাস ৭

যত্তসব
ভূগোলের ভুল
তারাপদ রায় ৭৮
বিজ্ঞানবিচিত্রা
বিকল্প শক্তির প্রয়োজন বাড়ছে
প্রদীপচন্দ্র বসু ১৭

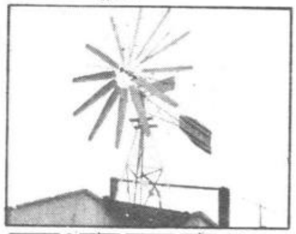

লেজেরও আছে অনেক কাজ ২৯

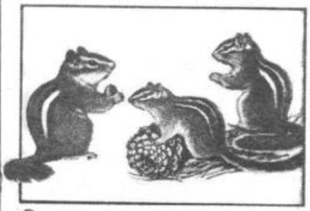

বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ৪৬
লেখাপড়া
সহজে ইংরেজি
প্রসাদ ৮২
অর্থ জানো
দেব-সেনাপতি ৮২
কাব্য-কাহিনী
পদ্মিনী-কাহিনী
আনন্দ বাগচী ১৪

খেলাধুলো
তবে কি বথামই 'গ্রেটেস্ট'
কৃশানু ভট্টাচার্য ৭০
লেন্ডল ও বেকারের বড় চ্যালেঞ্জ এখন ক্যাশ
মানস চক্রবর্তী ৭২

৩০০ উইকেট কে কীভাবে পেলেন
প্রদীপ সেন ৭৩
বিশ্ব টেবল টেনিসে এবার লড়াই হবে এশীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে
রতন চক্রবর্তী ৭৫
জানা-অজানা
বংশধারার গতির খোঁজখবর দেয় ফলের মাছি
সাধনা মুখোপাধ্যায় ৭৮

কমিক্‌স
স্পাইডারম্যান ২৭, টারজান ৬৭, টিনটিন ৬৮, রোভার্সের রয় ৭৬, স্টার ওঅরস ৮৭, গাবলু ৮৯
অন্যান্য আকর্ষণ
চিঠিচাপাটি ৪, কুইজ ৬, ডাকটিকিট ৪৫, ম্যাজিক ৪৫, দূরদর্শনে ৮১, ডাক্তারবাবু বলছেন ৮৩, ধাঁধা ৮৪, মজার খেলা ৮৪, হাসিখুশি ৮৪, আঁকিবুকি ৮৫, শব্দসন্ধান ৮৫, কিসের ফোটো ৮৫, যোগ-ব্যায়াম ৮৬, অনুষ্ঠান ৮৬, বইয়ের খবর ৯৪
প্রচ্ছদ
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আগামী সংখ্যায়

বিমল করের গল্প **'গোয়েন্দা-লেখক গুপ্তসভা'**
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস **'অবিশ্বাস্য'**
বিমল বসুর প্রচ্ছদকাহিনী **'মহাবিশ্বের রহস্য'**
পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গল্প **'রক্ত'**
কুইজ □ লেখাপড়া □ খেলাধুলো □ ডাকটিকিট

সম্পাদক : **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম চার টাকা।
বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ৩০ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা।

সম্পাদকের চিঠি

ক'টা দিন গেল বড় অস্থির,
এইবারে তবে বলি :
পুজো তো করেছ সরস্বতীর,
দিয়েছ তো অঞ্জলি,
এখন তা হলে কোনো কথা নয়
খাটুনি লাগাও কড়া,
ক্লাসে তারই জয় হবে নিশ্চয়
যে করবে লেখাপড়া ।

আমাদের সৌরপরিবার

'আমাদের সৌরপরিবার' প্রবন্ধে বলা হয়েছে, বিষুববৃত্তে পৃথিবীর ব্যাস ১২,৭৩৬ কিলোমিটার । কিন্তু অন্যত্র আর একজনের লেখায় জানতে পরছি পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস ১২,৭৫৬ কিলোমিটার ও ধ্রুবীয় ব্যাস ১২,৭১৪ কিলোমিটার । কোন্‌টা ঠিক ?
শনির অক্ষ-আবর্তন কাল বলা হয়েছে ১০ ঘণ্টা ১৪ মিনিট । কিন্তু এই সময়টা কি ১০ ঘণ্টা ৩৯·৪ মিনিট ?
অমলেন্দুবাবু লিখেছেন যে ইউরেনাসের নিজ অক্ষের চারদিকে একবার পাক খেতে সময় লাগে ১০ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট । কিন্তু বর্তমান হিসেবে ওই সময় সম্ভবত ১৬ ঘণ্টার কাছাকাছি ।
বৃহস্পতির উপগ্রহ গ্যানিমিড (ব্যাস—৫,২২০ কিঃমিঃ) সৌরজগতের বৃহত্তম উপগ্রহ । এর উল্লেখ সুলিখিত প্রবন্ধটিকে আরও স্বয়ংসম্পূর্ণ করত ।

প্রণবকুমার ভট্টাচার্য
চুঁচুড়া, হুগলি

লেখক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর :
সৌরজগতের দশম গ্রহ 'ভালক্যান'-এর কথা উল্লেখ করা হয়নি বলে কয়েকজন পাঠক অভিযোগ করেছেন । এ-সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানানো প্রয়োজন । প্রতিটি গ্রহ অন্য প্রতিটি গ্রহকে টানে ; কাজেই কোনও একটি গ্রহের চলার পথ হিসেব করতে হলে, সেই গ্রহের ওপরে অন্য সমস্ত গ্রহের টানও হিসেবে রাখা দরকার । যেমন, পৃথিবীর চলার পথের ওপরে বিশেষ রকমের টান পড়ে শুক্র, মঙ্গল, এমনকী বৃহস্পতির । বুধ গ্রহটিকে কিছুকাল পর্যবেক্ষণের পরে গণিতজ্ঞরা অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন যে, বুধের চলার পথ অঙ্কের হিসেব অনুযায়ী যা হওয়া উচিত, বাস্তবে কিন্তু তা নয় । বুধের চলার পথে একটু গরমিল থেকে যাচ্ছে । প্রখ্যাত ফরাসি গণিতজ্ঞ লেভেরিয়ার তখন এমন একটা তত্ত্বে উপনীত হলেন যে, নিশ্চয়ই বুধ ও সূর্যের মাঝখানে আর একটি অনাবিষ্কৃত গ্রহ আছে, যেটি হল সূর্যের নিকটতম গ্রহ । ১৮৫৯ সালের ২৬ মার্চ ফ্রান্সের এক শৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী লেসকার্বো সূর্যের উজ্জ্বল চাকতির ওপর দিয়ে একটা কালো বিন্দু পেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন । সাধারণত, পৃথিবীর ভেতরের দিকের গ্রহ বুধ বা শুক্র যখন সূর্যের ঠিক সামনে দিয়ে তাদের কক্ষপথ অতিক্রম করে, তখন সূর্যের উজ্জ্বল চাকতির গায়ে গ্রহটিকে দেখায় কালো একটি বিন্দুর মতো । একে বলা হয় সংক্রমণ (transit) । হিসেব করে দেখা গেল যে, তখন বুধ বা শুক্রের সংক্রমণ ঘটার কোনও কথা নয় । তখন লেসকার্বো বুঝতে পারলেন, তিনি সৌরজগতের নতুন একটি গ্রহ আবিষ্কার করে ফেলেছেন, আর এইটিই হল সূর্যের নিকটতম গ্রহ । সূর্যের সবচেয়ে কাছে বলে এই গ্রহটির সবচেয়ে উত্তপ্ত অবস্থায় থাকার কথা । তাই গ্রহের নাম রাখা হল ভালক্যান (vulcan) । ভালক্যান হলেন রোমানদের অগ্নিদেবতা । এরপরে বেশ কিছু বছর ধরে পৃথিবীর নানা স্থানের মানমন্দির থেকে শক্তিশালী দূরবিন দিয়ে এই নতুন গ্রহ ভালক্যান পর্যবেক্ষণের চেষ্টা চলে । কিন্তু কিছুতেই এই গ্রহের অস্তিত্ব কোনও পর্যবেক্ষণেই ধরা পড়ল না । তাই সৌরজগতে ভালক্যান নামে কোনও গ্রহ নেই, ওটি অতীতের একটি কাল্পনিক ধারণা মাত্র ।
কয়েকটি চিঠির বক্তব্য হল, সম্প্রতি সোভিয়েত দেশের বিজ্ঞানীরা প্লুটোর পরে আরও দুটি গ্রহ আবিষ্কার করেছেন, গ্রহ এক্স-ওয়ান এবং গ্রহ এক্স-টু । এ-সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এগুলো কিছু সংবাদপত্রের

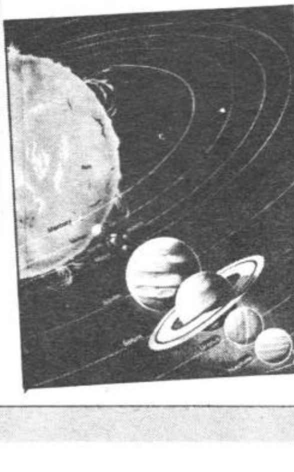

খবর । এখনও পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানের স্বীকৃত তত্ত্ব হিসেবে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়নি । জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সংস্থা হল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইউনিয়ন, ইংরেজিতে সংক্ষেপে যাকে বলা হয় I. A. U. —এই প্রতিষ্ঠান স্বীকার করে নিলে তবেই সেই তথ্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে । এখনও পর্যন্ত কোনও দশম গ্রহের আবিষ্কার এমন স্বীকৃতি পায়নি । তবে বলা যেতে পারে, সারা পৃথিবীতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখন প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন । সৌরজগতের দশম গ্রহ যদি থাকেই, তা হলে তাকে আবিষ্কার করার জন্যই তাঁদের এই উদ্যোগ ।
মনোমিত ভৌমিক তার চিঠিতে জানিয়েছে, সবচেয়ে ছোট গ্রহ বুধ । এ-কথাটা ভুল । বুধের ব্যাস ৪,৮৭৮ কিলোমিটার, আর শেষ পর্যন্ত প্লুটোর ব্যাস যা নির্ণয় করা হয়েছে, তা হল ৬,০০০ কিলোমিটারের সামান্য কম । প্লুটো সম্পর্কে এখনও অনেক তথ্য একেবারে সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি । তবে যা জানা গেছে তার থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, আয়তনের দিক থেকে বুধ ক্ষুদ্রতম গ্রহ ।
অমৃতা রায় ও অনিন্দিতা রায়ের চিঠিতে একটু বোঝার ভুল হয়েছে । নিবন্ধে স্পষ্ট বলা হয়েছে, বুধ তার নিজের অক্ষের চারদিকে পাক খায় ৫৯ দিনে, আর সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে বুধের সময় লাগে ৮৮ দিন ।
কয়েকটি চিঠির বক্তব্য হল, এই নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর অক্ষ তার কক্ষতলের ওপর ২৩·৫ ডিগ্রি কোণ করে হেলে আছে । কিন্তু অনেক বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, এই কোণ ৬৬·৫ ডিগ্রি । এ-সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানানো প্রয়োজন । পৃথিবী যদি হেলে না থেকে সোজা হয়ে তার কক্ষতলে পাক খেতে খেতে ঘুরে বেড়াত, তা হলে পৃথিবীর অক্ষ তার কক্ষতলের ওপর

সদাসর্বদা লম্ব হয়েই থাকত। কিন্তু হেলে থাকার দরুন, পৃথিবীর অক্ষ তার কক্ষতলের ওপর লম্বের সঙ্গে সদাসর্বদা ২৩·৫ ডিগ্রি কোণ করে হেলে আছে। আর এভাবে পৃথিবী সর্বদা পাক খেতে খেতে তার কক্ষতলের ওপর ঘুরে চলেছে। পৃথিবীর কক্ষতল তার অক্ষের সঙ্গে যে কোণ করে আছে, তার পরিমাপ হল ৬৬·৫ ডিগ্রি। কিন্তু সাধারণত জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোনও গ্রহের অক্ষ কতটুকু হেলে আছে বললে বুঝতে হবে, কক্ষতলের ওপর লম্বের সঙ্গে তার অক্ষ কত ডিগ্রি কোণ করে হেলে আছে। সেই মত অনুযায়ী পৃথিবীর অক্ষ হেলে আছে ২৩·৫ ডিগ্রি কোণ করে। তীর্থঙ্কর ভট্টাচার্যের চিঠিতে আছে : বিষুববৃত্তে পৃথিবীর ব্যাস ১২,৭৩৬ কিলোমিটার এ-তথ্য ভুল। আসলে ৫-এর জায়গায় ৩ হয়ে গেছে। সঠিক ব্যাস, যা সর্বাধুনিক মাপজোক থেকে জানা গেছে, তা হল ১২,৭৫৬ কিলোমিটার।
প্রণবকুমার ভট্টাচার্যের চিঠির উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ভয়েজার মহাকাশযান একেবারে শনির কাছে গিয়ে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে, তার থেকে সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়েছে যে, শনির অক্ষ-আবর্তন কাল হল ১০ ঘণ্টা ১৪ মিনিট। এই চিঠিতে ইউরেনাসের অক্ষ-আবর্তন কাল সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে জানাই, এই নিবন্ধটি যখন লেখা হয়েছিল তখনও ইউরেনাসকে নিয়ে ভয়েজারের পাঠানো তথ্য জানা সম্ভব হয়নি। ইউরেনাসের সঙ্গে ভয়েজার-২ মহাকাশযানের সাক্ষাৎকার ঘটে ১৯৮৬ সালের ২৪ জানুয়ারি এবং পৃথিবীতে ভয়েজারের পাঠানো তথ্য বিশ্লেষণ করে এখন জানা গেছে যে, ইউরেনাস তার নিজের অক্ষের চারদিকে একটি পাক খেতে সময় নেয় প্রায় ১৭ ঘণ্টা।
প্লুটোর কক্ষপথ খুব বেশি রকমের উপবৃত্তাকার। ফলে, এই গ্রহ যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে এসে পড়ে, তখন তাদের মধ্যে দূরত্ব হয় ৪৪২ কোটি কিলোমিটার ; আবার যখন সে সবচেয়ে দূরে চলে যায়, তখন দূরত্ব দাঁড়ায় ৭৩৮ কোটি কিলোমিটার। দূরত্বের এত পার্থক্যের জন্য প্লুটো যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে চলে আসে, তখন সে নেপচুনের কক্ষপথেরও ভেতরে চলে আসে। ফলে সেই সময় বেশ কয়েক বছর ধরে সে আর সবচেয়ে বাইরের গ্রহ হিসেবে থাকে না। ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এরকম চলবে। এর উল্লেখ কিন্তু স্পষ্টভাবে নিবন্ধে করা হয়েছে। তবে প্রতি ২৪৮ বছরের মধ্যে ২০ বছর বাদ দিলে, ২২৮ বছর ধরে প্লুটো সৌরজগতের সবচেয়ে বাইরের গ্রহ হিসেবে থাকে ; আর তাই প্লুটোকেই সূর্যের কাছ থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ হিসেবে ধরা হয়।
(এ সম্পর্কে আর কোনও চিঠি প্রকাশিত হবে না)

নায়েগ্রা : যেন শোনা গেল হাজার হাজার সিংহের গর্জন

আমি কলকাতার সেন্ট লরেন্স স্কুলের ছাত্র। গত জুন মাসে আমি আমার ভাই ও মায়ের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়াতে এসেছি। গত বছরে আমার বাবা এখানকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা প্রকল্পে, দু'বছরের জন্য গবেষণা করতে এসেছেন। গত জুলাই মাসে আমরা নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছিলাম। আমার সেই অভিজ্ঞতার ভাগ আনন্দমেলার পাঠক-পাঠিকাদের দিতে চাই। আমাদের বাস নায়েগ্রা নদীর তীর ধরে এগোতে লাগল। নদীটি লেক এরি এবং লেক অন্টারিওকে যোগ করেছে। পরে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থল নায়েগ্রা জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছলাম।
বাস থেকে নেমেই চোখে পড়ল প্রকৃতির অপূর্ব সৃষ্টি নায়েগ্রা জলপ্রপাত। এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জলপ্রপাত। লেক এরি, লেক অন্টারিও থেকে উঁচু। লেক এরি থেকে একটি নদী নায়েগ্রা জলপ্রপাতের একটু আগে দু' ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটি ধারা গেছে আমেরিকার দিক দিয়ে, অন্যটি গেছে কানাডায়। এই দুটি ধারাই জলপ্রপাত হয়ে নীচে নায়েগ্রা নদীতে পড়ে এগোতে এগোতে অবশেষে লেক অন্টারিওতে মিশেছে।
নায়েগ্রা জলপ্রপাতের জল নায়েগ্রা নদীতে যেখানে পড়ে, সেখানে জলকণার কুয়াশার সৃষ্টি হয়। সূর্যের কিরণ ওই জলকণার উপরে

প্রতিফলিত হয়ে রঙিন রামধনুর সৃষ্টি করেছে। নায়েগ্রা জলপ্রপাত দুটি অংশে বিভক্ত, একটি আমেরিকার দিকে, অন্যটি কানাডার দিকে। কানাডার অংশের জলপ্রপাতটির এবং আমেরিকার অংশের জলপ্রপাতটির মধ্যে দূরত্ব আছে। আমরা প্রথমে বোটে করে আমেরিকার অংশের জলপ্রপাতের কাছে গেলাম। এই জলপ্রপাতটি ৫৬ মিটার উপর থেকে নায়েগ্রা নদীতে পড়ে। এটি ৩২০ মিটার চওড়া। নায়েগ্রা জলপ্রপাতের মোট জলের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে দশ হাজার কিউবিক ফুট জল এই অংশের জলপ্রপাতের মাধ্যমে পড়ে। এটি দেখার পর বোটটি আমাদের সোজা কানাডার অংশের জলপ্রপাতের দিকে নিয়ে গেল এবং আমরা নায়েগ্রা জলপ্রপাতের বিশাল রূপ অনুভব করতে পারলাম। এইখানে জল অনেক বেশি পরিমাণে পড়ছিল এবং এখানে অনেক বেশি জলকণার কুয়াশারও সৃষ্টি হয়েছিল। জলের ধারা এখানে এত বেশি যে, জলকণার দ্বারা তৈরি কুয়াশাও খুব উঁচু। এত উঁচু যে, বহুদূর থেকে এই কুয়াশা দেখা যায়। জলকণার উপরে সূর্যের কিরণ পড়ায়, আমরা সেখানে পূর্ণ রামধনুর অপরূপ শোভা দেখতে পেলাম। জল-পতনের প্রচণ্ড শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল, হাজার হাজার সিংহ একসঙ্গে গর্জন করছে। কানাডার অংশের জলপ্রপাতের আকৃতি অনেকটা ঘোড়ার খুরের মতো। এই জলপ্রপাতটি ৬৭৫ মিটার চওড়া এবং ৫৪ মিটার উপর থেকে নদীতে পড়ে। নায়েগ্রা জলপ্রপাতের মোট জলের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে নব্বই হাজার কিউবিক ফুট জল এই জলপ্রপাতের মাধ্যমে পড়ে। নায়েগ্রা নদীতে যেখানে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের বিপুল জলরাশি পড়ে, সেখানে নদীর গভীরতা ৫৫ মিটার। 'নায়েগ্রা' কথাটি হল প্রাচীনকালের রেড ইন্ডিয়ানদের একটি শব্দ। কথাটির অর্থ, 'যে জলরাশির শব্দ বজ্রের মতো'। আমরা এই জলপ্রপাতের এত কাছে গিয়েছিলাম যে, জলপ্রপাতের উৎক্ষিপ্ত জলকণা আমাদের ভিজিয়ে দিয়েছিল। ফেরার পথে আমরা একটি কৃত্রিম খাল দেখেছিলাম। লেক এরির সঙ্গে লেক অন্টারিওর জলপথে যোগাযোগ রাখা অসম্ভব। কারণ নায়েগ্রা জলপ্রপাত দিয়ে জাহাজ চলাচল করতে পারে না। তাই লেক এরি এবং লেক অন্টারিওর মধ্যে জলপথে যোগাযোগ রাখার জন্য এই কৃত্রিম খাল কাটা হয়েছে।
ঋষিণ হালদার
ফিলাডেলফিয়া,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

লেখা মনোনীত হলে, লেখককে চিঠি দিয়ে জানানো হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। কপি রেখে লেখা পাঠানোই বাঞ্ছনীয়।

গত সংখ্যার উত্তর

(১) ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে।
(২) এল. ই. ওয়াটারম্যান।
(৩) ক্রিনাভেন্টাম।
(৪) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
(৫) জোনাথন সুইফট।
(৬) বৈকাল।
(৭) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষী-বাহিনীর সদর দপ্তর।
(৮) আগাথা ক্রিস্টি।
(৯) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

(১০) রাজা রামমোহন রায়।

(১১) রোহন কানহাই।

(১২) ইক্ষ্বাকুবংশ।

কুইজ

নিল ও'ব্রায়েন

আকস্মিক আবিষ্কার : নমনীয় রাবার

পেনিসিলিন যে একেবারে আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল, কিছুকাল আগে এই কুইজের পৃষ্ঠাতেই সে-কথা তোমাদের বলেছি। যাকে আমরা রাবার বলে যাচ্ছি, তাকেও আমাদের কাজে লাগাবার পদ্ধতি একেবারে আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল। ইন্ডিয়া রাবার আর গন্ধকের একটা মিশ্রণ সেবারে হঠাৎই একটা চুল্লির আঁচের মধ্যে পড়ে যায়। রাবার তো আর কিছুই নয়, এক রকমের গাছের রস। কিন্তু সেই রসকে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত মানুষের কোনও কাজে লাগানো যায়নি। গরম করলে সে-রস বড্ড বেশি চটচটে আঠার মতো হয়ে যেত, আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তা হয়ে যেত বড্ড বেশি শক্ত। চাপ দিলে তখন তা মট করে ভেঙে যেত। তা এই যে রাবার, চার্লস গুডইয়ার সাত-সাতটা বচ্ছর ধরে একে মানুষের কাজে লাগাবার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। একদিন হল কী, তাঁর হাতে ছিল রাবার আর গন্ধকের গুঁড়ো, অন্যমনস্কভাবে হাত থেকে সেই গুঁড়ো ঝেড়ে ফেলতেই সেটা একটা জ্বলন্ত স্টোভের মধ্যে পড়ে গেল। ফলে রাবার তো গলে গেল, কিন্তু তার সঙ্গে গন্ধকের গুঁড়োও মেশানো ছিল তো, তাই সেটা পরিণত হল সেই রকমের রাবারে, যা আমরা নানা কাজে ব্যবহার করে থাকি। একে বলে ভালকানাইজ্ড রাবার। গুডইয়ারের মেয়ে এই ঘটনার বিবরণ লিখে রেখেছেন। সেখানে তিনি কী বলছেন, শোনো। "আমি তো মাঝে-মাঝেই রান্নাঘরে এসে ঢুকছিলুম। হঠাৎ দেখি কী, আগুনের ধারে এক টুকরো রাবার হাতে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। দেখেই বুঝলুম, কিছু একটা তিনি আবিষ্কার করেছেন, আর সেইজন্যেই তিনি খুব উত্তেজিত।" নমনীয় যে রাবার আমাদের কাজে লাগে, এই হল তা আবিষ্কারের ইতিহাস।

প্রশ্ন

(১) রেগনের অপারেশানের সময় যে বাঙালি ডাক্তার সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁর নাম কী ?—**শুভাশিস বসু, দুর্গাপুর।**

(২) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মন্দিরটি কোথায় ?—**ভাস্কর দত্ত, কলকাতা ৩১।**

(৩) কোন্ সমুদ্রে একটিও মাছ নেই ?—**সজলকুমার মণ্ডল,** নাবালিয়াপাড়া।

(৪) কোনও শব্দ উচ্চারণ করতে গেলে আমাদের কতগুলি মাংসপেশী ব্যবহৃত হয় ?—**রাজীব ঘোষ,** চন্দননগর।

(৫) খেলাধুলোর জগতে সবচেয়ে ধনী মহিলা কে ?—**সঞ্চিতা পাঁজা,** দুর্গাপুর।

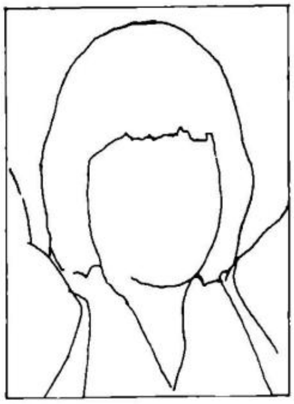

(৬) প্রথম বাংলা সবাক ও নির্বাক চলচ্চিত্রের নাম কী ?—**প্রণব ঘোষ,** বারাণসী।

(৭) কোন্ বাঙালি মহিলা ইংলিশ চ্যানেল প্রথম পার হয়েছিলেন ?—**ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়,** কলকাতা ১৫।

(৮) পৃথিবীতে কোথায় মধ্যরাতে সূর্য দেখা যায় ?—**চন্দনকুমার সাহা,** মুরশিদাবাদ।

(৯) 'লিট্ল কর্পোরাল' নামে কে প্রসিদ্ধ ?—**সুজয় দত্ত,** কলকাতা ৪৭।

(১০) কোন্ ভারতীয় প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেঞ্চুরি করেন ?—**সুপ্রসন্ন দিক্‌পতি,** বর্ধমান।

(১১) ক্রিকেটে থ্রি-ডব্লু কারা ?—**বাবলি সাহা,** ত্রিপুরা।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

ফেব্রুয়ারি : শুদ্ধির মাস

তোমরা যারা ৭ জানুয়ারি সংখ্যা 'আনন্দমেলা' পড়েছ, তারা জানো যে, রোমানরা যখন গ্রিকদের কাছ থেকে বর্ষ-গণনার পদ্ধতিটা শিখেছিল, তখন বছরে ছিল মোট ৩০৪ দিন, আর মাস ছিল মাত্র দশটা। বছর তখন মার্চ মাস থেকে শুরু হত। রোমের সম্রাট নুমা সেই দশটা মাসের সঙ্গে আরও দুটো মাস জুড়ে দেন, জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি। জানুয়ারি হল একাদশ মাস, আর ফেব্রুয়ারি হল দ্বাদশ। অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি হল বছরের একেবারে শেষ মাস।

জুলিয়াস সিজার এসে বর্ষশেষের এই মাস দুটোকে একেবারে গোড়ায় নিয়ে এলেন। জানুয়ারি হল বছরের প্রথম মাস, আর তার পরেই জায়গা পেল ফেব্রুয়ারি। জুলিয়াস সিজারের আগে পর্যন্ত ফেব্রুয়ারি মাসে দিনের সংখ্যা ছিল তিরিশ। তা জুলাই মাসটা তো জুলিয়াস সিজারের নামে হয়েছে; সিজার করলেন কি, ফেব্রুয়ারি থেকে একটা দিন কেটে নিয়ে জুলাইয়ের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। এদিকে আবার অগস্ট মাসটা হয়েছে সম্রাট অগস্টাসের নামে। তিনিও কম যান না। নিজের নামের মাসের মান বাড়াবার জন্যে তিনিও ফেব্রুয়ারি থেকে আর-একটা দিন কেটে নিয়ে সেটাকে জুড়ে দিলেন অগস্টের সঙ্গে। ফলে ফেব্রুয়ারির দিনের সংখ্যা আঠাশে এসে দাঁড়াল। লিপ ইয়ারে অবশ্য ফেব্রুয়ারির সঙ্গে একটা বাড়তি দিন জুড়ে দেওয়া হয়, কাল-চক্রের হিসেবটা তা নইলে ঠিক থাকে না।

তা তো হল, কিন্তু কথা হচ্ছে এই ফেব্রুয়ারি নামটা এল কোত্থেকে? মূলে আছে ফেব্রুয়ারিয়াস, যার অর্থ হল 'শুদ্ধিকরণ'। আগে তো ফেব্রুয়ারি ছিল বছরের একেবারে শেষ মাস। সেই মাসে নববর্ষকে আহ্বান করবার জন্য প্রাচীন রোমে একটা শুদ্ধির উৎসব হত। যা-কিছু পুরনো, জীর্ণ, এ হল তার থেকে মুক্ত হবার এবং মুক্ত হয়ে শুদ্ধ হবার ব্যাপার। ফেব্রুয়ারি ছিল তখন শুদ্ধির মাস। পরে অবশ্য বছরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারিকে সরিয়ে আনা হল দ্বিতীয় স্থানে। কিন্তু নামটা তো আর পালটাল না, সেটা রয়েই গেল।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

বটুকদাদার গল্প

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বটুকদাদা সম্পর্কে আমার ঠাকুর্দা হতেন, তিনি ছিলেন আমার নিজের ঠাকুর্দার আপন পিসতুতো ভাই। তবু কেন জানি না, আমরা বাড়িসুদ্ধু ছোটরা সবাই তাঁকে বটুকদাদা বলেই ডাকতাম। তাঁর সঙ্গে আমাদের খুব ভাব ছিল।

বটুদাদার নিজের বাড়ি কোথায় ছিল তা আমরা জানি না, তবে মাঝে-মাঝে হঠাৎ-হঠাৎ তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন। থেকে যেতেন কযেকদিন। বেশ মজার মানুষ ছিলেন তিনি, বাড়িতে ঢুকতেন গান গাইতে গাইতে। একটা গান আমার এখনও মনে আছে : রয়েছে দুয়ার খোলা, এসেছে পাগলা ভোলা, আজ কোনও কাজ হবে না, হবে শুধু নাচনা গানা··· ।

সেই গান গাইতে গাইতে তিনি উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে ভিখিরির মতন হাত-জোড করে বলতেন, 'ও গো দাদা-দিদি, মাসি-পিসিরা, পাগলা ভোলা এসেছে, হাঁড়িতে চাল বেশি নিও, আমি কিন্তু পেট ভরে খাব, অনেকদিন কিছু খাইনি গো !'

প্রত্যেকবার এই কথা শুনে আমার ঠাকুর্দা রাগ করতেন। তিনি বলতেন, 'ছিঃ বটুক, কী পাগলামি করিস ! ছোট ছেলে-মেয়েরা কী ভাববে ? তুই কি ভিখিরি নাকি ? এ-বাড়িতে এসে তুই থাকবি, খাবি, সেটা আবাব এমন কথা কী !'

ঠাকুমা ও কাকিমা জেঠিমারা খুব হাসতেন বটুদাদাকে দেখে। আমরাও বটুকদাদাকে দেখে খুব মজা পেতাম। বটুকদাদা এলেই

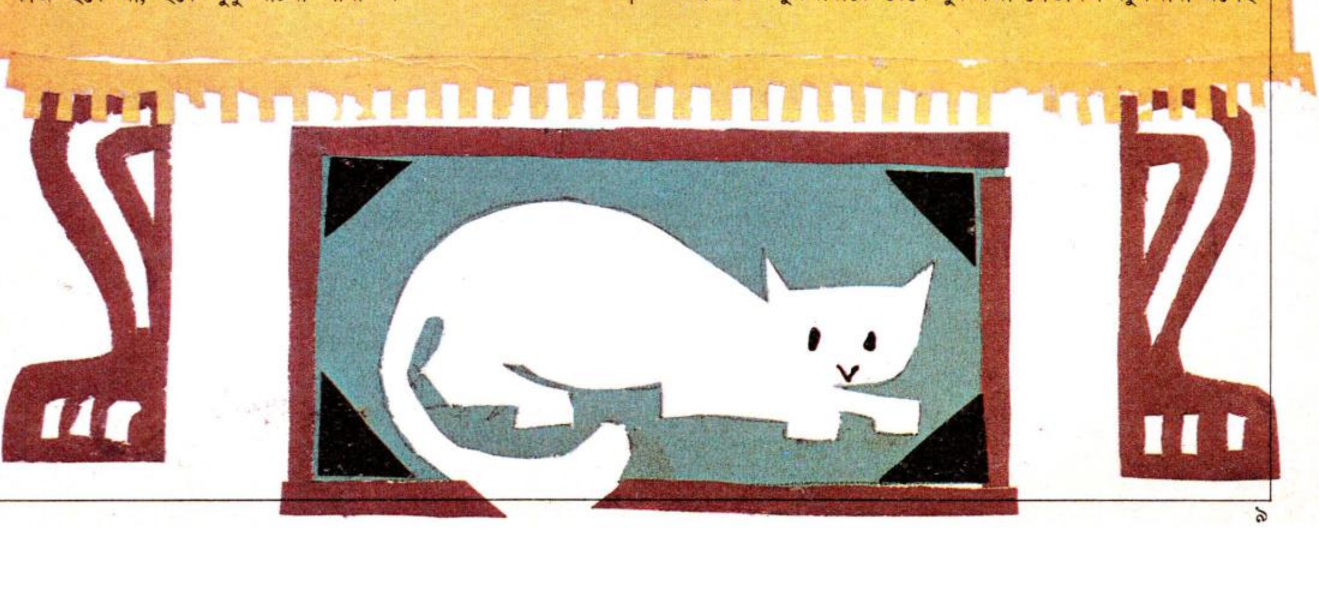

Response 1011

পড়াশুনো ফেলে ছুটে যেতাম, তাঁকে ঘিরে গোল হয়ে বসতাম। প্রত্যেকবার এসেই তিনি বলতেন, 'উঃ, রাস্তায় কী বিপদ, খুব জোর প্রাণে বেঁচে এসেছি। এবারে কী হয়েছিল জানিস ?'

বটুকদাদা বাইরে ধুতি-পাঞ্জাবি পরলেও, বাড়িতে এসেই সে-সব ছেড়ে একখানা পায়জামার ওপর রঙিন আলখাল্লা চাপাতেন। সেটাতে লাল-নীল-হলুদ অনেকরকম রং। তাঁকে দেখাত বহুরূপীর মতন। একবার সেই আলখাল্লাটা পরলে তিনি আর কিছুতেই খুলতেন না। এমনকী, খুব গরমের সময় ছেলেরা সবাই খালি গায়ে থাকে, সেইসময়ও বটুদাদার গায়ে আলখাল্লা, সেটা ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেলেও খোলার নাম নেই। বটুকদাদাকে খালি গায়ে কেউ দেখেনি।

বটুকদাদার কাঁধে থাকত একটা ঝোলা। সেই ঝোলায় ভর্তি অনেক খুচরো পয়সা। বেশির ভাগই সিকি আর আধুলি, তাঁর হাঁটার সময় ঝনঝন শব্দ হত। বটুকদাদা দুষ্টুমি করে বলতেন, 'ওই সব খুচরো পয়সা তিনি ভিক্ষে করে পেয়েছেন।' পরে জেনেছি, আসলে তা মোটেই নয়। বটুকদাদাদের খেয়া-নৌকোর ব্যবসা ছিল। অনেক জায়গায় নদীর ঘাটে তাঁদের খেয়ার নৌকো চলত, বটুকদাদা ঘুরে ঘুরে সেই সব খেয়াঘাট থেকে টাকা আদায় করে আনতেন। কোথাও খেয়ার মাঝির অসুখ-টসুখ হলে তিনি নিজেই নৌকো চালাতেন। খেয়া পার হবার সময় লোকে তো খুচরো পয়সাই দেয়, তাই তাঁর ঝুলিতে অত খুচরো।

তিনি আমাদের নানারকম ধাঁধা জিজ্ঞেস করতেন, উত্তর দিতে পারলেই তিনি দিতেন একটা সিকি। বাবা-মায়েরা ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে পয়সা দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি জানাতেন খুব, কিন্তু বটুকদাদা শুনতেন না। আমরা অবশ্য সেই পয়সা পেয়ে দারুণ খুশি হতাম। আমার সেজদা 'ধাঁধার বই' নামে হাট থেকে একখানা বই কিনে এনে লুকিয়ে একা-একা সব ধাঁধার উত্তর মুখস্থ করত বেশি পয়সা পাবার জন্য। কিন্তু বটুকদাদার ধাঁধা কোনও বইতে পাওয়া যাবে না। তাঁর ধাঁধাগুলো আসলে খুব সহজ, কিন্তু চট করে উত্তরটা মনে আসে না। যেমন একটা ধাঁধা ছিল এইরকম : গোরুতে ঘাস খায়, আর গোরুর গলার দড়িটা কী খায় ?

আমাদের মধ্যে ছোড়দির বুদ্ধিই ছিল সবচেয়ে বেশি। আমরা কেউ উত্তর দিতে পারিনি, ছোড়দি টপ করে বলে দিয়েছিল, 'দড়ি পাক খায় !'

বটুকদাদার আর একটা খেলা ছিল, বাংলা-বাংলা খেলা। সারা দিন যদি কেউ বটুকদাদার সামনে একটাও ইংরেজি কথা না বলে থাকতে পাবে, তা হলে সে চারখানা সিকি পাবে। এ-খেলাটা ছিল খুবই শক্ত। টেবিল, চেয়ার, শার্ট, প্যান্ট এসবও বলা চলবে না। অনেক কথার তো আমরা বাংলা জানিই না। বটুকদাদা অনেক কথার বাংলা জানতেন। যেমন বুকশেলফ্-এর বাংলা বইদানি ; যাতে ফুল রাখে সেটা যদি ফুলদানি হতে পারে তবে বই রাখার জায়গা বইদানি হবে না কেন ? আর প্যান্টের বাংলা দু' চোঙা। চেয়ারের বাংলা কেদারা আর টেবিলের বাংলা মেঝ।

আমার ছোড়দি মুন্নি ছাড়া অবশ্য আর কেউই বাংলা-বাংলা খেলায় জিততে পারত না। ছোড়দির কথাবার্তাগুলো ছিল চটাং চটাং ধরনের। ছোড়দি আবার খেতে খুব ভালবাসত। পাকা তেঁতুলে নুন মাখিয়ে ছোড়দি নিজেই আবার বানিয়ে কোথায় লুকিয়ে রাখত, সেই আচার সে অন্য কাউকে দিতে চাইত না। এমনকী, বটুকদাদাকেও দিত না। বটুকদাদা চাইলে বলত, 'ছিঃ, বুড়োমানুষদের আচার খেতে নেই, দাঁত টকে যায় !'

বটুকদাদা দুঃখ পেয়ে বলেছিলেন, 'মুন্নি, তুই আমাকে বুড়ো বললি ? আর তো কেউ বলে না ! এখনও তো আমার মাথায় টাক পড়েনি !'

ছোড়দি বলেছিল, 'ওমা, বুড়োমানুষকে বুড়ো বলেছি, তাতে দোষের কী হয়েছে ? টাক না পড়ুক, দাড়ি তো পেকেছে !'

বটুকদাদার ঝোলার মধ্যে বাঁশিও থাকত একটা। সন্ধেবেলা তিনি বাঁশি বাজিয়ে শোনাতেন। কিন্তু ছোড়দি এসে সামনে বসলেই বটুকদাদার বাঁশি বাজানো থেমে যেত। ছোড়দির হাতে তেঁতুলের আচার, জিভ দিয়ে চাটে একটু একটু করে, তাই দেখলেই বটুকদাদার জিভে জল এসে যায়। আর জিভে জল এসে গেলে কি বাঁশি বাজানো যায় ?

বটুকদাদা বললেন, 'ওলে, মুন্নি, তুই একটু পেছোন দিকে গিয়ে বোস না !'

ছোড়দি খিলখিল করে হেসে ওঠে।

বটুকদাদা আমাদের গুরুজন হলেও তাঁর সঙ্গে আমরা সবাই সমানে হাসি-ঠাট্টা করতে পারতাম। বটুকদাদা এলে আমরা কয়েকটা দিন পড়াশুনোর পাট চুকিয়ে দিয়ে হইহই করে কাটাতাম।

একদিন ছোটকাকা বলল, 'তোরা কেউ বটুকদাদাকে কোনওদিন খালি গায়ে দেখেছিস ?'

আমরা সবাই মাথা নাড়লুম। সত্যিই তো বটুকদাদাকে তো কক্ষনো খালি গায়ে দেখা যায়নি !

ছোটকাকা বললেন, 'যাঃ, তা হলে তো তোরা কেউ বটুকদাদার আসল গল্পই শুনিসনি ! ওঃ, সে যা গল্প, শুনলে গায়ে কাঁটা দেয় !'

আমরা বটুকদাদার কাছ থেকে অনেক গল্পই শুনেছি। এর মধ্যে কোনটা যে আসল গল্প আর কোনটা যে নকল গল্প, তা আমরা বুঝিনি। সবই ভাল লেগেছে। তবু আমরা ছুটে গিয়ে বটুকদাদাকে ঘিরে ধরলুম।

বটুকদাদা তখন একটা পেয়ারাগাছের ডাল কেটে আমার ছোট ভাইয়ের জন্য গুলতি বানিয়ে দিচ্ছিলেন। আমাদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, কী হয়েছে, তোরা এত চ্যাঁচামেচি করছিস কেন ?"

আমরা বললুম, "বটুকদাদা, তুমি এতদিন আমাদের আসল গল্পটা বলোনি কেন ? তোমার খালি গায়ের গল্প !"

বটুকদাদা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "সে গল্প তোদের এখন শোনার দরকার নেই। বড় হলে শুনবি !"

কিন্তু আমাদের ধারণা আমরা তখনই বড় হয়ে গেছি, আমরা ওই কথা মানব কেন ? ছোড়দি বলল, "দাঁড়া না, আমি ব্যবস্থা করছি !"

বটুকদাদা দিনের বেলা চান করতেন না। তাঁকে যে ঘরটায় থাকতে দেওয়া হত, সেটা পুকুরের ধারে। রাত্তিরবেলা আটটা-ন'টার সময় উনি আলখাল্লাটা খুলে রেখে অন্ধকারের মধ্যে পুকুরে কয়েকটা ডুব দিয়ে আসতেন।

সেই রাত্তিরে ছোড়দি বটুকদাদার ঘর থেকে তাঁর জামা-কাপড়ের পুঁটুলি সরিয়ে ফেলল। বটুকদাদা পুকুরে নামবার পর লুকিয়ে ফেলল আলখাল্লাটাও।

জল থেকে উঠে এসে বটুকদাদা বললেন, "আরে, আমার জামাটা কোথায় গেল ? কে নিল রে, অ্যাাঁ !"

একটু দূর থেকে হেসে উঠল ছোড়দি।

বটুকদাদা কোমরে গামছা জড়িয়ে ছুটে গেলেন নিজের ঘরে। সেখানেও জামা-কাপড় না পেয়ে অসহায়ভাবে বললেন, "আরে, সবই নিয়ে নিয়েছে। বিচ্ছু ছেলেমেয়েদের কাণ্ড। ওরে ও মুন্নি, শিগগির দে, আমার শীত করছে !"

তখন আমরা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লুম ঘরের মধ্যে। তারপরই চমকে গেলুম !

ইলেকট্রিকের আলো তো ছিল না, একটা লণ্ঠন জ্বলছিল সেই ঘরে। তাতে দেখা গেল, বটুকদাদার বুক-পিঠে অসংখ্য খোবলানো-খোবলানো দাগ। মসলা-বাটা শিল কিংবা খেজুরগাছ যেমন অক্ষত হয় না, বটুকদাদার গায়েও সেইরকম অনেক পুরনো ক্ষত। বটুকদাদা সবসময় গায়ে জামা দিয়ে এই ক্ষতগুলো লুকিয়ে রাখে।

আমাদের অবাক দৃষ্টি দেখে বটুকদাদা বললেন, "আগে মাথা মুছে জামা-কাপড় পরে নিই, তোরা ঠাণ্ডা হয়ে বোস, তারপর গল্প বলছি! মুন্নি, আমার জন্য একটু চা করে নিয়ে আসতে পারবি?"

খানিকবাদে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বটুকদাদা বললেন, "আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন ভাল ফুটবল খেলতে পারতাম, বুঝলি! পড়াশুনোর চেয়ে খেলাধুলোর দিকেই বেশি মন ছিল। আমি যে-বছর ফার্স্ট ক্লাসে পড়ি, ফার্স্ট ক্লাস কাকে বলে জানিস তো, আমাদের আমলে ক্লাস টেনকে বলা হত ফার্স্ট ক্লাস, সেই সময়ে আমার এত নাম হয়েছিল যে, বিভিন্ন গ্রামের ফুটবল টিম আমাকে ভাড়া করে নিয়ে যেত! আমি খেলতাম সেন্টার ফরোয়ার্ডে। এক-একখানা গোল দিতে পারলে দু' টাকা করে পেতাম। কোনও কোনও খেলায় দশখানা পর্যন্ত গোল দিয়েছি বুঝলি?"

ছোড়দি বলল, "নিশ্চয়ই পচা-পচা টিমের সঙ্গে খেলতে?"

বটুকদাদা বললেন, "গ্রামের টিম আর কত ভাল হবে। খেলোয়াড়রাও সেইরকম। কিন্তু আমার মতন এত বেশি গোল দিতে আর কেউ পারত না। একবার এক ডজন গোল দিয়ে রেকর্ড করার ইচ্ছে ছিল, তা আর হল না অবশ্য।"

আমি ভাবলুম, ফুটবল খেলতে গেলে মাথা ফাটতে পারে কিংবা পা ভাঙতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে বটুকদাদার গায়ের ওই সারস খোবলানোর কী সম্পর্ক?

বটুকদাদা বললেন, "তখন তো আমাদের নিজেদের গ্রামে ইস্কুল ছিল না। তাই অন্য একটা গ্রামের স্কুলে পড়তাম, থাকতাম সেখানকারই বোর্ডিং-এ। এখন যাকে হস্টেল বলে, তখন তাকেই বলত বোর্ডিং। এই বোর্ডিং-এ আর-একটা ছেলে থাকত, তার নাম প্রাণগোপাল, ডাক নাম ভুতো। সেই ভুতোও ভাল ফুটবল খেলত, সে ছিল গোলকিপার। ভুতো আমার চেয়ে বয়েসে কয়েক বছর বড় ছিল, গায়ের রং টকটকে ফর্সা, সুন্দর চেহারা। অনেক সময় আমরা একই টিমে ভাড়া খাটতে যেতাম। আমি সেন্টার ফরোয়ার্ড, ভুতো গোলকিপার। আমাদের টিমই বেশির ভাগ খেলায় জিতে যেত! একবার গোবিন্দপুরে একটা খেলায় জিতে আমি আর ভুতো এক হাঁড়ি রসগোল্লা খেয়েছিলাম!"

ছোড়দি বলল, "আমরা খেলার গল্প শুনতে চাই না!"

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বটুকদাদা বললেন, "এটা খেলারই গল্প রে, অন্য গল্প নয়। একবার হল কী জানিস, আমি আর ভুতো দুটো আলাদা টিমে খেলতে গেলুম। ওই গোবিন্দপুরেই খেলা হবে, কিন্তু ভুতো খেলবে ঘোড়াডাঙার টিমে। ওই টিমের ক্যাপটেন ওর মামাতো ভাই, ওকে ওখানে খেলতেই হবে, এদিকে আমি গোবিন্দপুরেব টিমকে কথা দিয়ে ফেলেছি! উপায় নেই। দু'জনে দু'টিমের হয়ে খেলতে গেলুম। মাঠে নেমে ভুতো আমার কানে-কানে বলল, 'বটুক, তুই বেশি গোল দিস না। খেলাটা ড্র করার চেষ্টা করিস।' শুনেই রাগে আমার গা জ্বলে গেল। ওই সব গট আপ খেলায় আমি বিশ্বাস করি না। যার যতটা সাধ্য খেলবে, তারপর হার-জিত তো আছেই। হাফ টাইমের মধ্যেই আমরা অনেকটা এগিয়ে গেলুম। ঘোড়াডাঙা গোল দিয়েছে মোটে পাঁচটা, আর আমাদের টিমের পক্ষ থেকে আমি একাই আটখানা গোল দিয়েছি। ইচ্ছে আছে আরও অন্তত চারখানা দেবার। ভুতো আবার আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে বলল, 'বটুক, তুই এবার চেপে খেল, খেলাটা ড্র করাতেই হবে। তুই আর গোল দিলে আমার মামাতো ভাই বলেছে তোর ঠ্যাং ভেঙে দেবে!'

"আবার খেলা শুরু হবার একটু পরেই আমি একটা বল পেয়ে ছুটে গেলুম অন্য সাইডের গোলের দিকে, আমার পা থেকে বল ছাড়াবার সাধ্য কারও ছিল না। গোল-পোস্টের একেবারে কাছে পৌঁছে গেছি, এমন সময় কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল অফ সাইড, অফ সাইড! কিন্তু সে চিৎকারে আমি কান দিলুম না। রেফারির বাঁশি আমার কানে আসেনি, আমি মারলুম প্রাণপণে শট! ভুতো ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটা ধরতে গেল, কিন্তু পারল না, বলটা ঢুকে গেল গোলের মধ্যে। ভুতো কিন্তু মাটিতেই পড়ে রইল, আর উঠল না!"

আমি বললুম, "মরে গেল?"

সঙ্গে সঙ্গে দু' তিনজন আমার মাথায় চাঁটি মেরে বলল, "ধ্যাত বোকা! ফুটবল লাগলে কেউ মরে নাকি? নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল!"

বটুকদাদা বললেন, "অজ্ঞানও হয়নি, ভুতোর পেটে খুব লেগেছিল, সে আর খেলতে পারল না। তাকে নিয়ে যাওয়া হল মাঠের বাইরে। সেই খেলা আর শেষই হল না। দর্শকরা হইহই করে নেমে পড়ল মাঠের মধ্যে, আমরা সব দৌড়ে পালালুম। খেলা ভণ্ডুল!"

"বোর্ডিংয়ে কোনওক্রমে ফিরে আমি ভুতোর খবর নিতে গেলুম, কিন্তু ভুতো আমার সঙ্গে কথা বলল না। তার অভিমান হয়েছে। সে ভেবেছে, আমি ইচ্ছে করে তার পেটে বল মেরেছি। আমি কতভাবে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, সে কিছুতেই বুঝবে না। ক'দিন ভুতো জ্বরে ভুগল। তারপর একটু সুস্থ হতে-না-হতেই তার গায়ে স্মল পক্স বেরোল। স্মল পক্স!

"তখনকার দিনে স্মল পক্স-এর নামে মানুষ ভয়ে কাঁপত। বোর্ডিংয়ে বা হস্টেলে একজন ছাত্রের স্মল পক্স হলেই অন্য ছাত্ররা পালাত বাড়িতে। এবারেও তাই হল, অন্য ছাত্ররা পালিয়ে গেল, আমরা দু-তিনজন রয়ে গেলুম ভুতোর সেবা করার জন্য।

"পাঁচ দিন বাদে ভুতো মারা গেল। গ্রামে তো ডাক্তার ছিল না, ছিলেন এক কবিরাজ, তিনি অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু বাঁচানো গেল না কিছুতেই। শহর থেকে বড় কবিরাজ কিংবা অন্য ডাক্তার ডাকারও উপায় ছিল না, কয়েকদিন ধরে একটানা বৃষ্টিতে পথঘাট সব ডুবে গিয়েছিল।

"ভুতোর বাবা-মা থাকতেন বিহারে, তাই খরচ দেওয়া হল ঘোড়াডাঙায় তার মামার বাড়িতে। ভুতোর মামা খুব বুড়ো, তিনি আসতে পারলেন না। এল শুধু তার মামাতো দু'ভাই। তাদের মধ্যে একজনের আবার জ্বর, সে স্মল পক্সের মড়া ছুঁতে চায় না। বোর্ডিংয়ে তখন আমরা মাত্র তিনটি ছাত্র, তাদের মধ্যেও একজনের গায়ে দু'চারটে স্মল পক্সের গুটি বেরিয়েছে। সেও যেতে পারবে না। ওরকম ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আর কোনও লোকও জোগাড় করা যাবে না। আমরা তিনজনে মিলেই ভুতোকে নিয়ে চললুম শ্মশানের দিকে।"

হঠাৎ থেমে গিয়ে বটুকদাদা জিজ্ঞেস করলেন, "আর শুনবি?"

আমরা সবাই বললুম, "হ্যাঁ, শুনব। শুনব।"

আমার জ্যাঠতুতো দাদা নিমাই বসে ছিল দরজার ধারে, সে সরে এসে বসল ভেতরে। ছোড়দির আচার খাওয়া থেমে গেছে!

বটুকদাদা বললেন, "স্মল পক্সের মড়া চব্বিশ ঘন্টার বেশি ফেলে রাখতে নেই। আমাদের বেরোতে বেরোতে সন্ধে হয়ে গেল। ঝড়-বৃষ্টি চলছে অবিরাম। সেই দুর্যোগের মধ্যে কুকুর-বিড়ালও

বেরোয় না, আমাদের তো যেতেই হবে। আমাদের বোর্ডিং থেকে শ্মশান প্রায় তিন মাইল দূরে, নদীর ধারে। জল-কাদার মধ্যে আমরা হাঁটছি খুব আস্তে-আস্তে। বিদ্যুৎ-চমকে আর বাজের গর্জনে চমকে চমকে উঠছি। যাই হোক, অতি কষ্টে তো শ্মশানে পৌঁছলুম, কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি খাঁখাঁ। জনমনুষ্য নেই। মড়ার খাট নামিয়ে আমরা হাঁকাহাঁকি করতে লাগলুম, তবু ডোমের কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না। তখন কী উপায় ?"

বটুকদাদা তাকালেন আমাদের দিকে। ভুরু নাচিয়ে আবার বললেন, "কী উপায় ?" কিন্তু আমরা কি কেউ মড়া পোড়াবার বিষয় কিছু জানি যে উত্তর দেব ?"

ছোড়দি বলল, "একজন কেউ ডোমকে খুঁজে আনলেই পারত !"

বটুকদাদা বললেন, "সেটাই তো হচ্ছে কথা। কে যাবে ? নিয়ম হচ্ছে এই যে, মড়া কখনও একলা ফেলে যেতে নেই। একজনকে ছুঁয়ে থাকতে হয়। আমাদের সঙ্গে আর একজন যে গিয়েছিল, তার নাম বিষ্টু, আর ভুতোর মামাতো ভাইয়ের নামটা আমি ভুলে গেছি। সেই জায়গাটা বিষ্টুর চেনা। আমি বিষ্টুকে বললুম, 'তুই যা।' বিষ্টু সেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের মধ্যে কয়েক পা গিয়ে বলল, 'এই শ্মশানের মধ্যে আমি একলা যেতে পারব না, আমার ভয় করছে !'

"তখন আমি ভুতোর মামাতো ভাইকে বললুম, 'তা হলে তুমি এখানে থাকো, আমি বিষ্টুর সঙ্গে যাই ? সে বলল, 'ওরে বাবা, আমি একা মড়ার পাশে বসে থাকব ? সে পারব না !' ভেবে দ্যাখ তোরা, ওর নিজের মাসতুতো ভাই, তাকে সে ভয় পাচ্ছে ! শেষ পর্যন্ত বিষ্টু আর সে গেল ডোমকে ডাকতে, আমি একা বসে রইলুম ভুতোকে ছুঁয়ে।

"ওদের পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যেতে না যেতেই ভুতো উঠে বসল !"

ছোড়দি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "ভুতো মরেনি, ভুতো মরেনি, আমি আগে বুঝেছিলুম। ও মটকা মেরে পড়েছিল।"

বটুকদাদা ছোড়দির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "ভুতো উঠে বসল, সেই অন্ধকারেও তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল, সে অদ্ভুত ভাঙা গলায় বলল, 'বটুক, এইবার তোকে পেয়েছি। তুই আমার পেটে বল মেরেছিস, তুই ইচ্ছে করে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলি !'

"আমি কাঁদতে কাঁদতে বললুম, 'ভুতো, তোকে মারার কথা আমি একবারও চিন্তা করিনি। খেলতে নামলে আমার গোল দেওয়ার কথা ছাড়া আর অন্য কিছু মনে থাকে না।'

"ভুতো হাত বাড়িয়ে আমার বুকটা খিমচে ধরে একটা টান মারতেই আমার জামাটা ছিঁড়ে গেল। ভুতো মুখটা আরও কাছে এনে আমার বুকটা কামড়ে ধরতে গেল। তখন আমি দু'হাতে ভুতোর গলা চেপে ধরলুম। কিন্তু ভুতোর গায়ে তখন অসুরের মতন জোর। সে তার দু'হাতের আঙুলের নখ দিয়ে আমার বুক পিঠ থেকে মাংস খুবলে খুবলে তুলতে লাগল।"

নিমাইদা বলল, "ভুতো ভূত হয়ে গেছে !"

বটুকদাদা গম্ভীরভাবে বললেন, "ভূত নয়, নর-দানব। আমি তার গলা টিপে ধরেছি, তবু সে আমার গা থেকে মাংস তুলে তুলে দিতে লাগল মুখে। গলা টিপে ধরলে কেউ কথা বলতে পারে ? কিন্তু ভুতো সেই অবস্থাতেও হিহি হিহি করে হেসে উঠে বলল, 'তুই আমার সঙ্গে পারবি না, বটুক, আজ তোকে আমি শেষ করে দেব ! আমি চলে যাব, আর তুই মনের আনন্দে ফুটবল খেলে যাবি ভেবেছিস ? আজই তোর শেষ দিন !'"

নিমাইদা বলল, "দরজা বন্ধ করে দে ! দরজাটা বন্ধ করে দে !"

বটুকদাদা বললেন, "সেই অবস্থায় আমি ভুতোর সঙ্গে লড়াই করে গেছি। তার গলাটা ছেড়ে দিলে সে আমাকে কামড়েই খেয়ে নিত। আমি কিছুতেই ছাড়িনি। এক-এক সময় মনে হচ্ছিল, আর পারব না, আমার সব শক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে ! যন্ত্রণার চোটে আমি চিৎকার করছিলুম, 'ওরে বাবা রে, মা রে ! বিষ্টু কোথায় গেলি ? কে কোথায় আছ...'

"এক সময় দূর থেকে বিষ্টুর গলা শোনা গেল, 'বটুক আমরা এসে গেছি ! কী হয়েছে ?'

"ওদের গলা শোনা যাওয়া মাত্র ভুতো আমাকে ছেড়ে দিয়ে এলিয়ে গেল। আমি তার গলা থেকে হাত সরাতেই সে ধপাস করে পড়ে গেল। আবার আগের মতন।

"বিষ্টুরা এসে পড়ার পর যাতে আমার অবস্থা দেখতে না পায় তাই আমি ঝাঁপিয়ে পড়লুম নদীতে !"

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বটুকদাদা বললেন, "তারপর থেকে আমি ফুটবল খেলা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি !"

সেদিন রাত্তিরে আমাদের কী ভয় ! খাওয়ার পর আমরা কেউ

আর বাথরুমে যেতেও সাহস পাই না। জানলায় একটু বাতাসের শব্দ শুনলেই চমকে চমকে উঠি।

ছোটকাকা বললেন, "তোরা বটুকদাদার ওই গাঁজাখুরি গল্প শুনে ভয় পেয়েছিস বুঝি ? ওই গল্প আমাদের কাছে আগে কতবার বলেছে। বটুকদাদার গায়ে ওই যে দাগগুলো, ওগুলো আসলে স্মল পক্সের দাগ। ছোটবেলায় ওর একবার খুব সাঙ্ঘাতিক স্মল পক্স হয়েছিল, প্রায় মরতে বসেছিলেন, সেই দাগ রয়ে গেছে সারা গায়ে।"

আমি অবিশ্বাসের সুরে বললুম, "তা হলে মুখে দাগ নেই কেন ? স্মল পক্স হলে মুখে দাগ থাকবে না ?

ছোটকাকা বললেন, "মুখেও দাগ আছে। সেই দাগ ঢাকার জন্যই তো অত বড় দাড়ি রেখেছে !"

ছোড়দি বলল, "ঠিক, ঠিক। বটুকদাদার নাকের পাশেও দুটো তিনটে দাগ আছে। এখন মনে পড়ছে !"

এই কথা বলে ছোড়দি বিছানা ছেড়ে উঠে গেল আচার খাবার জন্য।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

পদ্মিনী-কাহিনী

আনন্দ বাগচী

মোগল-দস্যু, লুঠেরা-পাঠান, হায়েনার মতো হুন
বারবার এসে ভারতবর্ষে ঝরিয়ে গিয়েছে খুন।
ধ্বংস করেছে দুর্গ-নগর, মন্দির, জনপদ,
শ্মশান করেছে বীরভূমি তার লুঠে নিয়ে সম্পদ।
ঐক্যবিহীন বিশাল ভারত আত্মকলহে ভরা,
বীরের মতোই যুঝেছে বৃথাই বংশপরম্পরা।
মোগলের গ্রাসে একে একে গেছে হিন্দুরাজ্যগুলি,
ধূলিসাৎ তার রম্য-নগরী নয়নের পুত্তলি।
স্বদেশ-রক্ষী সব সৈনিক সংগ্রামে হলে গত
বীরাঙ্গনারা অগ্নিকুণ্ডে সেধেছে জহরব্রত।

মেবার-মুকুট চিতোর তখনও সগর্বে আছে খাড়া
শৈলশিখরে অজেয় দুর্গ যতবার খাক নাড়া।
ভীম সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র নাবালক লক্ষ্মণ
চিতোরের রাজা, ভীম নিজে তারে করছেন রক্ষণ।

আলাউদ্দিন রাজ্যজয়ের তৃষ্ণায় উন্মাদ।
মেটেনি তৃষ্ণা, মেটেনিকো তাঁর ভারত জয়ের সাধ।
বিপুল বাহিনী দিয়ে ঘিরেছেন রুদ্ধ চিতোর গড়
অবরোধে আর প্রতিরোধে ক্রমে ঘুরে আসে বৎসর।
বোঝা গেল এই জয়ের চেষ্টা হয়ে গেছে হঠকারী,
রসদ ফুরাক, হবেনাকো নত রাজপুত তরবারি।
আলাউদ্দিন দূত-মুখে তাঁর অন্তিম মনোভাব
সহ পাঠালেন চিতোর দুর্গে সন্ধির প্রস্তাব।
ভীম-মহিষীর শুনেছেন তিনি প্রবাদপ্রতিম খ্যাতি
একবার তাঁর দর্শন চান যদি থাকে সম্মতি।
প্রার্থী বিমুখ করে না কখনও মেবারের রাজপুত,
আহূত বাদশা একাকী এলেন জাল রেখে প্রস্তুত।
দূরদর্শনে দেখালেন রূপ অন্তবর্তিনী
দর্পণ থেকে দর্পণে প্রতিবিম্বিত পদ্মিনী।
তুষ্ট হৃদয়ে আলাউদ্দীন ক্ষমা চেয়ে স্বস্থানে
ফিরে চললেন, ভীম সিংহও অতিথির সম্মানে
দুর্গ বাহিরে যেমন গেলেন চকিতে গুপ্ত সেনা
ঘিরে নিল তাঁকে, শত্রুর এই শঠতা ছিল না চেনা।
চিতোর দুর্গে গ্রহণের ছায়া ঘনাল আচম্বিতে
আবাল-বৃদ্ধ বীর-যোদ্ধারা প্রস্তুত প্রাণ দিতে।
হেন কালে এল অশুভ বার্তা। সভা জুড়ে নীরবতা।
স্বজন বন্ধু সমবেত বীর সকলের হেঁটমাথা।
আলাউদ্দিন বাড়িয়েছে তার বঙ্কিম তর্জনী—
ভীম সিংহের মুক্তিপণের দাবি : চাই পদ্মিনী!

ছবি : বিমল দাস

রানার জীবন, চিতোর-মুক্তি নির্ভর করে আছে,
পদ্মিনী যদি ধরা দেন এসে শত্রু-রাজের কাছে।
সতী-সাধ্বীর কাছে এ-খবর বলা যে সাধ্যাতীত
হেঁট মুখে তাই। সহসা সবাই চোখ তুলে স্তম্ভিত।
বিষাদ-প্রতিমা পদ্মিনী এ কী! দাঁড়িয়ে জনান্তিকে,
চিন্তামগ্ন, মৃদুভাবে শেষে জানালেন মন্ত্রীকে—
শুনেছেন তিনি শত্রুপক্ষ শর্ত দিয়েছে কী তা,
এর চেয়ে ঢের প্রিয় ছিল তাঁর সহমরণের চিতা।
পতির জন্যে সতী পারে তবু চরম মূল্য দিতে,
শেষ বাতিঘর চিতোর বাঁচুক বিনিময় সন্ধিতে!

আলাউদ্দিন পেয়েছেন যেন হাতে স্বর্গের চাঁদ
শিবিরে শিবিরে বান ডাকিয়েছে বাঁধভাঙা আহ্লাদ।
রাজপুত-রানি সেরা সুন্দরী ভারতের কোহিনুর,
তাঁর সম্মানে রাখেননি ত্রুটি সম্রাট বাহাদুর।
শর্তমাফিক অবরোধ তুলে চিতোর দুর্গ থেকে
নির্মিত হল মহামণ্ডপ ফুলসজ্জায় ঢেকে।
শেষ-সাক্ষাৎ অবারিত রবে প্রিয় সখী সঙ্গীর
মিলনক্ষেত্র পরদানশিন রাজপুত রমণীর।

মন্থরগতি মিছিল এসেছে শবানুগামীর মতো
তরঙ্গহীন বিষাদসিন্ধু, মস্তক অবনত।
অদূরে সজাগ বিদেশী সৈন্য, সতর্ক ব্যূহঘের
আসে সাত শত রুদ্ধ শিবিকা ছয়-ছয় বাহকের।
বিজয়া দশমী সমাগত যেন পূর্ণিমা-সন্ধ্যায়
পুরনারীগণ জন্মের শোধ বিদায় জানায়ে যায়।
স্বর্ণজরির কিংখাবে ঢাকা রাজকীয় শিবিকায়,
অস্তগামিনী চিতোর-লক্ষ্মী সমাধির মুদ্রায়।
পতি-পত্নীর শেষ সাক্ষাতে সম্রাট সম্মতি
দিয়েছেন, তবে অর্ধঘণ্টা সময় অল্প অতি।
মণ্ডপে চাপা ক্রন্দনরোল হুলুধ্বনির প্রায়
ভীম-পদ্মিনী সাক্ষাৎ-শেষে প্রহরও গড়িয়ে যায়।
শিবিকার দ্বার খোলা হয় দ্রুত সম্রাট-নির্দেশে,
শূন্য শিবিকা! গুণ্ঠন খুলে উঠল অট্টহেসে।
বিদ্যুৎ-বেগে শিবিকা-বাহক খসাল ছদ্মবেশ
হিংস্র কেশরী, অসির ডগায় ঝলসায় যেন শ্লেষ!
প্রতিটি শিবিকা-অর্গল খুলে এক এক মহাবীর
নির্গত হল, ধূম্রজালিকা খুলে গেল বহ্নির।
সাগর-প্রমাণ শত্রু-সৈন্য, মণ্ডপ প্রাঙ্গণ
মন্থন করে শুরু হয়ে গেল মরণ-আলিঙ্গন।

ছত্রভঙ্গ বাহিনীর সাথে ব্যর্থ দিল্লিরাজ
ফিরলেন দেশে, চরম প্রহারে অন্তরে পেয়ে লাজ।
শঠে শাঠ্যং! পদ্মিনী করে দিলেন কিস্তিমাত
চিতোর দুর্গে স্বামীর সঙ্গে হল ফের সাক্ষাৎ॥

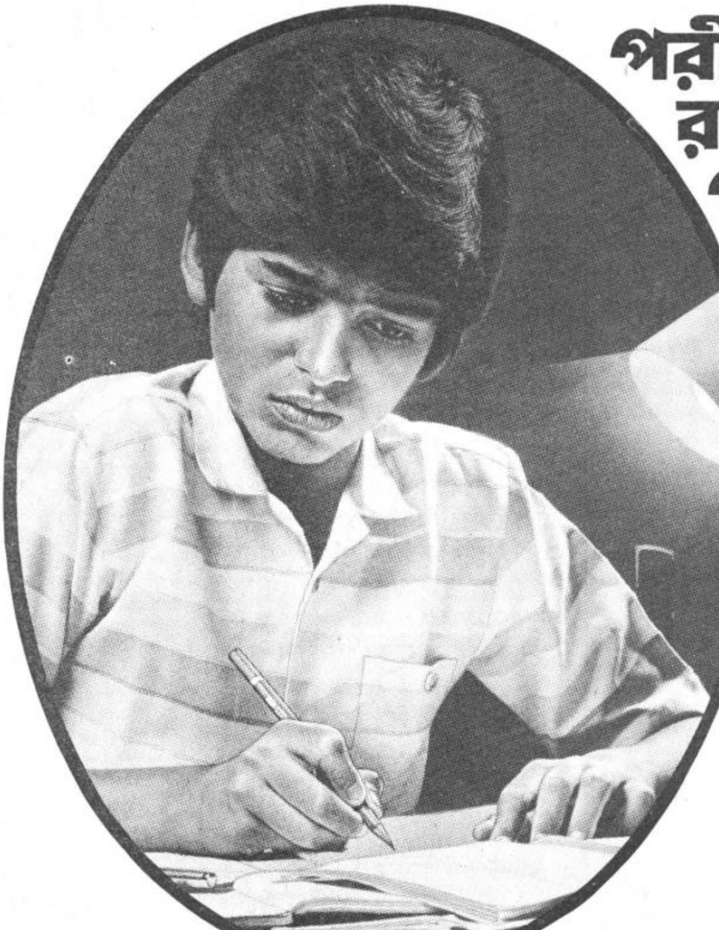

পরীক্ষার সময় রাতজেগে পড়াশোনার সময়

এখনই তো শরীরকে রাখতে হবে সম্পূর্ণ সুস্থ...
এখনই তো চাই
কমপ্লান®

একমাত্র কমপ্লানেই আছে একান্ত প্রয়োজনীয় ২৩ টি খাদ্যগুণ, বাড়তি পুষ্টির জন্য ওর যা এখন দরকার।

সাধারণত ঃ ১৫-১৬ বছর বয়সের মধ্যে ছেলেমেয়েরা সবদিকথেকে পুরোপুরিভাবে বেড়ে ওঠে, তাই তাদের পুষ্টিপ্রয়োজনও হয় বিশেষ ধরণের। আর যখন পরীক্ষার চাপ থাকে তখন তো কথাই নেই। সেইজন্য মায়েরা জানেন যে পরীক্ষার সময় মানেই **কমপ্লানের** সময়।

বাচ্চাদের শরীর গড়ে তুলতে যে-পুষ্টি সরাসরিভাবে সাহায্য করে সেটা হল প্রোটীন। **কমপ্লানে** প্রোটীন তো আছেই (২০%), আছে মিল্কপ্রোটীন, যা বাচ্চাদের জন্য সেরা। তাছাড়া আছে বাইশটি অন্যান্য খাদ্যগুণ, যেমন কার্বোহাইড্রেট, খনিজ ও স্নেহ পদার্থ এবং নানান ভিটামিন। বাড়ন্তবয়সের ছেলেমেয়েদের এগুলি বিশেষ দরকার।

আপনার ছেলেমেয়েদেরও দিনে দুবার করে **কমপ্লান** খাওয়ান।

কমপ্লান পাবেন বাচ্চাদের মনের মত চকোলেট, স্ট্রবেরি, আইস্ক্রীম ও এলাচ-জাফরান স্বাদে। প্লেন-ও পাবেন।

প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, ক্লোরাইড (সি এল রূপে), পটাসিয়াম, আয়রণ, আয়োডিন, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি১, রিবোফ্লাভিন, নিকোটিনামাইড, ক্যালসিয়াম প্যান্টোথিনেট, কলিন, পাইরিডক্সিন (বি৬), ভিটামিন বি১২, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি, ভিটামিন ই, ভিটামিন কে.

দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।

কমপ্লান® –সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

B.84.GLC.2316.13.Ben.

বিকল্প শক্তির প্রয়োজন বাড়ছে

প্রদীপচন্দ্র বসু

অচ্ছেজা গ্রামের কথা দিয়েই শুরু করি। দিল্লি থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ জেলার এই গ্রামটির নাম আজ আমাদের দেশের অনেকেই জানেন। অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের জন্যেই অচ্ছেজা এখন ভারতবিখ্যাত। প্রায় চার বর্গ কিলোমিটার এলাকার এই গ্রামের ২,৮০০ অধিবাসী এক বছর আগেও সূর্যাস্তের পরে কেরোসিন কুপির বা হ্যারিকেনের টিমটিমে আলো নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে প্রয়োজনীয় কাজ সারত। এখন অচ্ছেজার রাস্তায় সন্ধের পর টিউবলাইট জ্বলে, রঙিন টিভি দ্যাখে গ্রামবাসীরা, ব্যাটারি ছাড়াই রেডিও বাজে, কয়লা বা কাঠ না পুড়িয়েই রান্না করে বাড়ির মেয়েরা। এমনকী অচ্ছেজার ছোট্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রুগিরা এখন প্রয়োজনমতো যথেষ্ট গরম জলও ব্যবহার করে।

কী করে এসব সম্ভব হল? অচ্ছেজায় যারা যায়নি, তারা ভাববে, নিশ্চয়ই ওই গ্রামে সম্প্রতি বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। না, তা নয়। আসলে, অচ্ছেজা অন্ধকার থেকে আলোয় এসেছে বিকল্প শক্তি ব্যবহার করে। এই গ্রামের রাস্তায় আলো জ্বালায় সৌরশক্তি থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুতেই চলে রঙিন টেলিভিশন ও রেডিও। চাষের খেতে সেচের পাম্প চালায় হাওয়া-কল বা উইণ্ডমিল। বাড়ির মেয়েরা রান্না করে গোবর-গ্যাস জ্বালিয়ে। অনেকে গোবর-গ্যাস দিয়ে ঘরের ভেতর আলোও জ্বালায়। আর, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জল গরম করে সোলার ওয়াটার-হিটার। অপ্রচলিত বা বিকল্প শক্তি ব্যবহারে এই অভাবনীয় সাফল্যের জন্য অচ্ছেজা সরকারের কাছ থেকে 'শক্তি গ্রাম' উপাধি পেয়েছে। বিকল্প শক্তির ব্যবহার গ্রামবাসীদের জীবনে এনেছে অনেক নতুন পরিবর্তন, লাঘব হয়েছে অনেক কষ্টের।

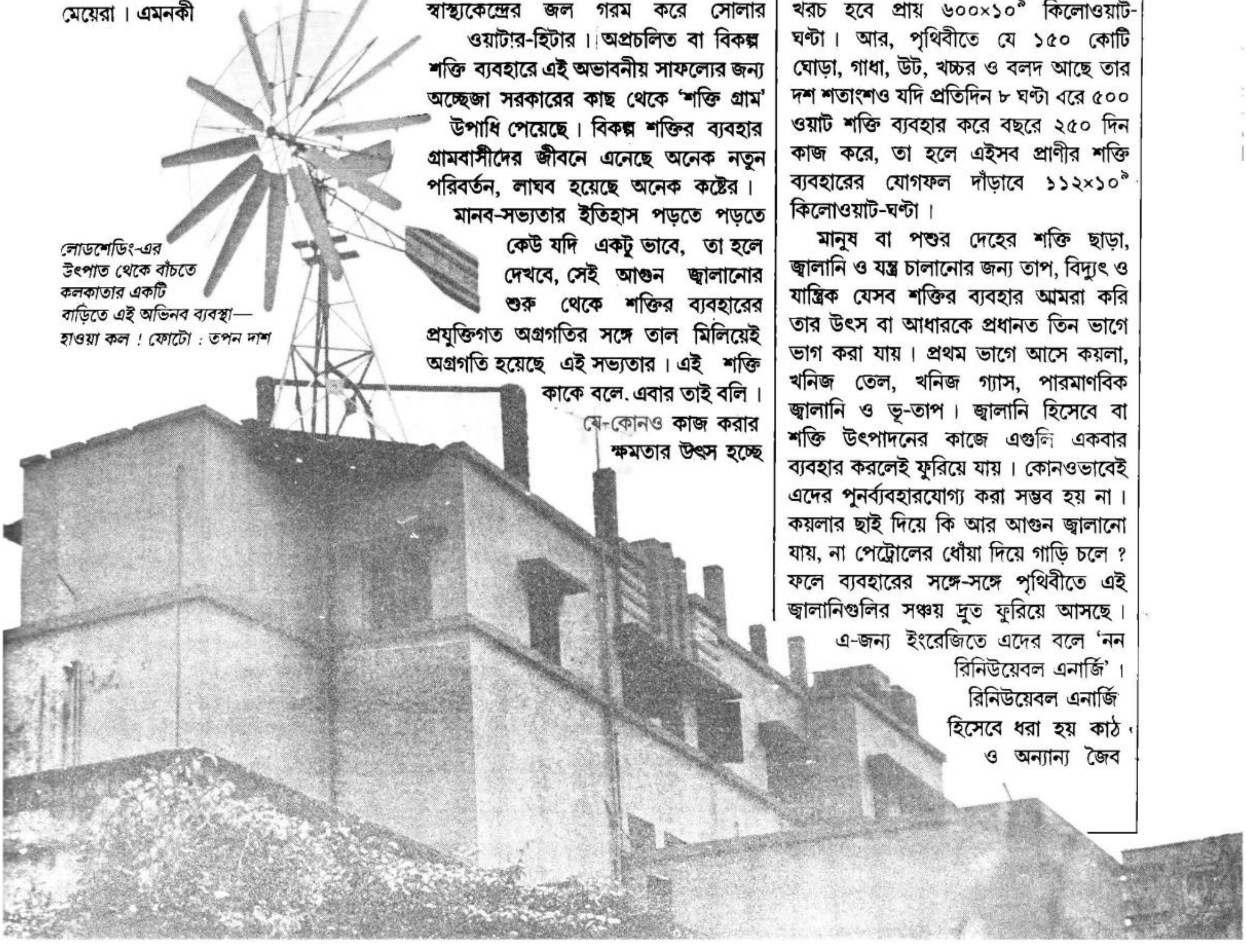

লোডশেডিং-এর উৎপাত থেকে বাঁচতে কলকাতার একটি বাড়িতে এই অভিনব ব্যবস্থা— হাওয়া কল! ফোটো : তপন দাশ

মানব-সভ্যতার ইতিহাস পড়তে পড়তে কেউ যদি একটু ভাবে, তা হলে দেখবে, সেই আগুন জ্বালানোর শুরু থেকে শক্তির ব্যবহারের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়েই অগ্রগতি হয়েছে এই সভ্যতার। এই শক্তি কাকে বলে, এবার তাই বলি। যে-কোনও কাজ করার ক্ষমতার উৎস হচ্ছে শক্তি। তা আমাদের দেহের শক্তিই হোক, বা যন্ত্রের শক্তিই হোক। দেহের শক্তি জোগায় খাদ্য। দেহের শক্তি দিয়ে আমরা ছোটখাটো যন্ত্রকে চালাতে পারি। অথবা, আমাদের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন শক্তির আধারকে ব্যবহার করে তাপ বা বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করে। তাই দিয়ে সরাসরি বা যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করেও যন্ত্র চালানো যায়। একজন মানুষ বা একটি পশুর দেহে সীমায়িত শক্তি থাকলেও, এই পৃথিবীর সব মানুষ বা পশুর সম্মিলিত শক্তি কিন্তু কম নয়। উদাহরণ দিয়ে বলি, যদি এই পৃথিবীর ৪০০ কোটি মানুষ বছরের ২৫০ দিন, প্রতিদিন ৭৫ ওয়াট শক্তি খরচ করে ৮ ঘণ্টা ধরে কাজ করে, তা হলে সারা বছরে যা কাজ করবে তার জন্য শক্তি খরচ হবে প্রায় ৬০০×১০^{৯} কিলোওয়াট-ঘণ্টা। আর, পৃথিবীতে যে ১৫০ কোটি ঘোড়া, গাধা, উট, খচ্চর ও বলদ আছে তার দশ শতাংশও যদি প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা ধরে ৫০০ ওয়াট শক্তি ব্যবহার করে বছরে ২৫০ দিন কাজ করে, তা হলে এইসব প্রাণীর শক্তি ব্যবহারের যোগফল দাঁড়াবে ১১২×১০^{৯} কিলোওয়াট-ঘণ্টা।

মানুষ বা পশুর দেহের শক্তি ছাড়া, জ্বালানি ও যন্ত্র চালানোর জন্য তাপ, বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক যেসব শক্তির ব্যবহার আমরা করি তার উৎস বা আধারকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে আসে কয়লা, খনিজ তেল, খনিজ গ্যাস, পারমাণবিক জ্বালানি ও ভূ-তাপ। জ্বালানি হিসেবে বা শক্তি উৎপাদনের কাজে এগুলি একবার ব্যবহার করলেই ফুরিয়ে যায়। কোনওভাবেই এদের পুনর্ব্যবহারযোগ্য করা সম্ভব হয় না। কয়লার ছাই দিয়ে কি আর আগুন জ্বালানো যায়, না পেট্রোলের ধোঁয়া দিয়ে গাড়ি চলে? ফলে ব্যবহারের সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবীতে এই জ্বালানিগুলির সঞ্চয় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। এ-জন্য ইংরেজিতে এদের বলে 'নন রিনিউয়েবল এনার্জি'। রিনিউয়েবল এনার্জি হিসেবে ধরা হয় কাঠ ও অন্যান্য জৈব

ফ্যারেক্স®
মায়ের প্রথম পছন্দ!

নতুন উন্নত ফ্যারেক্স®
আপনার শিশুকে শক্ত-আহার ধরানোর জন্যে আদর্শ!
কারণ, এতে শিশু-বিকাশের উপযোগী উপাদান আছে।

প্রোটিন ও ফ্যাটের সঠিক মিশ্রণ
প্রোটিনে ভরপুর ফ্যারেক্স শিশুকে সুস্থসবলভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। নতুন উন্নত ফ্যারেক্স শিশুর কোমল হজম-শক্তির উপযোগী করে বিশেষভাবে তৈরী। এতে সঠিক পরিমাণে ফ্যাট মেশানো আছে।

সুস্থ রক্তের জন্যে যথেষ্ট আয়রন
সাধারণতঃ শিশুর শরীরে জমা আয়রন চতুর্থ মাসে কমে আসে। ফ্যারেক্স-এ যথেষ্ট পরিমাণে আয়রন আছে, যা শিশুর রক্ত সুস্থ রাখতে আর রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

ক্যালসিয়াম-ফসফরাসের আদর্শ অনুপাত
শিশুর দাঁত আর হাড় সুস্থভাবে গড়ে তোলার জন্যে ক্যালসিয়াম আর ফসফরাসের বিশেষ প্রয়োজন। এই জন্যেই ফ্যারেক্স-এ ক্যালসিয়াম-ফসফরাসের ২ঃ১ আদর্শ অনুপাত রাখা হয়েছে।

ফ্যারেক্স-এর প্রত্যেক আহার এখন অনেক বেশী সুস্বাদু। মেশানো আরও অনেক সহজ।

দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই!
শুধু জল মেশান আর খাওয়ান।

নতুন উন্নত ফ্যারেক্স®

CLARION/B/GX/15/244/BEN

পদার্থগুলিকে, যা আমরা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। যেহেতু কাঠ বা জৈব পদার্থ মানুষ ইচ্ছেমতো উৎপাদনে সক্ষম, সেজন্যেই এদের রিনিউয়েবল এনার্জি বা বারবার উৎপাদনযোগ্য শক্তির আধার বলে। যেসব শক্তির উৎস এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দীর্ঘকাল অটুট থাকবে তার মধ্যে আছে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি ও জলশক্তির উৎসগুলি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, শেষোক্ত এই তিন ধরনের শক্তির উৎস আপাতদৃষ্টিতে আলাদা মনে হলেও, আসলে কিন্তু উৎস একটিই। আর, তা হচ্ছে সূর্য। সূর্যের তাপে উত্তপ্ত না হলে বাতাস প্রবাহিত হয় না। বায়ু চলাচল না হলে হাওয়া-কল ঘুরবে কী করে? জলের ক্ষেত্রেও তাই। সূর্যের তাপে জল বাষ্প হয়। তার থেকে হয় মেঘ এবং মেঘ থেকে বৃষ্টি। এই বৃষ্টির জল ড্যামে জমা হলে তবেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। জোয়ার-ভাটা বা সমুদ্রের ঢেউ থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা ভাবা হচ্ছে, সেই জোয়ার-ভাটা ও ঢেউয়ের খেলার পেছনেও থাকে সূর্য।

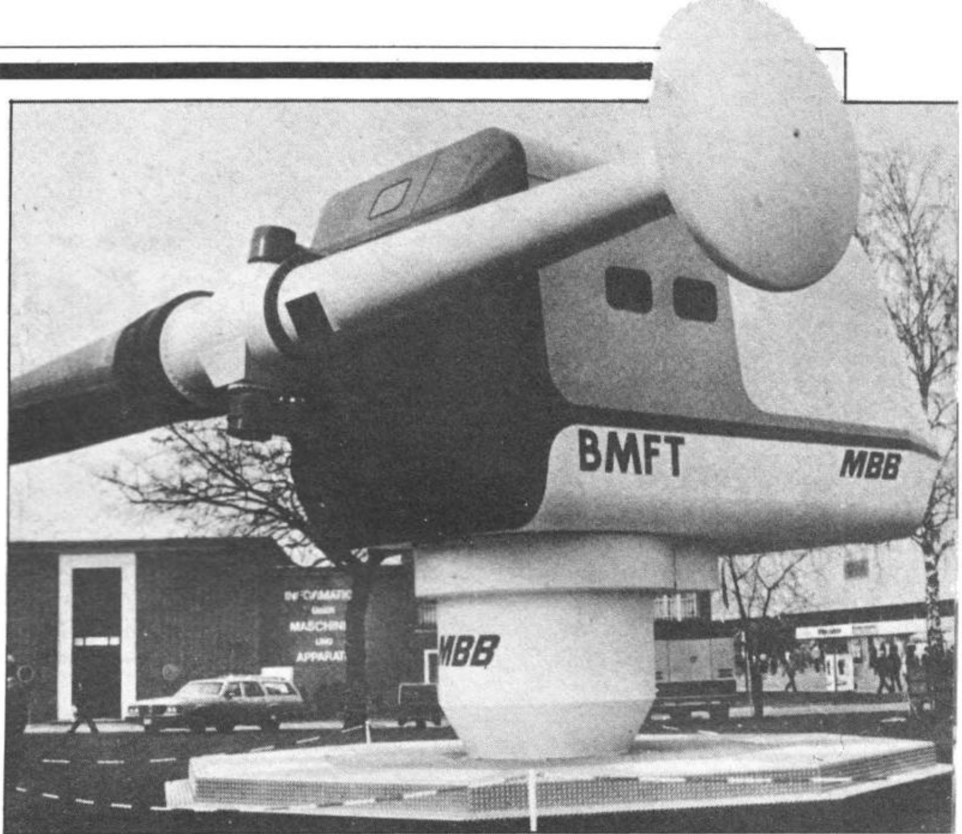

পশ্চিম জার্মানিতে বাতাসচালিত বিদ্যুৎ-কেন্দ্র। জ্বালানির খরচ এতে কমে যাবে

মানব-সভ্যতার শুরু থেকে শক্তির প্রয়োজনে কয়লা, কাঠ, খনিজ তেল—এই তিনের ব্যবহারই বেশি হয়েছে। ফলে ফুরিয়ে এসেছে এর ভাণ্ডার। অনুমান করা হচ্ছে, পৃথিবীর ভাঁড়ারে যা খনিজ তেল সঞ্চিত আছে তা আগামী তিরিশ বছরেই ফুরিয়ে যাবে। কয়লার ভাণ্ডার শেষ হবে একশো বছর পর। আর, কাঠ কাটতে কাটতে আমরা জঙ্গল প্রায় নিঃশেষই করে ফেলেছি। এর জন্যেই আফ্রিকায় এত খরা, ঘন-ঘন বন্যা আমাদের উপমহাদেশে।

জ্বালানির রসদ ফুরনো নিয়ে সারা পৃথিবীর টনক নড়ে ১৯৭৩-এ, যখন মধ্য প্রাচ্যের তেল উৎপাদক আরব দেশগুলির সংস্থা 'ওপেক' হঠাৎ খনিজ তেলের দাম অস্বাভাবিক বাড়িয়ে দিল। যদিও পৃথিবীতে আমাদের মতো উন্নয়নশীল ও গরিব দেশগুলি মোট বাণিজ্যিক শক্তির মাত্র আঠারো শতাংশ ব্যবহার করে, কিন্তু বেশি পয়সা দিয়ে তেল কেনার ক্ষমতা না থাকায় এই মূল্যবৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া হল দারুণ। দ্রুত নিঃশেষিত জ্বালানির ভাণ্ডার, মূল্যবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান জ্বালানি-চাহিদা মেটানো ও পরিবেশ দূষণের মোকাবিলা করে মানব-সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই বিকল্প শক্তি নিয়ে এত গবেষণা চলছে গত দেড় দশক ধরে সারা পৃথিবীতে। এটা এখন নিশ্চিত যে, বিকল্প শক্তি ব্যবহার ছাড়া উপায় নেই। ভবিষ্যতে শক্তির উৎস হিসেবে শক্তি-বিজ্ঞানীরা সূর্য, পারমাণবিক বিক্রিয়া, সমুদ্রের তাপ, ঢেউ ও স্রোত, ভূ-তাপ, অ্যালগি ও জৈব পদার্থ এবং আগ্নেয়গিরিগুলিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন। আজ পর্যন্ত গবেষণা করে অপ্রচলিত বা বিকল্প শক্তির যে চোদ্দটি উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে তা মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি যথাক্রমে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ, জৈব পদার্থ থেকে উৎপাদিত গ্যাস ও বিদ্যুৎ এবং ভূ-তাপ শক্তি।

সৌরশক্তি

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। আলো ছাড়াও সূর্য থেকে তাপও পাই আমরা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত ও উত্তপ্ত রাখতে প্রতি সেকেণ্ডে সূর্য থেকে $৩\cdot৮\times১০^{৩৩}$ আর্গস শক্তি বিকিরণ হচ্ছে। এজন্য প্রতি সেকেণ্ডে সূর্যের ভর কমছে ৪,৭০০,০০০ টন। পারমাণবিক বিক্রিয়ার ফলেই এই পরিমাণ শক্তি-উৎপাদন বিকিরণ সম্ভব। সূর্য থেকে যে পরিমাণ শক্তি এই পৃথিবীতে আসে তার এক শতাংশেরও কম গাছপালা, বাতাস ও সমুদ্র ধরে রাখতে পারে। সূর্য থেকে ভূপৃষ্ঠ এক ঘণ্টার কিছু কম সময়ে যে পরিমাণ সৌরশক্তি পায়, তা সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে ব্যবহার করতে পারলে সারা পৃথিবীর শক্তি-চাহিদা সহজেই মেটানো যেত। অন্যভাবে বলা যায়, সারা বছর ধরে যে পরিমাণ সৌরশক্তি পৃথিবীতে আসে তার মাত্র ০·১ শতাংশ দিয়েই আমাদের সারা বছরের কাজকর্ম চালানো যায় ভালভাবে।

সৌরশক্তি ব্যবহারের জন্য প্রধানত তিন রকমের পদ্ধতি এখন গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রথম পদ্ধতিতে সূর্যের আলো ও তাপকে সরাসরি কাজে লাগানো হয়। ফোটোভোল্টেইক কোষের মাধ্যমে সূর্যশক্তিকে বিদ্যুতে পরিণত করে সেই বিদ্যুৎ দিয়ে কাজ করা দ্বিতীয় পদ্ধতি। আর, তৃতীয় পদ্ধতিতে সূর্যের তাপে কোনও তরল পদার্থকে উত্তপ্ত করে সেই উত্তপ্ত তরলকে পাইপের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে জল গরম করে বাষ্প তৈরি করা হয়, যা বিভিন্ন যন্ত্র চালানোর কাজে লাগে। এ ছাড়া সুইমিং পুলের জল গরম করা, শীতকালে ঘর গরম রাখা ও ট্যাঙ্কের জল গরম করার কাজও এভাবে করা যায়।

ফোটোভোল্টেইক কোষ দু'স্তরের পাতলা সিলিকন পাত দিয়ে তৈরি। সূর্যের আলো যখন এই কোষের ওপর পড়ে, আলোর ফোটনকণা উত্তেজিত করে তোলে ইলেকট্রনগুলিকে। এই ইলেকট্রনগুলি তখন সিলিকনের প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে প্রবাহিত হতে শুরু করে এবং সরাসরি বিদ্যুৎ তৈরি হয়। সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করে বলে ফোটোভোল্টেইক কোষকে সৌরকোষও বলে। এ-ধরনের একটি

এরা সুপারফাইটার্স!

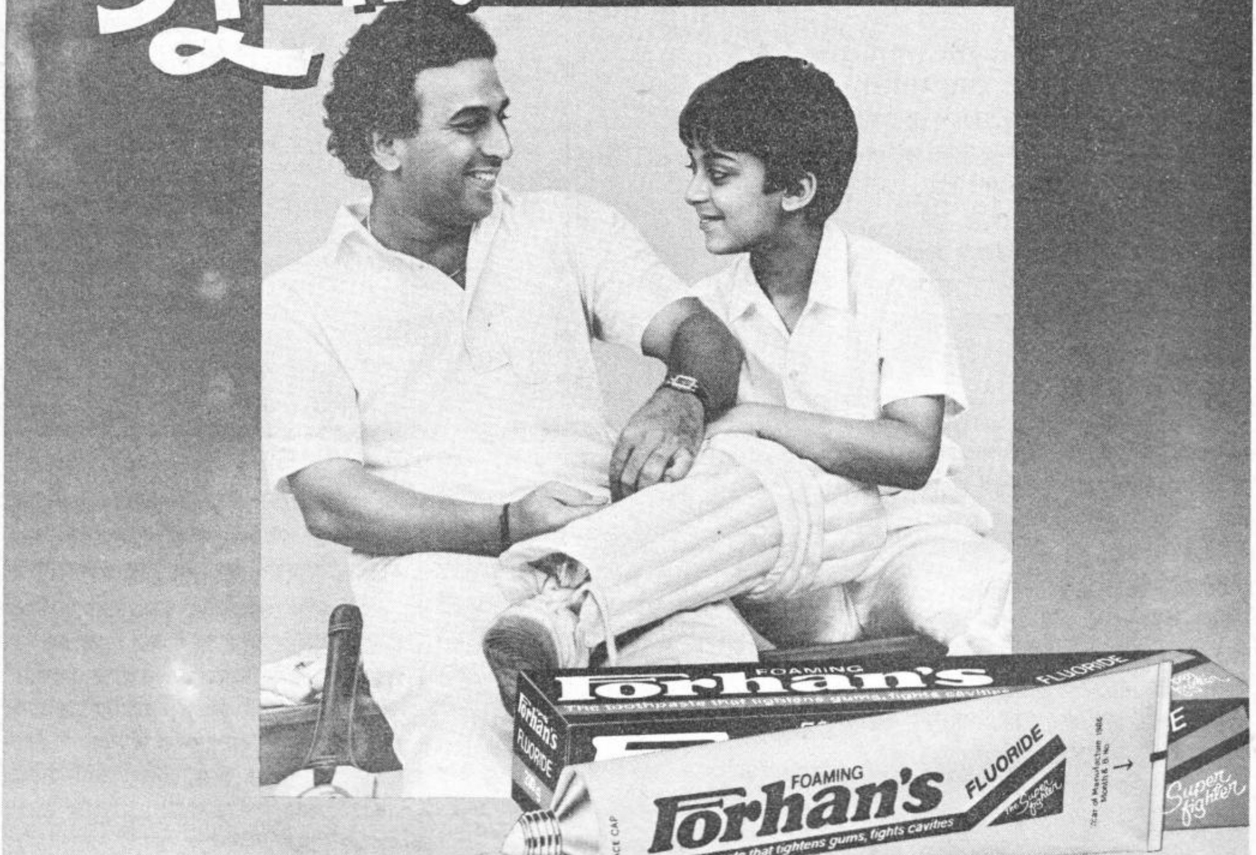

ওঁর কোটি-কোটি ফ্যানেরা বলে আমাদের 'লিট্‌ল মাস্টার'। সেরা জাত লড়িয়ে খেলোয়াড়। আর সারা জগত বলে, এই সুপারব্যাটসম্যান চিরকালের এক সেরা ক্রিকেটার। কিন্তু, সুনীল গাভাসকর নিজে বলেন, ''আমি একজন সুপারফাইটার। আমি চাই, আমার ছেলেও হয়ে উঠুক তাই। আর সেই কারণেই ওর ছোট্ট বয়স থেকেই আমি শেখাচ্ছি ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড টুথপেষ্ট দিয়ে নিয়মিত দাঁত মাজতে– দাঁতের ক্ষয় রোধে এ সত্যিই এক সুপারফাইটার।'' দাঁতের ফাঁক-ফোকরে খাদ্যকণা ঢুকে ব্যাকটিরিয়া জন্মায়। আর তার নিঃসৃত অ্যাসিডে দাঁতের ক্ষয়রোগ হয়। ফরহ্যান্স সুপারফাইটার-এর ফ্লোরাইড চমৎকার ভাবে কাজ করে দাঁতের এনামেলকে মজবুত ভাবে সুরক্ষিত রাখে। যার ফলে ব্যাকটিরিয়া জন্মায় না আর অ্যাসিড-ও জমে না। আর ফরহ্যান্স-এর বিশেষ অ্যাস্ট্রিন্‌জেন্ট মাড়িকে আঁটসাঁট মজবুত রাখে। যার ফলে দাঁত মাড়িতে শক্ত-মজবুত, অনড় হয়ে বসে থাকে ও দীর্ঘকাল মুক্তোর মত ঝক্‌মকে রাখে।

সুনীলের কথায়– ''আমার ছেলে আছে ফরহ্যান্স-এর যত্নে। আপনি কি করছেন সে ব্যাপারে?''

ফরহ্যান্স
যত্ন
৩২ অতন্দ্র প্রহরী

GM-113/86 Ben

সৌরকোষের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা খুব কম। সেজন্য একাধিক সৌরকোষকে পরস্পর যুক্ত করে সোলার মডিউল তৈরি করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। সৌরকোষে উৎপন্ন বিদ্যুৎ দিয়ে গাড়ি চালানো, ব্যাটারি চার্জ করা, রাস্তার আলো জ্বালানো, উপগ্রহের যন্ত্রপাতি চালু রাখা, টেলিভিশন চালানো, পাম্পের সাহায্যে সেচ দেওয়া ও আরও অনেক রকমের কাজ করা সম্ভব। সৌরশক্তি সহজে ব্যবহার করে আর যে-কাজটি সহজেই করা যায় তা হল রান্না। আর, এর জন্য দরকার একটি সৌর-উনুন বা সোলার-কুকার। তবে আকাশ যদি মেঘে ঢাকা থাকে, এই উনুনে কিন্তু রান্না করা যাবে না। সৌরশক্তি ব্যবহারে এটা এক সমস্যা। আর এক সমস্যা সৌরশক্তি সংগ্রহ করে সঞ্চয় করে রাখার। শক্তি-বিজ্ঞানীরা এই সমস্যা দুটির সমাধানে নিরন্তর গবেষণা করে চলেছেন। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এই দুই সমস্যাকে দূর করা সম্ভব হবে। যেমন ইতিমধ্যে সম্ভব হয়েছে সৌরকোষ-চালিত মোটরগাড়ির ব্যাটারিতে বিদ্যুৎ ফুরিয়ে গেলে, এখনকার পেট্রোল পাম্পের মতো সৌর-বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রে গিয়ে ব্যাটারিতে বিদ্যুৎ ভরে নেওয়া।

বায়ুশক্তি

বায়ুশক্তিকে প্রয়োজনে কাজে লাগাতে শিখেছে মানুষ প্রায় সাড়ে-বারোশো বছর আগে হাওয়া-কল তৈরি করে। হাওয়া-কলে থাকে দুটি বা তিনটি ব্লেড এবং একটি রোটর। এই রোটরের সাহায্যে যে-যন্ত্রটি চালানো হবে, তা চেন দিয়ে যোগ করা থাকে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বা সেচের পাম্প ও খামারবাড়ির অন্যান্য যন্ত্র চালানোর কাজে বায়ুশক্তির ব্যবহার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্রমশই বাড়ছে। বায়ুশক্তির ব্যবহারে দুটি অসুবিধে বর্তমানে এর জনপ্রিয়তার অন্তরায়। প্রথমত, হাওয়া-কল তৈরি বেশ খরচসাপেক্ষ। এ ছাড়া, যখন বাতাস স্থির থাকে, হাওয়া-কল কাজ করে না। শক্তি-বিজ্ঞানীরা মনে করেন খুব শীঘ্রই কম খরচে হাওয়া-কল তৈরি সম্ভব হবে। কিন্তু অন্য অসুবিধেটি দূর করার ক্ষমতা মানুষের সাধ্যের বাইরে।

ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র

এতদিন জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বড়-বড় নদীতে বাঁধ দিয়ে, জল ধরে রেখে, সেই জল দিয়ে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হত। কিন্তু এখন খুব ছোট-ছোট টারবাইন তৈরি করা হচ্ছে, যা ছোটখাটো ঝরনা বা জলপ্রপাতের ধারার নীচে বসিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। পাহাড়ি এলাকার গ্রামে বা শহরে এ-ধরনের জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র খুব কাজে আসবে। শক্তি-বিজ্ঞানীরা এই মাইক্রো বা মিনি পাওয়ার স্টেশন বসিয়ে পাহাড়ি এলাকায় গাছ কাটা বন্ধ করা ছাড়াও শিল্প স্থাপনের বিশাল সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছেন।

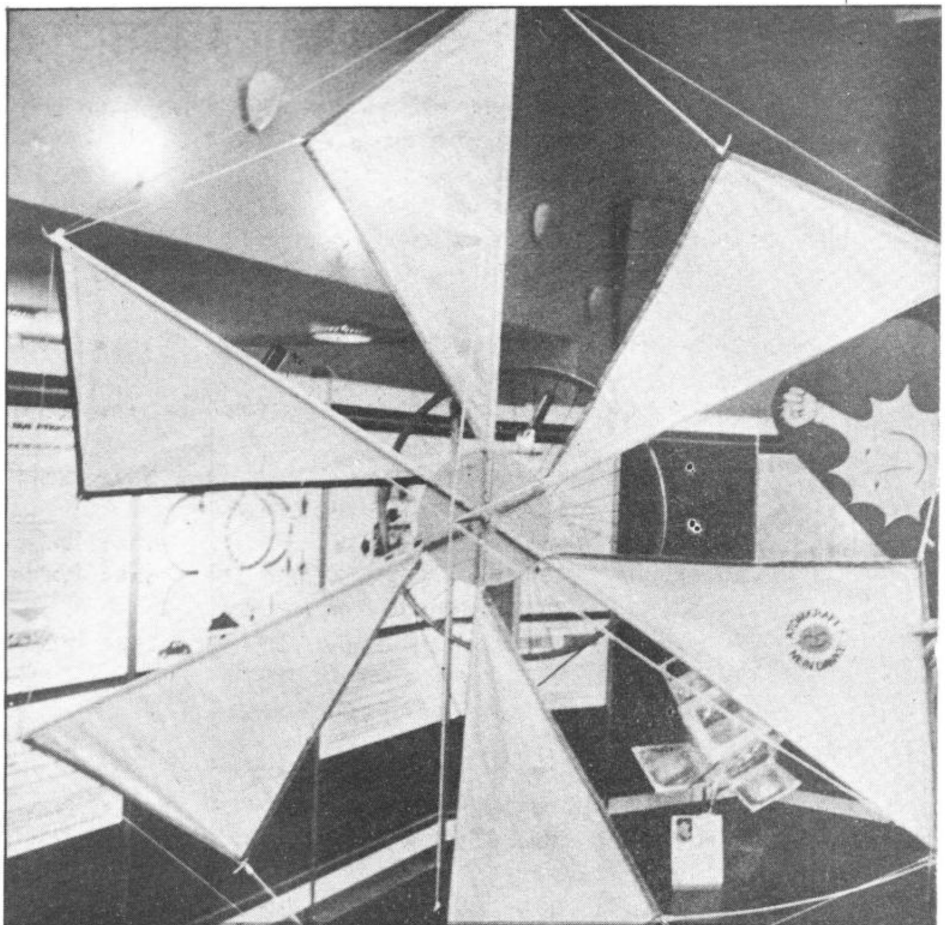

প্রাচীন গ্রিসের হাওয়া-কলের মডেল। পশ্চিম জার্মানিতে শক্তি ও পরিবেশ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক এক প্রদর্শনীতে এই মডেলটি দেখানো হয়

জৈব পদার্থ থেকে শক্তি

জৈব পদার্থ বা বায়োমাসকে সরাসরি জ্বালানি হিসেবে, পচিয়ে বা জৈব গ্যাস প্রস্তুত করে ব্যবহার করা যায়। কাঠ ছাড়াও শহরের আবর্জনা, কৃষি-শিল্পের আবর্জনা, কৃষি খামারের বর্জ্য পদার্থ ও আখ জাতীয় ফসলের ছিবড়ে জৈব পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও আখ ও সুগারবিটের রস পচিয়ে অ্যালকোহল তৈরি করা হচ্ছে মোটরগাড়ি চালানোর জন্য। আবর্জনা জাতীয় জৈব পদার্থ সরাসরি পুড়িয়ে যে কাজগুলি করা হয় তার মধ্যে আছে রান্না করা, শিল্পের প্রয়োজনে বাষ্প তৈরি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রের বয়লার চালানো।

তাপ রসায়ন প্রক্রিয়ায় কাঠ অথবা কৃষিক্ষেত্রের আবর্জনা অক্সিজেনবিহীন আধারে পুড়িয়ে কাঠকয়লা প্রস্তুত করা হয়। এই কাঠকয়লার বিভিন্ন শিল্পে খুবই চাহিদা। কাঠ থেকে কাঠকয়লা তৈরি করলে তা সহজেই স্থানান্তর করা যায়। কাঠ অপেক্ষা কাঠকয়লার উনুন ব্যবহারেও সুবিধে। তাপের অপচয় কম হয়।

আগে আমাদের দেশে গোবর সরাসরি জ্বালানি অথবা সার হিসেবে ব্যবহৃত হত। এখন গোবর থেকে বায়োগ্যাস তৈরি করে ওই গ্যাস রান্না ও আলো জ্বালানোর কাজে লাগানো হচ্ছে। তারপর গ্যাস উৎপাদনে ব্যবহৃত গোবর বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে তুলে এনে ঢালা হচ্ছে চাষের জমিতে। গোবরগ্যাস জ্বালানি হিসেবে সহজেই ব্যবহার করা যায়। কারণ, এতে আছে শতকরা ৫৫ থেকে ৭০ ভাগ মিথেন। ফলে একই গোবর ব্যবহার

শক্তি ব্যবহারের সালতামামি

সাল	উল্লেখযোগ্য ঘটনা
৫০০০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে	মানুষ আগুনের ব্যবহার শুরু করে।
৯০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	কৃষিকাজ শুরু।
৬০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	গোরু, ছাগল, শুয়োর, ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশু হিসেবে লালনপালন শুরু হয়।
৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	ঘোড়াকে গৃহপালিত পশু হিসেবে ব্যবহার।
৩৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	চাকার আবিষ্কার (সম্ভবত মেসোপটেমিয়ায়)।
১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	লৌহ-প্রযুক্তির উদ্ভাবন।
৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	গ্রিসে প্রথম জল দিয়ে চাকা ঘোরানো হয়।
৬৫০ খ্রিস্টাব্দ	হাওয়া-কল (উইন্ডমিল) আবিষ্কার।
৮৫২ খ্রিস্টাব্দ	ঘর গরম করার জন্য ইংল্যান্ডের এক মঠে প্রথম কয়লা পোড়ানো শুরু।
১২৩৯ খ্রিস্টাব্দ	কর্মকার ও মদ প্রস্তুতকারীরা জ্বালানি হিসেবে প্রথম কয়লা ব্যবহার শুরু করেন।
১৬০০ খ্রিস্টাব্দ	ফ্রান্সের ভার্সাই-এ প্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গবেষণা শুরু।
১৬০৬ খ্রিস্টাব্দ	প্রথম পরীক্ষামূলক বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি।
১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ	জেম্‌স ওয়াট বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরিতে সফল হন।
১৮২০—৬০ খ্রিস্টাব্দ	বিদ্যুৎ-ব্যবহার নিয়ে ওর্স্টেড, অ্যামপিয়ার, ফ্যারাডে ও ম্যাক্সওয়েল বহুমুখী গবেষণা করেন।
১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ	আমেরিকার পেনসিলভেনিয়ায় প্রথম খনিজ তেলের কুয়ো খোঁড়া হয়।
১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ	পেট্রোল-চালিত ফোর স্ট্রোক ইন্টারনাল কম্বাশটন ইঞ্জিনের আবিষ্কার।
১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ	রেডিও অ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন বিকারেল।
১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ	রাইট ভাইদের তৈরি বিমান আকাশে ওড়ে।
১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ	তরল জ্বালানি ব্যবহার করে প্রথম রকেট ওড়ান গডার্ড।
১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ	জেট বিমানে আকাশ-ভ্রমণ শুরু।
১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ	শিকাগোতে প্রথম পরমাণু-চুল্লি চালু করেন ফার্মি।
১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ	প্রথম পরীক্ষামূলক অ্যাটম বোমা ফাটানো হয় আমেরিকার নিউ মেক্সিকোতে।
১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ	পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম হাইড্রোজেন বোমা ফাটানো হয়।
১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ	রাশিয়া মহাকাশে প্রথম উপগ্রহ স্পুটনিক-১ উৎক্ষেপণ করে এবং আমেরিকা চালু করে প্রথম পরমাণু-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।
১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ	মানুষের চাঁদে অবতরণ।

থেকে চাষিরা পাচ্ছেন দু'রকমের উপকার।

আখ ও সুগারবিটের রস পচিয়ে ইথানল বানিয়ে পেট্রোলের সঙ্গে মিশিয়ে মোটরগাড়ি চালানোতে ব্রাজিল বহুদিন আগেই সাফল্য পেয়েছে। এখন অন্য দেশেও এর গবেষণা চলছে। আখ ও সুগারবিট ছাড়াও অ্যালকোহল তৈরির জন্য কাসাভা, জোয়ার ও ভুট্টার ব্যবহারের চেষ্টাও বিজ্ঞানীরা করছেন।

ভূ-তাপ শক্তি

যেসব জায়গায় উষ্ণ প্রস্রবণ আছে সেখানে মাটির তলায় জল গরম হয় ভূ-তাপে। অনেক জায়গায় মাটির নীচে থেকে গরম বাষ্পও পাওয়া যায়। এই বাষ্প দিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। উষ্ণ প্রস্রবণের গরম জল দিয়ে ফসল সংরক্ষণ, ঘর গরম রাখা ইত্যাদি কাজও করা যায়।

আরও কিছু তথ্য

সৌরশক্তি দিয়ে যে মোটরগাড়িগুলি চলে তাদের নাম 'সোলার মোবিল'। সোলার মোবিলের ফোটোভোল্টেইক কোষ বিদ্যুৎ তৈরি করে গাড়ির ব্যাটারিতে পাঠায়, যা দিয়ে গাড়ি চলে। সুইজারল্যাণ্ডে গত বছর প্রথম সোলার মোবিলের রেস হল। 'ডেমলার বেঞ্জ সোলার সিলভার অ্যারো' নামের জার্মানির একটি গাড়ি এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়।

সৌরশক্তি ব্যবহারে আমাদের দেশ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে সৌরশক্তি দিয়ে ২৭৮টি জল গরম করার যন্ত্র বিভিন্ন শিল্পে বসানো হয়েছে। প্রতিদিন প্রায় সওয়া পাঁচ লক্ষ লিটার জল গরম করা যায়। সৌর উনুনে রান্না হচ্ছে এখন দেশের কয়েক লক্ষ বাড়িতে। যেভাবে কাজ চলছে তাতে সবার ধারণা ১৯৯০ নাগাদ সৌরশক্তি ব্যবহার করে পাঁচ লক্ষ টন কয়লা বাঁচানো সম্ভব হবে।

জ্বালানি হিসেবে তরল হাইড্রোজেন ব্যবহারের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। আর, এই পৃথিবীতে সৌরশক্তির মতো হাইড্রোজেন সরবরাহেও সহজে ঘাটতি হবে না। হাইড্রোজেন উৎপাদনের খরচও কম। সহজেই পাইপের ভেতর দিয়ে স্থানান্তর করা যায়। তরল হাইড্রোজেন সংগ্রহ করাও সুবিধে এবং এতে সহজে আগুন ধরে না।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন মহাকাশে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করে সেখানে সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে পৃথিবীতে পাঠানো সম্ভব। আমেরিকায় এ নিয়ে গবেষণাও শুরু হয়ে গেছে। স্পেস স্টেশন তৈরি হলে এই গবেষণা আরও নিবিড় হবে।

ম্যাগনেটো হাইড্রো ডাইনামিক্স হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি, যার দ্বারা কয়লার গরম গ্যাস সরাসরি উচ্চশক্তিশালী চুম্বকের ওপর দিয়ে প্রবাহিত করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়। বর্তমানের তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্রে এই পদ্ধতি চালু করলে প্রচুর কয়লা বাঁচানো যাবে।

গোবরগ্যাস ব্যবহার করে ইতিমধ্যে আমাদের দেশে বছরে ১০০ কোটি টাকার কাঠ বাঁচছে এবং যা সার পাওয়া যাচ্ছে, তার দাম আরও ১০০ কোটি টাকা।

ডোরাকাটা জামা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : ইস্কুলের ফাংশানে মজার সব কাণ্ড। বেঁটে আর লম্বু নিতুকে নিয়ে পালিয়েছিল। সুকু, কমল ভৌমিক এবং ডি· এম· ওদের ধরে ফেলেন। লম্বু আসলে গোয়েন্দা-লেখক সুদর্শন। বেঁটে পালাল, ডি· এম'ও চলে গেলেন। সুদর্শনের হার্ট অ্যাটাক হল। ডক্টর মুখার্জি আলম সাহেবের ডেরার কুলুঙ্গি থেকে সাপের বিষের শিশি নিয়ে হাসপাতালে ফিরলেন। তারপর নিতু, সুকু, কমল ভৌমিককে নিয়ে বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে নিলেন। এমন সময় হরেনদা এলেন। তিনি নিতুকে দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। হঠাৎ সেখানে হাজির হলেন চৌবে। হরেনদা এক সময় চৌবের কাছ থেকে একটা গোরু কিনেছিলেন। তার জন্যে দু' হাজার টাকা দিয়েছিলেন। সেই দু' হাজার টাকার নোট ছিল জাল। হরেনদাকে হাতে পেয়ে চৌবে থানায় ফোন করলেন। একদল পুলিশ এল। হরেনদা বললেন, ওই টাকা তিনি উইলিয়ামসনের পোড়ো বাড়ির জঙ্গলের মধ্যে একটা স্যুটকেস থেকে পেয়েছেন। তারপর···

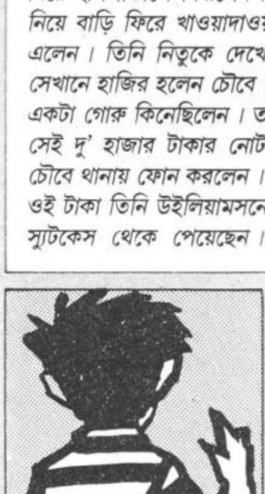

উইলিয়ামসনের পোড়ো বাংলোয় সুকু অনেকবার গেছে। সেখানে এখনও একটা বাগান আছে। ভাল ভাল গাছ অযত্নে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সুকু মাঝে-মাঝে সেই বাগান থেকে চারা তুলে এনে নিজেদের বাগানে লাগায়। এই তো সেদিন একটা মুসান্ডা তুলে এনে লাগিয়েছে। গাছটা বেঁচেও গেছে। ওই বাগানে সাত-আটটা ম্যাগনোলিয়া গাছ আছে। ফুল যখন ফোটে গন্ধে চারপাশ একেবারে মাত হয়ে যায়। ইয়া বড়-বড় চাঁপা রঙের ফুল। সুকু গাছ ছাড়াও আরও একটা কারণে যায়। উইলিয়ামসনের গ্রেহাউণ্ড কুকুরটা এখনও ওই বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। বয়েস হয়ে গেছে। চোখে ভাল দেখতে পায় না। অবিরত জল পড়ে। বাগানের শেষ মাথায় সায়েবের ছোট্ট মেয়ে লিলির সমাধি। কুকুরটা সারাদিন, সারারাত সেই সমাধির পাশে শুয়ে থাকে। সুকু রোজ গিয়ে সেই কুকুরটাকে খাইয়ে আসে। ওষুধ খাওয়ায়, চোখে আই ড্রপস দেয়। কুকুরটা এখন সুকুর পরম বন্ধু।

থানা অফিসার হরেনদাকে নিয়ে চলে গেলেন। ডক্টর মুখার্জি বললেন, "আমার আর ভাল লাগছে না। এক-একটা সময়ে, এক-একটা ব্যাপারে মানুষ এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে। আমার কাজকর্ম, লেখাপড়া সব মাটি হয়ে গেল। আমি এখন লেখাপড়া করতে চললুম।"

কমল ভৌমিক বললেন, "আমারও খুব ক্ষতি হয়ে গেল। আজ আমার পায়ের ব্যায়াম করার দিন।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "সে আবার কী ? শুধু পা ! হাত, বুক, গলা ?"

চৌবে বললেন, "ডক্টরসাব, মডার্ন মেথডে এক-একদিন এক-এক অঙ্গের ব্যায়াম করতে হয়। আজ আমি বুকের ব্যায়াম করেছি। সাড়ে সাতশো ডন মেরেছি সাতবারে।"

"ভাল করেছেন। আমি এখন চললুম।"

চৌবে বললেন, "আজ যখন সব গোলমাল হয়ে গেল, তখন আরও একটু হোক। আমার ফাংশানে চলুন। সকলে মিলে বেশ একটু আনন্দ করা যাক।"

"আমার কাজেই আনন্দ। আমার এক রুগি হাসপাতালে পড়ে আছে। যায়-যায় অবস্থা। তার জন্যে পড়াশোনা করতে হবে। আমি ক্ষমা চাইছি। কমলবাবুকে নিয়ে যান।"

"গুরুজি তো যাবেনই। আপনারাও চলুন না। জাস্ট ফর এ ডে।"

"উপায় নেই চৌবেসাব। কুর্তব্য আগে, আনন্দ পরে।"

কমল ভৌমিক বললেন, "আজ আমাদের ছেড়ে দাও চৌবে। আজ আমাদের অবস্থা খুব খারাপ। এই ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। হরেনবাবুর ভাগনে।"

"কী হয়েছে ওর ?"

নিতুর দিকে চোখ গেল চৌবের। নিতু একপাশে বসে আছে। কেমন যেন হয়ে গেছে ! হঠাৎ আকাশ থেকে পড়ে গেলে যেমন হয়, নিতুর মনের অবস্থা সেইরকম। ডোরাকাটা জামাটা কেচে দিয়েছে। শুকিয়ে গেলে পরতে হবে। আর পরলেই জানে, তার মন ঠিক হয়ে যাবে। পথ দেখতে পাবে। নিতুর বাবা যাবার আগে বলেছিলেন, এই জামা তোমার বিপদের বর্ম।

কমল ভৌমিক বললেন, "হরেনবাবু ওকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

চৌবে বললেন, "তাতে কী হয়েছে ! আমি আছি তো ! আমি ওকে মানুষ করে দেব। মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দেব। আমার বাড়িতে থাকবে। আমার ছেলেপুলে নেই। আমার স্ত্রী খুব খুশি হবেন। সুন্দর চেহারা। এখন থেকে ব্যায়াম করালে আমার মতো চেহারা হবে।"

"না না, ওর থাকার কোনও সমস্যা নেই। বউদি ভার নিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু ওকে এখানে রাখা যাবে না। হরেনবাবুর অনেক শত্রু। তারা ওর ক্ষতি করবে। এই তো কালই ওকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছিল।"

"কে, কে ? কে কিডন্যাপ করেছিল ? গুরুজি, আমি কি মরে গেছি ! কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আমি দেখে নিতে চাই। চৌবে বন্দুক ছেড়েছিল। আবার বন্দুক ধরবে।"

"ধরেছিল বেঁটে।"

"বেঁটে ? বেঁটে আবার ফিরে এসেছে আমার টেরিটোরিতে ! আচ্ছা ! ভেবেছে আমি কমজোর হয়ে গেছি ? আজ রাতেই আমি ব্যবস্থা করছি। কোন্‌দিকে গেছে ?"

"মনে হয় পাহাড়ের দিকে।"

daCunha/GCM/135/86 BEN

"আচ্ছা ! আজই আমি ঘোড়া ছোটাব ।"

"তোমার উৎসব ?"

"ডাক্তারসাব বললেন, কর্তব্য আগে, আনন্দ পরে ।"

"মেরে ফেলবে ? খতম করে দেবে ?"

"না না, খতম কেন করব । আমি খুনি নই । হাত-পা বেঁধে শিশুগাছে ঝুলিয়ে দেব । সাতদিন ঝুলে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে । তলা থেকে গন্ধকের ধোঁয়া দেব । ব্যাটার চরিত্র বিলকুল ঠিক হয়ে যাবে ।"

"আর, ধরো, যদি মরে যায় ?"

"মরে গেলে বুঝব, ব্যাটা দুবলা ছিল । মানুষ তো একদিন মরবেই গুরুজি । কে কবে চিরকাল বাঁচে !"

চৌবে চলে গেল । মুখ দেখে মনে হল, খুব রেগে গেছে । কমল ভৌমিক সুকুকে বললেন, "আমি ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নেবার জন্যে তোমাদের ছাতে চললুম, একটা কিছু দিতে পারো, পেতে একটু গড়িয়ে নেব ।"

রুকু বললে, "আপনি এই ডিভানে শুয়ে পড়ুন, কেউ বিরক্ত করবে না ।"

"আরে সে তো আমি জানি, কিন্তু খোলা আকাশের নীচে চিত হয়ে শোওয়ার আনন্দ জানো ? ওপরে ঘন নীল আকাশ, পাখি উড়ছে । প্লেনের মতো ডানা মেলে চিল ভাসছে । উঃ, ভাগ্যিস জন্মেছিলুম, তাই তো এইসব দেখতে পাচ্ছি ।"

কমল ভৌমিক আপনমনে গান গেয়ে উঠলেন, "তাই তোমার আনন্দ আমার পর/ তুমি তাই এসেছ নীচে/ আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর/ তোমার প্রেম হত যে মিছে ।"

রাজ্যেশ্বরী দরজার কাছ থেকে বললেন, "আপনি এত ভাল গান জানেন । থামলেন কেন ? ওই গানটা আমার ভীষণ প্রিয় ।"

"জানেন বউদি, এটা হল আমার আসনের গুণ । তেড়ে একমাস শশঙ্গাসন করলেই গলা একেবারে মিছরির ছুরি । হাঁ করলেই সুর ঝরবে ।"

রাজ্যেশ্বরী রুকুকে বললেন, "হারমোনিয়ামটা কাকুকে এনে দাও তো !"

কমল ভৌমিক বললেন, "বউদি, এখন কি ঠিক হবে ! ও-ঘরে দাদা লেখাপড়া করছেন ।"

"ওঁর কানের কাছে ঢাক-ঢোল বাজালেও কিছু হবে না । পড়তে বসলে মনটা লেগে যায় ।"

"দাদা, আমার যোগী ।"

হারমোনিয়াম এসে গেল । কমল ভৌমিক সেইরকম গাইয়ে, যাঁকে বেশি খোশামোদ করতে হয় না ।

হারমোনিয়াম আসতেই গান ধরে ফেললেন, "আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা/ আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা/ মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে/ তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে ।"

গান না শুনলে বোঝাই যেত না কমল ভৌমিক কত উঁচু দরের গাইয়ে । ডাক্তারবাবু ডাক্তারি-বই ছেড়ে কার্পেটের একপাশে এসে বসলেন । তাঁর চোখ দুটি ছলছল করছে । গান শুনলে তাঁর মনটা কেমন করে ওঠে । চোখের সামনে ভেসে আসে অতীতের সব দৃশ্য । বাবার হঠাৎ মৃত্যু, মায়ের মৃত্যু । কাশীর গঙ্গার ঘাটে প্রায় সন্ধেবেলা মালা জপ করতে করতে মা হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন । সূর্য অস্ত গেল, মা'ও অস্তে গেলেন । কী যে হয়, গান শুনলেই দুঃখের দরজা খুলে যায় । মনের ভেতর হুহু করে বইতে থাকে উত্তুরে বাতাস । গান শেষ হল ।

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "আপনি কত ভাল গান করেন, তার প্রমাণ ডাক্তারকে বই-ছাড়া করেছেন । এমন হয় না ।"

ডাক্তার বললেন, "জিমন্যাসটিক ছেড়ে আপনি গানের লাইনে চলে আসুন । প্রকৃতই অসাধারণ ।"

কমল ভৌমিক চোখ ছলছল করে বললেন, "আর আমার গান, আমার আবার লাইন, আমার জীবন হল বহতা পানি আর রমতা যোগীর মতো । ওই নিতুতে আর আমাতে কোনও তফাত নেই । কলকাতায় পড়ে থাকি আমার ক্লাবঘরের আটচালায় । সকালে হেদুয়াতে চান আর সাঁতার একসঙ্গে সেরে নিই । ওই যে আমার বাড়িটাড়ির কথা বলছিলুম না, ও প্রায় গল্পের মতো । থেকেও নেই । বিরাট তিনতলা বাড়ি । দূর থেকে দেখি । ঢোকার উপায় নেই, সাতটা মামলা ঝুলছে । বাবাতে, জ্যাঠাতে, কাকাতে । দু'বার মর্টগেজ পড়ে গেছে । আমার হল ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে ।"

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "আপনি আমাদের কাছে থাকুন ।"

"কতজনকে পালন করবেন বউদি ! বাড়িটা যে শেষে আশ্রম হয়ে যাবে বউদি ।"

ডাক্তার বললেন, "এটা তো আশ্রমই কমলবাবু । আমার অনেক প্ল্যান আছে । এতকাল নিজের জন্যে বেঁচেছি, প্রায়ই ভাবি, এবার অন্যের জন্যে বাঁচা শিখতে হবে । অবশ্য আপনার তো আবার নিজের প্রতিষ্ঠান রয়েছে কলকাতায়, এখানে থাকলে কে চালাবে ?"

কমল ভৌমিক হারমোনিয়ামে আঙুল চালাতে চালাতে বললেন, "কলকাতার ক্লাব তুলে নেবার সময় হয়েছে । আমাদের কালে ব্যায়াম করতুম সুস্বাস্থ্যের জন্যে, দেশের কাজে লাগার জন্যে । স্বামীজি ব্যায়াম করতেন সাধনার জন্যে, ভগবানকে পাবার জন্যে । আর একালে ব্যায়াম করে মারামারি, কাটাকাটি করার জন্যে । দুর্বলের ওপর অত্যাচার করার জন্যে । আজকাল প্রায়ই পুলিশ আসে, হামলা করে । বলে, এই মশাই, আপনার ক্লাবের ছেলে এই করেছে, ওই করেছে ।"

কমল ভৌমিক গান ধরলেন, "তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে, যত দূরে আমি ধাই ।"

গান শুনতে শুনতে নিতুর মনটা অন্যরকম হয়ে গেল । গান শুনলেই তার এইরকম হয় । মনে হয়, পাখি হয়ে গেছে । কমলকাকুর

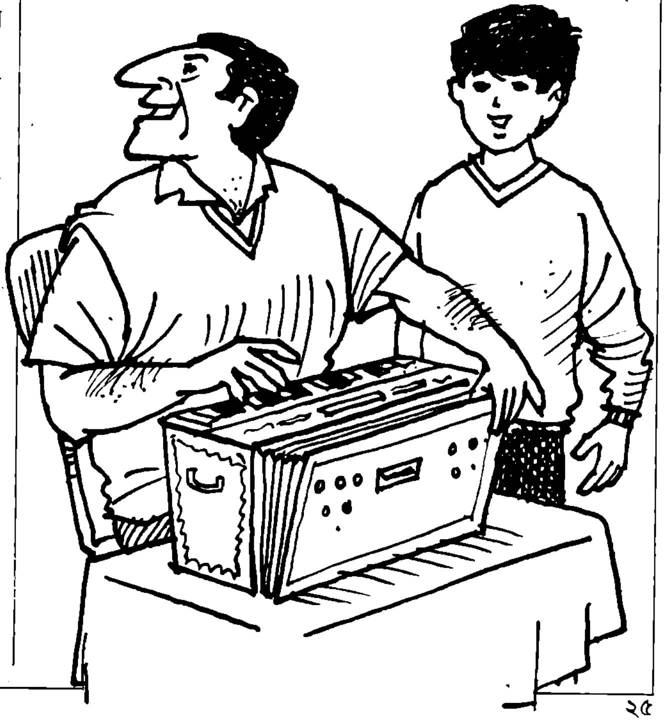

সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইতে ইচ্ছে করছে। আর কিছুক্ষণ বসে থাকলেই সে গেয়ে ফেলবে। নিতু ধীরে-ধীরে বাইরে বেরিয়ে এল। ইঁদারার ওদিকে বাগানের শেষ মাথায় নিতুর ডোরাকাটা জামাটা তারে শুকোচ্ছে।

নিতু জামাটা তোলার জন্য এগিয়ে গেল। দু'পাশে গোলাপের বেড। সাদা, লাল, হালকা হলুদ। সারা বাগানে হরেক ফুল থইথই করছে। নিতু তার থেকে জামাটা তুলে পরে ফেলল। জামাটা তার পরা দরকার। জামাটা না পরলে তার সব গুলিয়ে যাবে। কী করতে কী করে বসবে।

নিতু জামা গলিয়ে ফিরে আসছে ইঁদারার দিক থেকে। কমল ভৌমিকের উদাস করা গান কানে আসছে। হঠাৎ নিতুর চোখ চলে গেল গেটের দিকে। সাদা ধবধবে বিশাল একটা কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। একটু বয়েস হলেও বেশ খাড়া আছে। নিতু বাড়ির দিকে ছুটল। সুকুকে ডাকতে হবে।

সুকু একপাশে বসে তন্ময় হয়ে গান শুনছিল। নিতু তার কানে-কানে বললে, "বিশাল একটা সাদা কুকুর গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। দেখবে চলো।"

সুকু ছুটে এল। আরে এ তো সেই উইলিয়ামসনের কুকুর সুকু গেটটা খুলে দিল। কুকুরটা এসে সামনের দুটো পা সুকুর বুকের ওপর তুলে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে আর গাল চাটছে। নিতু দেখলে, কুকুরটার দু' চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

সুকু মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বললে, "বুঝেছি, অ্যালফ্রেড. দু'দিন তোমার খাওয়া হয়নি। আমি তো এক্ষুনি যাচ্ছিলুম, তোমার কাছে। তুমি কষ্ট করে এতটা পথ এলে কেন ? যদি গাড়ি-চাপা পড়তে ! যদি রাস্তার কুকুর তোমাকে কামড়াত !"

সুকু আর নিতু দু'জনে মিলে অ্যালফ্রেডকে খাওয়াল, মাংস-ভাত। অ্যালফ্রেড চকচক করে এক বাটি জল খেল। তারপর ইঁদারার পাশে, পেঁপেগাছের তলায় সামনের দুটো পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। সুকু নিতুকে বললে, "চলো, অ্যালফ্রেডকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার সন্দেহ হচ্ছে, উইলিয়ামসনের বাংলোয় পুলিশ গেছে। তারা নিশ্চয় এমন কিছু করেছে, যার ফলে অ্যালফ্রেড বিরক্ত হয়ে চলে এসেছে।"

সত্যিই তাই। ব্যাপার খুব ঘোরালো। সারা বাংলোটা পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। পুলিশ কমিশনারের বিশাল বিলিতি গাড়ি একপাশে দাঁড়িয়ে। ওয়্যারলেসের অ্যান্টেনা ল্যাকপ্যাক করছে গাড়ির সামনের বনেটে। ভেতরে ওয়্যারলেস রিসিভার ঝাঁঝাঁ করছে। পুলিশ সুকু আর নিতুকে কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দেবে না। বাংলোর ছাতে পুলিশ। দোতলার বারান্দায় পুলিশ। সুকু আর নিতু অনেকক্ষণ দাঁড়াবার পর সেই চেনা অফিসারের দেখা পেল। জিজ্ঞেস করলে, "কী হয়েছে ?"

অফিসার বললেন, "কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়েছে।"

নিতু বললে, "কী সাপ ?"

"কেউটে সাপ।"

সুকু বললে, "তার মানে ?"

সুকু বললে, "তার মানে ?"

"মাস্টার, তুমি মানে জিজ্ঞেস করছ ? তুমি এত বুদ্ধিমান ছেলে ! আরে,এইখানেই তো সেই নোট-জালের কারখানা। ভেতরে দু'জন ঘুমোচ্ছিল। আমরা তাদের অ্যারেস্ট করেছি। খুব গুলি-চালাচালি হয়ে গেছে। আমাদের দু'জন হাসপাতালে চলে গেছে। ফাটাফাটি ব্যাপার। আমি নিজে ছ' রাউণ্ড গুলি চালিয়েছি।"

"আমাদের হরেনদার কী হল ?"

"কী আবার হবে, হাসপাতালে শুয়ে আছে।"

"হাসপাতালে কেন ?"

"ফটাকসে মার দিয়া।"

"মার দিয়া ?"

"হাঁটুর মালাইচাকি উড়ে গেছে।"

শুনেই নিতু কেঁদে ফেলল। অফিসার বললেন, "খোকা, তুমি কাঁদছ ? তোমার ওই মামা কী জিনিস জানো ? শেয়ালমামা। এই বাগানের ভেতরে লিলিয়ান বলে একটা মেয়ের সমাধি ছিল। সেই সমাধিটাকে আমরা উড়িয়ে দিয়েছি। উপড়ে ফেলে দিয়েছি। জানো, ভেতরে কফিন নেই, কিচ্ছু নেই। ছিল একটা লোহার সিন্দুক। আর সিন্দুকে ছিল, গাদা-গাদা সোনার বিস্কুট। যাও, যাও, বাড়ি যাও। ছোটদের এখানে থাকা উচিত নয়। যাও, যাও।" (ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

স্পাইডারম্যান
লেখা : স্ট্যান লি
আঁকা : ফ্রোরো ডেরি
অবিশ্বাস্য 'মাকড়সা-শক্তির' অধিকারী পিটার পার্কার বৈজ্ঞানিক চাতুরি দেখিয়ে কৃত্রিম মাকড়সার জাল তৈরি করতে পারে…
টুইপ্‌ !
সাধারণ একটা যন্ত্র, এটাই তাকে দিয়েছে শহরের ছাদে ছাদে ঘুরে বেড়ানোর অবাধ অধিকার !
পাগলের কাণ্ডকারখানা ! সর্বত্র দুষ্ট কিছু লোক হঠাৎ আমার নামে দোষ দিতে লাগল !
শহরে মাদক চোরচালানের নাটের গুরু হল প্রাক্তন হিরো, মাকড়সা-মানুষ !
পিটার, সে কে, যে তোমার নামে অভিযোগ আনছে ? আর কেনই বা আনছে ?
জানিনা, তবে লোকটা যে কে, তা আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে !
হাওয়ার্ড ডান্টন হেজের কাছে গেলে এ-প্রশ্নের উত্তর চটপট জানতে পারতাম…
ঠিক আছে, হেজ । আপনি যে টাকা আমাকে দিয়েছিলেন, তার পাইপয়সা পর্যন্ত আমি শয়তানগুলোকে ঘুষ দিয়েছি !
তাতে কাজ হয়েছে । মাকড়সা-মানুষের মুখে চুন-কালি পড়েছে !
কিন্তু ওর বিরুদ্ধে আপনার আক্রোশ কেন ?
আক্রোশের কিছু নেই তবে সে বড় একটা খেলার ঘুঁটি মাত্র ।
টক্‌
আর বড় খেলাটা হল বিচারপতি ওয়াটসনকে নিয়ে !
আমার দোষটা কোথায় ? নগর- পরিষদকে আমি বুঝিয়েছিলাম, তাঁরা যেন মাকড়সা-মানুষকে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মডেল করেন !
মাকড়সা-মানুষ বলছে : ॥ শান্ত হও বাচ্চারা হয়ো না স্কুলছাড়া !"
এখন অন্য বিচারপতিরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে ! বাচ্চারাও আর কাউকে বিশ্বাস করবে না !
ঘুরে দাঁড়ানোর জায়গা নেই !

9/7

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ফোটো : অরিন্দম দেবনাথ

লেজেরও আছে অনেক কাজ

পশুপক্ষীর লেজ তো এক রকমের হয় না, আবার সেই লেজের কাজও নয় এক রকমের। পশুদের কথাই ধরো। এক-এক পশু তার লেজকে এক-এক রকম কাজে লাগায়। গোরু আর মোষ যে তাদের লেজ দিয়ে মশা তাড়ায়, সে তো তোমরা দেখেছই। ঘোড়াও তার লেজ দিয়ে মশামাছি তাড়ায়। বাঁদর কিন্তু প্রধানত গাছের ডালপালা আঁকড়ে ধরে তাদের লেজ দিয়ে। বাঁদরের ক্ষেত্রে, সত্যি বলতে কী, লেজ যেন বাড়তি একটা হাতের মতো। স্রেফ ওই লেজ দিয়ে ডাল পেঁচিয়ে তারা শূন্যে দোল খায়, পড়ে যায় না। বীবর বা উদ্‌বেড়াল তাদের লেজ দিয়ে কী করে জানো? তারা যে বাসা বানায়, তার দেওয়ালের কাদামাটিকে তারা লেজ দিয়ে থাবড়ে মসৃণ করে নেয়। তা ছাড়া, জলের মধ্যে লেজের চাপড় মেরে তারা জানিয়ে দেয় যে, শত্রু আসছে, সাবধান।

কুমিরের লেজের ভীষণ জোর। স্রেফ লেজ দিয়ে বাড়ি মেরেই শিকারকে তারা জলে টেনে নামায়। তা ছাড়া, সাঁতার কাটার ব্যাপারেও লেজ তাদের সাহায্য করে।

কাঠবেড়ালির লেজ ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করে। সেই কারণেই, এক ডাল থেকে লাফিয়ে তারা যখন আর-এক ডালে যায়, তখন লেজের সাহায্য তাদের চাই-ই। ভারসাম্য রাখার ব্যাপারে ক্যাঙারুও যথেষ্ট সাহায্য পায় তাদের লেজের কাছ থেকে।

পাখির লেজ একদিকে যেমন তার ওড়ার ব্যাপারে ব্রেক-এর কাজ করে, অন্যদিকে তেমনি করে হালের কাজ। নৌকোর যেমন হাল, পাখির তেমনি লেজ। অনেক পুরুষ-পাখি অবশ্য লেজের বাহার দেখিয়ে আকর্ষণ করে মেয়ে-পাখিদের।

ভয়ংকর বাংলোয়

হিমানীশ গোস্বামী

ছুটির পক্ষে এমন চমৎকার জায়গা ভূ-ভারতে আর আছে কি ? অথচ জায়গাটি এই তো কত কাছেই। শিলিগুড়ি থেকে পঁচিশ কিলোমিটারের বেশি হবে না। হিমালয়ের প্রশান্তির মধ্যে কালিঝোরা ডাকবাংলো তিস্তার ধারে অতি মনোরম। অক্টোবর মাসের দুপুরে রোদ্দুরের তেজ বেশ ভালই, তবু চারিদিকের বিরাট বিশাল গাছগুলির গভীর ছায়াও পাওয়া যায়। বসে বসে দু'একটা কাঁচা এবং টক হলেও ভিটামিন ভর্তি কমলালেবু ছায়ায় বসে চুষতে মন্দ লাগে না। এখনও কমলালেবু পাকার সময় হয়নি। আরও তিন মাস পরে এই পথ দিয়ে সমতলভূমির দিকে নেমে যাবে লরি আর টেম্পোভর্তি কমলালেবুর রাশি। এখন কোনও কোনও কমলাগাছে প্রচুর ফুল, ফুলে ফুলে মৌমাছি। মৌমাছিরা কমলাবাগান ছাড়িয়ে এদিকেও এসে গেছে। সর্বদা কমলালেবুর ফুলের মধু সংগ্রহ করতে বোধহয় তাদেরও একঘেয়ে লাগে। জঙ্গলের মধ্যে শোনা যায় দুটি প্রধান আওয়াজ। অনেক নীচে দিয়ে বয়ে-যাওয়া খরস্রোতা তিস্তার খল্‌খল্ কুল্‌কুল্

ম্ওয়াজ—আর তারই আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলে একঘেয়ে অথচ একটা মিষ্টি পরিবেশ সৃষ্টি করে। এর সঙ্গে প্রায়ই শোনা যায় মৌমাছির এক অতি **তীক্ষ্ণ** আওয়াজ।

আমাদের অবশ্য এখানে বসে থাকলে চলবে না। আরও এগিয়ে যেতে হবে বেশ কয়েক কিলোমিটার। তারপর একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়বে। তার ওপর কেবল লেখা এপিয়ারি বাংলো, পি আর সি। পি আর সি হল পবনরাজ চৌধুরী নামের ইংরেজি **আদ্যক্ষর**। বাংলোটি বড় রাস্তা থেকে নজরে পড়ে না। কালো ব্যাসাল্ট-এর সিঁড়ি উঠে গেছে,, দু'ধারে বড় এলাচ এবং আদার স্বভাব-জঙ্গল দু'দিক থেকে সিঁড়িকে ঢেকে দিয়েছে প্রায়। আরও কত রকমের গাছ, ফার্ন এবং অর্কিড। চিনে ওঠা ভার। কত ওষুধের গাছ, কে তার হিসেব রাখে, কে তার হিসেব করে। দুনিয়ার ঐশ্বর্য রয়েছে এই হিমালয়ে। এই হিমালয়ের গাছপালা থেকে যত ওষুধ তৈরি করা যায়, ভারতবর্ষ তা বিদেশে বিক্রি করে হাজার হাজার কোটি টাকা ঘরে আনতে পারে। কিন্তু কতটুকুই বা গবেষণা হয়। বছরের পর বছর গাছ জন্মায়, বেড়ে চলে এবং মরে যায়। আমরা বিদেশ থেকে বিদেশী ফর্মূলাবাঁধা ওষুধ পঞ্চাশ গুণ বেশি খরচ করে কিনে আমাদের অসুখ সারাই।

আমাদের এবারে একটু কষ্ট করে ওপরের দিকে উঠতে হবে। গেটে কোনও দারোয়ান নেই, পাহারা নেই। পাহারার দরকারও নেই। দশ-পনেরো ধাপ ওপরে উঠলেই জিভ বার করে ছুটে আসবে কেলো। এত বড় দিশি কুকুর সচরাচর চোখে পড়ে না।

কেলো কিছুই করবে না। কেলো বৈজ্ঞানিক পবনরাজ চৌধুরীর একান্ত অনুগত কুকুর। রঙ কুচকুচে কালো, কেবল কপালে একটা সাদা টিপ। বয়স তিন পেরিয়েছে কি না সন্দেহ, কিন্তু এরই মধ্যে সে অন্তত ছ'বার মধুচোরদের তাড়িয়েছে, এবং একবার দুটি চোর পালাতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে গিয়ে বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে কাটিয়ে তারপর ছ'মাস জেল খেটেছে। তারপর থেকে আর চোর আসেনি, কেলোর সে-জন্য খেয়েদেয়ে মোটা হওয়া ছাড়া বর্তমানে কোনও কাজ নেই। কেউ হঠাৎ বেটপকা সিঁড়ি বেয়ে উঠলে অবশ্য তার বেশ ভালই লাগে। তাকে দেখে লোককে ভয় পেতে দেখলে তার মনে বেশ একটা অনির্বচনীয় আহ্লাদ হয়। তার মুখ তখন বেশ হাসি-হাসি দেখায়। উচ্চকণ্ঠে সে ডাকে না। সহজ ভদ্র তার ব্যবহার, ঠিক যেন মালিকেরই মতো তার অভিজাত আচরণ! তাকে দেখাশোনার ভার শিবুচরণের ওপর। শিবুচরণের আরও একটা কাজ হল বাজার করা আর রান্না করা। বাসে বা কখনও জিপে করে তিস্তাবাজার থেকে সপ্তাহে দু'দিন বাজার করে আনে। শিবুচরণের বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, রোগা টিংটিঙে চেহারা। এরই মধ্যে চুল আর দাড়ি অর্ধেক পেকে গেছে। চোখে একটু কম দেখে। পবনরাজ বলেছেন তাকে শিলিগুড়ি থেকে চশমা করিয়ে দেবেন। ভাবতেই তার ভারী আনন্দ। চশমা পরে সে ঘুরে বেড়াবে! তিস্তাবাজারের দোকানদারেরা তাকে দেখে বলবে কী? বলবে, এই যে লম্বু চার চোখ কবে হল রে তোর? একটু লজ্জাও পায় সে।

শিবুচরণের আর একটা কাজ অমূল্যবাবুকে সাহায্য করা। অমূল্যবাবু পবনরাজের কী আত্মীয় হন! অমূল্যবাবু পবনরাজকে দাদা বলে ডাকেন। অমূল্যবাবুর কাজ হল ল্যাবরেটরির কাজে পবনরাজকে সাহায্য করা। এখানে মৌমাছি নিয়ে গবেষণা করেন পবনরাজ। পবনরাজ চৌধুরীর নাম এদেশে তেমন কেউ জানেনই না উনি একটু লাজুক চরিত্রের। নিজের কাজ নিয়েই থাকেন। স্ত্রী সৌদামিনীও স্বামীর কাজে সাহায্য করেন। উনি ছোটদের জন্য বিজ্ঞান সংক্রান্ত লেখায় নাম করেছেন। এঁদের দুজনেই বিদেশে, বিশেষ করে রাশিয়া এবং আমেরিকায় বিশেষভাবে সম্মানিত। টাকার ভাবনা তেমন নেই। নিজস্ব টাকাও রয়েছে, তা ছাড়া দেশের এবং বিদেশের বিজ্ঞান ফাউন্ডেশন থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ পেয়ে যান। মৌমাছির আচার-ব্যবহার নিয়ে একটি বড় বই ইংল্যান্ডের' এক প্রকাশক ছাপছেন, এবং বইটি প্রকাশের আগেই তাঁরা এমন একখানা চেক পাঠিয়েছেন যা দেখে যে-কোনও লেখকেরই হতবাক হওয়ার কথা। বইটি নাকি ত্রিশ হাজার এক বছরেই বিক্রি হয়ে যেতে পারে!

এসব কথা কিন্তু স্থানীয় লোকেরা কেউই জানে না। জানবার দরকারও নেই তাদের। অতি সাধারণ সব লোকজন। অনেকেরই মুখ গোলগাল। অতি সরল পাহাড়ি মানুষ। নামগুলিও অদ্ভুত। একজনের নাম রাজা, অন্য একজনের নাম কোয়াচি। এরা দুজনেই এই এপিয়ারি বাংলোর কর্মী। কাজ হচ্ছে মৌচাকগুলির যত্ন করা, পরিষ্কার করা, বাগান করা, মুরগি পোষা, সেগুলির ডিম সংগ্রহ করা, এইসব। এরা সকাল সাতটা নাগাদ আসে, সারাদিন কাজ করে সন্ধেবেলা বাড়ি চলে যায়। খাওয়াদাওয়া, চান, সবই এই বাংলোয়। যাওয়ার সময় নিয়ে যায় কিছু সবজি, ডিম। বাড়ির আর একজন বাসিন্দা রায়বাবু। উনি জিপ চালান। জিপের জন্য আলাদা রাস্তা আছে। পাথরের সিঁড়ি ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে প্রায় একশো মিটার উত্তরে—সেটা ঘোরা পথ। এপিয়ারির অর্থ হল মৌমাছিপালন কেন্দ্র, স্থানীয় লোকেরা এপিয়ারি অবশ্য বলে না। বলে পিয়ারি বাংলো!

॥ ২ ॥

এই অদ্ভুত পরিবেশে একদিন ছোট্ট-ছোট্ট দুটি ঝোলা নিয়ে এপিয়ারি বাংলোয় গিয়ে পৌঁছল দোলগোবিন্দ আর তার বন্ধু বিকাশ। দোলগোবিন্দর আপন মেসো হলেন পবনরাজ। কিন্তু আপন মেসো হলেও এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তার এই এপিয়ারি বাংলোয় আসা। এর আগে সে এসেছিল বছর-দশেক আগে। তখন তার বয়স ছিল আট কি ন' বছর। কয়েকদিন ছিল এখানে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে। তারপর চলে গিয়েছিল কাছেই মংপুতে। সেখানে সিঙ্কোনা গাছের চাষ আর তা থেকে তৈরি কুইনিন কারখানার কথা তার আবছা-আবছা এখনও মনে পড়ে। এপিয়ারি বাংলোর কথাও তার মনে পড়ে। তখন বাংলোটা এত সাজানো ছিল না, বাগান বলতে কিছু ছিল না, এখন যেমন উত্তর দিকটায় কয়েক একর জমিতে হাজার গোলাপের গাছ, তখন তা ছিল না, এত মৌচাকও ছিল না। তখন এদিকটায় বেশ ঘন ঝোপঝাড় ছিল। তার মনে পড়ে এই জায়গাটি তার একেবারেই ভাল লাগেনি তখন। কিন্তু এবারে স্কুলের শেষ পরীক্ষার পর রেজাল্ট বার হতে এত দেরি হচ্ছে দেখে একদিন সে তার প্রাণের বন্ধু বিকাশকে বলল, "চল্ আমরা কোথাও ঘুরে আসি।"

বিকাশকে আর বেশি বলতে হয় না। সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি! কোথায় যাওয়া যায় এই নিয়ে তর্ক আর পরামর্শ করে তারা স্থির করল তারা যাবে সেই পালামৌতে! সেই যে বইতে পড়েছিল সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ, আহা কী চমৎকার তার বর্ণনা! এখনও মনে আছে **কিছু কথা।** "এই পাহাড় অতি নির্জন, কোথাও ছোট জঙ্গল নাই, সর্বত্র ঘাস। অতি পরিষ্কার, তাহাও বাতাস আসিয়া নিত্য ঝাড়িয়া দেয়। মৌয়া গাছ তথায় বিস্তর কতকগুলি একত্রে গলাগলি করে বাস করে, আর কতকগুলি বিধবার ন্যায় এখানে সেখানে একাকী থাকে। তাহারই একটিকে আমি বড় ভাল বাসিয়াছিলাম।"

কী চমৎকার কী অসাধারণ কয়েকটি কথা। আরও মনে পড়ে "হঠাৎ একটি লতার উপর দৃষ্টি পড়িল; তাহার একটি ডালে অনেক দিনের পর চারি পাঁচটি ফুল ফুটিয়াছিল। লতা আহ্লাদে তাহা গোপন করিতে পারে নাই, যেন কাহারে দেখাইবার জন্য ডালটি বাড়াইয়া দিয়াছিল...।"

সত্যি, সঞ্জীবচন্দ্র তাকে মুগ্ধ করেছিল। সেই লাতেহার পাহাড়ে যাবার ইচ্ছে তার প্রবল হয়েছিল। কিন্তু দোলগোবিন্দের এই প্রস্তাব তার বাবা **অধরচন্দ্র** এককথায় নাকচ করে দিলেন। বললেন, সে লাতেহার নেই, সে জঙ্গল নেই, সে ঘাস নেই, সে মজা আর নেই। এখন ওসব অতি বিপজ্জনক জায়গা, ওখানে যাওয়া চলবে না! বুঝলে, সে রাম নেই, সে অযোধ্যা নেই!

অতঃপর এপিয়ারি বাংলো! উপায় কী? কাছাকাছি তো অনেক ভাল ভাল দৃশ্য আছেই। মেসোর জিপও আছে। আছে ড্রাইভার রায়বাবু। আছে মাসির আদর। আর অবশ্য আছে মধু, এবং হয়তো হুলও! জলপাইগুড়ি স্টেশনে জিপ ছিল, ছিলেন রায়বাবু। স্টেশনের দেয়ালে একটা পোস্টার। একজন মানুষের ছবি। তার উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা—পুরস্কার ৫০০০৲। কিছু লোক ভিড় করে সেটা দেখছে আর কী সব বলাবলি করছে উত্তেজিতভাবে। দোলগোবিন্দর প্রশ্নে রায়বাবু তাঁর টুপি ঠিক করতে করতে বললেন, "সাংঘাতিক ব্যাপার—পাগলা বিশু জেল থেকে পালিয়েছে। এই অঞ্চলেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছে। ওকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে সরকার।"

"পাগলা বিশু? নামটা যেন চেনা চেনা লাগছে?"

"তা লাগবে না কেন? স্বনামধন্য ব্যক্তি। অন্তত এক ডজন লোককে বীভৎসভাবে খুন করেছে। মেনিয়াক। এক বছর হল ধরা পড়ে হাজতবাস **করছিল**। বিচার অবশ্য হয়নি। হাজতবাস করতে করতে পালিয়ে যায় মাস দুয়েক আগে। সম্প্রতি—এই সপ্তাহ দুয়েক হল কর্তৃপক্ষ জানতে পেরেছেন হাজতে যে বাস করছে পাগলা বিশুর জায়গায়, সে আসল নয়, দু নম্বরি! একজনকে পাগলা বিশু সাজিয়ে আসলটি সটকে পড়েছে। জাল পাগলা বিশু উত্তম-মধ্যম খেয়ে স্বীকার করেছে সব কথা। ব্যাপারটি জানা যেত না হয়তো। কিন্তু সপ্তাহ-তিনেক আগে হিলার কাছে এক চা-বাগানের বড়বাবু হৃদয়বাবুকে বীভৎসভাবে খুন হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় জলঢাকা নদীর ধারে। হত্যার ধরন-ধারণ একেবারে পাগলা বিশুর কায়দায়। এমন কী নিহত ব্যক্তির দুটি কান পর্যন্ত কাটা। শিল্পী যেমন তার ছবির কোণে একটা ছোট্ট স্বাক্ষর রেখে দেন পাগলা বিশুরও ঠিক সেই ব্যাপার। সে খুন করার পর তার শিকারের দুটি কানই কেটে দিত, সেজন্য তার আর এক নাম হয়ে যায় কানকাটা বিশু!"

"পাগলা বিশু খুন করে কেন অমন?" ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল বিকাশ।"

রায়বাবু একটু **কাসলেন**। সম্প্রতি তাঁর সর্দি লেগেছে। বললেন, "সে কেউ জানে না। আপাতদৃষ্টিতে কোনও বিশেষ মোটিভ নেই। তবে মেনিয়াক। অর্থাৎ হত্যা করাটাই উদ্দেশ্য। এ এক ধরনের উন্মাদনা—।"

"কী ভয়ানক!" বলল দোলগোবিন্দ।

বিকাশ বলল, "পাঁচ হাজার টাকাটা কিন্তু বেশ কাজে লেগে যেতে পারে!"

দোলগোবিন্দ শিউরে উঠে বলল, "বলো কি বিকাশ। ভয়ে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে— আর তুমি ভাবছ··· "

বিকাশ হাসতে হাসতে বলল, "ভাবছিই তো।"

দোলগোবিন্দ বলল, "আমাকে কেউ লক্ষ টাকা দিলেও··· "

"দ্যাখো দ্যাখো কী আশ্চর্য আর প্রকাণ্ড—উঃ কী ব্যাপার!" বিকাশ আচমকা বলে উঠল তিস্তার বিশাল বিস্তার দেখে। "মনে হয় কয়েক কিলোমিটার চওড়া নদীটা। তবে সবটায় জল নেই। অনেকটাই বালি এবং পাথর।"

রায়বাবু জিপটাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, "পাহাড় থেকে তীব্র জলের স্রোত এখানে এসে বর্ষাকালে একেবারে পাগলার মতো হৈ-হল্লা শুরু করে দেয়। এখানে এসে পড়েই কিন্তু গতি যায় কমে— তবে ফোঁসফোঁসানি একেবারে বন্ধ হয় না। কিছু ওপরে সিভোক ব্রিজ, ওখানে মনে হয় সব সময়েই সাদা মেঘ। জল ওখানে তীব্র বেগে পড়ে ছোট-ছোট টুকরো হয়ে কুয়াশার সৃষ্টি করে, সে এক দেখবার জিনিস। এই তো গত মাসেই···ওটা কী ব্যাপার?"

একদল ছুটতে ছুটতে জিপের দিকে আসছে। যেন দারুণ একটা কাণ্ড ঘটে গেছে, এমন একটা হাবভাব। রায়বাবু জিপে স্টার্ট দিলেন। কে জানে লোকেরা কেন আসছে। হয়তো এর আগে কোনও জিপ কাউকে চাপা দিয়ে পালিয়ে গেছে এখন 'প্রতিশোধ' নিতে আসছে। যে-কোনও একটা জিপ তাদের পেলেই হল। দোলগোবিন্দ এবং বিকাশও টুপটাপ জিপে উঠে বসল, জিপটা চলতে শুরু করল। লোকেরা কেমন হতাশ হয়ে গেল, কয়েকজন চিৎকার করে বলল, "থামান, থামান, খুন! খুন! কানকাটা খুন করেছে ফের!"

রায়বাবু বললেন "কী ঝামেলা রে বাবা!" তবে জিপটা থামিয়ে ব্যাপারটা জানলেন। উত্তেজিত জনতা জানাল এই অঞ্চলের এক বৈরাগী ভিখিরিকে দূরে একটা বটগাছের তলায় খুন করে গেছে। লোকটি অতি নিরীহ ছিল। বয়স হয়েছিল, গান গেয়ে, একতারা বাজিয়ে ভিক্ষে করত। শত্রু বলতে কেউ ছিল না। হ্যাঁ, তারও দুটি কান কেটে তার বুকের উপর রেখে গিয়েছিল। খুব ভোরেই কাণ্ডটা ঘটেছে, কেননা রাত্রে হলে শেয়াল-টেয়াল মৃতদেহ নিয়ে টানাটানি করত। এদিকে কিছু হায়েনাও আছে নাকি। বাঘ অবশ্য কয়েক বছর আগেও ছিল, এখন আর তাদের দাপটের কথা শোনা যায় না।

যাই হোক, লোকদের কথায় বোঝা গেল, জিপে করে তাদের কেউ কেউ **শিলিগুড়িতে** থানায় একটা খবর দিতে যেতে চায়। রায়বাবু আপত্তি করতে গিয়েও করলেন না। ওরা যে মৃতদেহ জিপে করে নিয়ে যেতে চায়নি সেটাই তাঁর মনে হল একটা আশ্চর্য পরিত্রাণ। বিকাশ তার ব্যাগ পরখ করে দেখল এয়ার পিস্তলটা ঠিকই আছে। কোনও সত্যিকারের বিপদ হলে তেমন কাজে লাগবে না হয়তো, তবে খুব কাছ থেকে গুলি ছুঁড়লে মানুষের গলায় বা চোখে লাগলে তার অবস্থা কাহিল হবে, মারাও যেতে পারে, দশ-পনেরো মিটার দূরের ছোটখাট পাখিও মারা যায়। যাই হোক পিস্তলটা এনে সে যে ভালই করেছে এটা তার মনে হল। ভয় দেখানোর পক্ষে জিনিসটা চমৎকার।

শিলিগুড়ি ঘুরে থানায় খবর দিয়ে আবার সেই একই পথ ধরে তারা চলে গেল এপিয়ারি বাংলোর দিকে। এক ঘণ্টারও বেশি সময় লেগে গেল তাতে। অবশ্য দারুণ উত্তেজনায় সময়টা বেশ কেটে গেল।

এপিয়ারি বাংলোয় গিয়ে প্রথম কাজ হল কেলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। ওই কাজটা না করলে পদে পদে বিপদ হবার আশঙ্কা। কেলো অবশ্য অবুঝ নয়। কে স্বাগত কে নয় সে সেটা অতি দ্রুত বুঝে নেয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে লুচি ওমলেট আর কপির তরকারি সহযোগে চমৎকার দার্জিলিং চা খাবার সময় দেখা গেল, কেলো বসে আছে একেবারে দোলগোবিন্দর পায়ের কাছে, এবং বেশ একটু আশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কেলোর লুচি বেশ পছন্দসই। বেশ কয়েকদিন পর লুচি হওয়াতে সে বেশ খুশি হয়েছে বোঝা গেল। তবে লুচি দিলেই যে সে লাফিয়ে পড়ে খাবে তা নয়। এর জন্য সে করুণ দৃষ্টিতে তাকাবে পবনরাজ কিংবা সৌদামিনীর দিকে। সম্মতি পেলে তবেই সে খাবে, নচেৎ নয়।

দোলগোবিন্দ আর বিকাশের সঙ্গে নানা কথায় আধ ঘণ্টা সময় কেটে গেল। প্রধানত আলোচনা হল পাগলা বিশুকে নিয়েই। কী যে সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে চলেছে, অথচ পুলিশ কিছু করতে পারছে না, উদ্বেগ প্রকাশ করলেন সবাই। কোথাও একা একা যাওয়ার কোনও প্রশ্নই রইল না। দোলগোবিন্দ আর বিকাশ উদ্বেগের মধ্যেই ছিল, এখন তা প্রায় স্থায়ী দুশ্চিন্তায় দাঁড়িয়ে গেল। পাহাড়ি পথে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবে কত দূর, তিস্তার ধার দিয়ে তিস্তাবাজার। তারপর অস্থায়ী লোহার সেতু পেরিয়ে যাবে ভুটান! ভুটান তো প্রায় বিদেশই! সঙ্গে থাকবে ঝোলা, তাতে কিছু খাবার, কয়েকটা ওষুধ, ফ্লাসকে ভর্তি থাকবে চা। একটা বাইনোকুলার আর ক্যামেরা তো থাকবেই। আর অবশ্যই এয়ার-পিস্তলটি। টার্গেট প্র্যাকটিস করতে ওর জুড়ি নেই। কিন্তু কোথায় সেই সব পরিকল্পনা। এপিয়ারি বাংলোয় আসতে না আসতে তাদের স্বপ্ন মিলিয়ে গেল প্রায় স্বপ্নেরই মতো। দোলগোবিন্দর কান্না পেল। কান্না পেল বিকাশেরও। আজই ফিরে যেতে পারলে ভাল হত। এখানে এইভাবে বন্দী অবস্থায় থেকে লাভ কী? দোলগোবিন্দ ভাবল বিপদ মনে করে বাবা পালামৌ যেতে দিলেন না, কিন্তু এখন এসব শুনলে তিনি কী করবেন?

মাসি বললেন, "তোমরা সব বিশ্রাম করে নাও ঘণ্টাদুয়েক। তারপর চানটান করে খাবে। বিকেলে যাবে ল্যাবরেটরিতে, দেখবে কত সব কাণ্ডকারখানা। এতে অবশ্য দোলগোবিন্দ আর বিকাশের একটু উৎসাহ হল। এর আগে তারা ল্যাবরেটরি কখনও দেখেনি। দোলগোবিন্দ যখন এখানে এসেছিল তখনকার কথা তার মনেই নেই প্রায়। বিকাশও ল্যাবরেটরি দেখেনি, আর বৈজ্ঞানিকদের সম্পর্কে সে কেবল শুনেই এসেছে। তার ধারণা বৈজ্ঞানিকেরা কথা বলেন না বিশেষ, আর হয় মাইক্রোস্কোপ নয়তো টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে থাকেন সর্বদা। মনটা হয় ভুলো-ভুলো, খাবার মনে করে চুরুট চিবোন। নিজের সঙ্গে দেখা করতে যান রেল-স্টেশনে। দেখা না পেয়ে ফিরে আসেন মন খারাপ করে, ছাতা রাখার জায়গায় নিজে দাঁড়িয়ে থাকেন, আর বিছানায় শুইয়ে দেন ছাতা! কিন্তু পবনরাজ চৌধুরীকে দেখে তার তেমন অস্বাভাবিক কিছু মনে হল না। তবে মনে হল কী নিয়ে যেন ভাবছেন। মনে হল মাঝে মাঝে চমকে উঠছেন। দু'একবার মৃদু মৃদু হাসলেনও। বিজ্ঞান নিয়ে একটা কথাও বললেন না। বিকাশ ভাবল, বাঃ চমৎকার তো! বিকাশ ভেবেছিল পবনরাজ চৌধুরী বোধহয় প্রথমেই কেমিস্ট্রির ফর্মুলা আওড়াবেন আর কঠিন কঠিন সব অঙ্কের ধাঁধা দেবেন। তার মনে একটু ভয় ছিল এ-ব্যাপারে। কিন্তু ভয়টা বেশিক্ষণ রইল না। বিকাশ দেখল পবনরাজের চেহারা কেমন সুন্দর। ফর্সা রঙ, কালো ফ্রেমের চশমা, আর মুখে লালচে আভা। বিশাল কপাল, চুলগুলি অবশ্য একটু এলোমেলো। ভ্রূ দুটো মাঝে-মাঝে কুঁচকে যাচ্ছে, মনে হয় দুশ্চিন্তা করছেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর পাহাড়ের একটু ওপরের দিকে গোলাপবাগান ছাড়িয়ে বহু মৌচাক সাজানো রয়েছে দেখতে পেল তারা। প্রত্যেকটিকে দেখতে যেন এক-একটা এয়ার কনডিশনার। সেগুলোতে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি। সর্বদা শোঁ-শোঁ একটা আওয়াজ। কর্মব্যস্ততার সীমা নেই। হাজার হাজার মৌমাছির আওয়াজ, প্রথমে অসুবিধে মনে হয়, পরে তা অভ্যস্ত হয়ে আসে। রায়বাবুর আজ বিশেষ কাজ নেই। তিনি সঙ্গে আছেন। অনেক বছর এখানে আছেন রায়বাবু, পরিবারবর্গ সব থাকেন শিলিগুড়িতে। রোজই যাতায়াত করেন, মাঝে-মাঝে থেকেও যান প্রয়োজন হলে। মৌমাছিদের সম্পর্কে তিনি অনেক কিছু জানেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা বলো তো মৌমাছিরা এমন আওয়াজ করে কেন?"

"আনন্দে?" বিকাশ বলল। দোলগোবিন্দ বলল, "উত্তেজনায়?"

"উহুঁ! ওরা যখন তাদের পাখা চারটি দ্রুত আন্দোলন করে তখন হাওয়ায় বাধা পেয়ে আওয়াজটি হয়। বলো তো ওরা প্রতি মিনিটে কতবার পাখা নাচায়?"

বিকাশ আন্দাজ করল। "দু'শোবার?"

রায়বাবু তাঁর গোঁফজোড়াটিতে মোলায়েম ভাবে হাত বুলিয়ে বললেন, "দু'শোবার? না,হল না। পঁচিশ হাজারবার। মিনিটে পঁচিশ হাজারবার, অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে চারশো যোলোরও বেশি বার। ভাবা যায়?"

বিকাশ ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেল। দোলগোবিন্দও। বলল, "ওইটুকু একটা পোকা, সে এত শক্তি পায় কোত্থেকে?"

রায়বাবু বললেন, "ওসব আমার জানা নেই। তবে বড়কর্তা সব জানেন। ওঁকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারো।"

"এক-একটা মৌমাছির ওজন কত?" দোলগোবিন্দ প্রশ্ন করল।

রায়বাবু বললেন, "অতি সামান্য—অতি সামান্য। ছ' কেজিতে ষাট হাজার।"

"মানে, দশটা মৌমাছির ওজন মাত্র এক গ্রাম?"

রায়বাবু বললেন, "মৌমাছির ছোট বড় আছে। নানা জাত, তবে মোটামুটি ওই ওজন। যে সব মৌমাছি ওড়ে সেগুলির কিন্তু ছোট বড় মাঝারি সাইজ কিছু নেই, প্রত্যেকটিই এক সাইজের। পৃথিবীতে বোধহয় হাজার-দুয়েক রকমের মৌমাছি আছে, ঠিক কত রকম আছে সেটা বড়বাবু বলতে পারবেন, বৌদিও জানেন। এগুলির মধ্যে ছোট বড় থাকতে পারে কিন্তু এক-এক জাতের মৌমাছি সব একই সাইজের হয়। আসলে এরা যখন ছোট থাকে তখন থাকে মৌচাকের মধ্যে। যখন ওরা যুবক হয় তখনই কেবল উড়তে পারে।"

একটু থেমে রায়বাবু বললেন, "না, কথাটা একটু ভুল হল, যেসব মৌমাছিকে আমরা উড়তে দেখি তাদের কেউই যুবক মৌমাছি নয়, প্রায় সকলেই যুবতী মৌমাছি। মেয়েরাই কাজকর্ম যা করার করে। মধু আনে, বাসা তৈরি করে, বাসা পরিষ্কার করে, এ-সব কাজই মেয়েদের। প্রত্যেক মৌচাকে থাকে রানি মৌমাছি। এর আকার বেশ বড়, আর প্রধান কাজ ডিম পাড়া। এরা ডিম পাড়তে শুরু করে যখন তখন, দিনে ছ-সাতটা ডিম পাড়ে। পরে সংখ্যা বেড়ে বেড়ে দিনে কয়েক হাজারে দাঁড়ায়। খুব ছোট ছোট ডিম অবশ্য।এ ছাড়া পুরুষ মৌমাছিরাও থাকে, কিন্তু তারা হয় স্বল্পায়ু।"

"আচ্ছা, ওই দিকে যে অত ট্র্যানজিস্টর রেডিও এবং টিভির মতো সব সাজানো রয়েছে ওগুলো কী রায়বাবু?" দোলগোবিন্দ প্রশ্ন করল।

"ওগুলো?" রায়বাবু হাসলেন। বললেন, "ওগুলোর কোনওটা ট্র্যানজিস্টর রেডিও নয়, টিভিও নয়। ওগুলো হচ্ছে মৌমাছি কলোনি।"

"এত? এ যে ডজন ডজন?" বিকাশ বলল। "এত কেন?"

"পরীক্ষার জন্য।" রায়বাবু বললেন, "তা ছাড়া মধুও পাওয়া যায় অনেক। এই মৌমাছিরা অনেক সময় দু'চার কিলোমিটার দূরেও যায় মধুর খোঁজে,মধু পেয়ে গেলে সেখান থেকে নিয়ে এসে মৌচাকে জমা করতে থাকে। পাঁচশো গ্রাম মধু সংগ্রহ করতে হয়তো প্রত্যেক মৌমাছিকে কয়েক হাজার মাইল উড়তে হয়।"

শোঁ-শোঁ, গুন-গুন আওয়াজ সমস্ত জায়গা জুড়ে শোনা যাচ্ছে। প্রথম-প্রথম কানে লাগে, একটু অসুবিধে হয়,কিন্তু পরে অভ্যেস হয়ে আসে। রায়বাবুর কথা শুনে বিকাশ আর দোলগোবিন্দ চুপ করে রইল।

রায়বাবু বললেন, "সমস্ত পৃথিবীতেই এখন খুব মৌমাছি-চর্চা

হচ্ছে। নানারকম পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। গোপন পরীক্ষাও চালানো হচ্ছে নানারকম। আলেকজাণ্ডার যখন ভারতে আসেন··· ”

“রায়বাবু !” হঠাৎ শোনা গেল পবনরাজের বজ্র-কঠোর কণ্ঠস্বর। “আপনাকে বলা হয়েছে না এখানকার কোনও কথা··· ”

রায়বাবু একেবারে চুপসে গেলেন। তিনি আঁও-মাও করে কী যেন কৈফিয়ত দিতে গেলেন। পবনরাজ বললেন, “আপনি এখন যান। একবার শিবুচরণকে নিয়ে তিস্তাবাজারে যান দেখি, কিছু কমলালেবু পাওয়া যায় কি না। তা ছাড়া কিছু মাছ, তিস্তার ছোট মাছ, মাগুর অথবা মহাশোল, যা পাওয়া যায়।”

রায়বাবু দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে পবনরাজ বললেন, “লোকটি এমনিতে খুব ভাল, কিন্তু কথাবার্তায় বড় আলগা। বার-বার বারণ করেছি··· ”

তারপর কী ভেবে হঠাৎ বললেন, “পরে সব বলব। এখন একঝাঁক মার্কিন মৌমাছি নিয়ে বড় ব্যস্ত।” তারপরই গট-গট করে চলে গেলেন।

ওরা দু'জনে বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

একটু পরে মাসি এসে বললেন, “এসো তোমরা ভেতরে।”

ভেতরে গেলে মাসি বললেন, “উনি আজকাল একটু কেমন যেন হয়ে পড়েছেন। তোমাদের কিছু বলেননি তো ?”

দোলগোবিন্দ বলল, “না, আমাদের নয়, তবে রায়বাবুকে তিনি··· ”

“বুঝেছি।” মাসি বললেন, “সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যাতে উনি খুবই বিচলিতবোধ করছেন। কিছুদিন আগে ওঁর কতকগুলি জরুরি কাগজপত্র হারিয়ে যায়। সেগুলি অবশ্য পরে পাওয়া যায় অন্য সব কাগজপত্রের মধ্যে, যেখানে সেগুলি থাকার কোনও কথা নয়। ওঁর ধারণা এবাড়িরই কেউ ওই কাগজপত্র নিয়ে গিয়ে সেগুলি কপি করে আবার ফিরিয়ে এনেছে, কিন্তু ঠিক যে-জায়গা থেকে নিয়েছিল সে-জায়গায় রাখেনি, কেননা, সে-জায়গায় রাখলে সন্দেহ আরও বাড়ত। যে-জায়গায় রাখা ছিল, সে-জায়গা তন্ন-তন্ন করে খোঁজার পরেও তা পাওয়া গেল না। পরে সেখানে সেটি হঠাৎ পাওয়া গেলে স্বভাবতই মনে হয় কেউ নিয়ে গিয়েছিল, পরে ফেরত দিয়ে গিয়েছে। তবে ওঁর এটা ভুলও হতে পারে। উনি নিজেই ভুলে হয়তো কাগজপত্রগুলি সরিয়ে রেখেছিলেন, পরে একেবারেই মনে পড়েনি।”

বিকাশ বলল, “পবনমেসো কি রায়বাবুকে সন্দেহ করেন ?”

মাসি বললেন, “উনি বেশ বিচলিত। উনি সকলকেই এখন সন্দেহ করেন। আসলে এটা যে বাড়ির লোকেরই কারুর কাজ তাতে তো সন্দেহ নেই ? তা ছাড়া চুরির ব্যাপারটাও বেশ সন্দেহজনক। এখানে মধু চুরি যে বিপজ্জনক ব্যাপার সেটা স্থানীয় লোকেদের না জানবার কথা নয়। কেলো আছে, তা ছাড়া ওঁর পিস্তল আছে, এসব সকলেই জানে। উনি এখানে আছেন গত ত্রিশ বছর, কোনওদিন কিছু হয়নি, হঠাৎ বছরখানেকের মধ্যে ছ-ছ'বার মধু চুরির চেষ্টা করার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু নিশ্চয়ই আছে বলে মনে হয়। আর আজ থেকে ঠিক পনেরো মাস আগে থেকেই উনি··· ”

বলে মাসি থেমে গেলেন। বললেন, “সে-কথা থাক। আসল ব্যাপার হল ওঁর সন্দেহ হচ্ছে বাড়ির মধ্যেই এমন কেউ আছে যে শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগসাজসে··· । তবে সেটা আমার বিশ্বাস হয় না।”

“শত্রুপক্ষ ?” বিকাশ এবং দোলগোবিন্দ একসঙ্গে প্রশ্ন করল। “ওঁর শত্রু মধু চুরি করতে চায় ? তার চেয়ে ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক ডাকাতি করলেই তো সমস্যার সমাধান। মধু একসঙ্গে কত আর চুরি করা যায়, দশ কেজি ? তার কতই বা দাম ?”

মাসি বললেন, “তোমাদের কাছে সব কথা বলা সম্ভব নয়, অথচ যদি না বলি, তা হলে তোমরা ব্যাপারটা নিয়ে অযথা নানারকম অসম্ভব সব কল্পনা করবে। শত্রুপক্ষ এখানে মধু চুরি করতে আসছে বলে উনি মনে করেন না। যা চুরি করতে আসবে সেটা হল একটা মস্ত মৌচাক। দু'টি চোর যে ধরা পড়েছিল তারা সেই বিশেষ মৌচাকই চুরি করতে এসেছিল, সেটা সন্দেহ করার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করার পরেও তারা মুখ খোলেনি। কেবল তাই নয়, তাদের ছ'মাস জেল হয়েছিল, কিন্তু ষোলোদিন পর তারা পালিয়েও যায় জেল থেকে। তাদের বদলে অবশ্য ওদের নামে জেল খাটবার জন্য দু'জন লোকও দিয়ে যায়। সেটা ধরা পড়েছে কানকাটা বিশুর ক্ষেত্রে ওই একই রকম ঘটনা ঘটবার পর। দেখা গেছে জেলের অন্তত বারোটি ক্ষেত্রে আসল কয়েদি পালিয়েছে এবং তাদের বদলে অন্য বারোজন জেল খাটছে। কিছু জেল-কর্মচারীর যোগসাজসে এবং গাফিলতিতে এটা ঘটেছে। মধুচোরেরা তাদের বদলে যাদের রেখে গিয়েছিল জেলখাটার জন্য তাদের প্রত্যেককে পনেরো হাজার টাকা দিয়েছিল। এটা কোনও সাধারণ চোরের কীর্তি যে নয় সেটা তো বুঝতেই পারছ। দু'জনের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা এবং তারপরও জেলের কর্মচারীরাও নিশ্চয় কিছু নিয়েছে, তাও কয়েক হাজার টাকার ব্যাপার বলে অনুমান করা হচ্ছে। যারা সহজেই এত হাজার টাকা খরচ করতে পারে মাত্র ছ'মাসের জন্য, তারা যে কয়েক কেজি সাধারণ মধু চুরি করতে আসেনি সেটা নিশ্চয়ই জোর করে বলা যায়। আবার এই দু'জনের সঙ্গে স্টাইনারের··· ।” বলে চুপ করে গেলেন।

একটু পরেই কথা ঘুরিয়ে বললেন, “অতএব তোমার মেসো যে একটু বিচলিত বোধ করবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। রাত্রে তাঁর ঘুম হচ্ছে না ভাল করে। বালিশের তলায় পিস্তল রাখছেন, তা ছাড়া সরকারের কাছে সিকিউরিটি গার্ডের জন্য চিঠিও দিয়েছেন, হয়তো কয়েক দিনের মধ্যেই এই বাড়িতে দিনরাত্তির পাহারারও বন্দোবস্ত হবে। এটা তিনি আদপেই চান না। শান্তিতে কাজ করতে চান, কিন্তু উপায়ই বা কী।”

দোলগোবিন্দ বলল, “কিন্তু একটা আস্ত মৌচাক চুরি করা··· ”

মাসি বললেন, “একটি আস্ত মৌচাক চুরি করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। একটা বড় প্ল্যাস্টিক ব্যাগ থাকলে সেটা সহজেই করা যায়। বিশেষ করে কোন্ বিশেষ মৌচাকটিকে চুরি করতে হবে সেটা যদি জানা থাকে, তা হলে তো সমস্যা আরও কমে গেল। তবু ভাল আমাদের কেলো ছিল, সে না থাকলে ওঁর বহু-দিনকার একটা আবিষ্কার হাতছাড়া হয়ে যেত, যার দাম··· ”

বিকাশ বলল, “বুঝেছি। যার দাম টাকায় হয় না।”

মাসি বললেন, “টাকায় হয় ! তবে এক আধ টাকা নয়। অন্তত কয়েক শো কোটি টাকা। উনি যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলেন সেটা অনেকেই জানেন। অনেকেই, মানে অনেক বৈজ্ঞানিক। সেটি বলতে বাধা নেই, আশা করি তোমরা এ নিয়ে কাউকে বলবে না। তিনি একঝাঁক বিশেষ ধরনের মৌমাছি থেকে এক বিশেষ ধরনের মধু নিয়ে এমন একটা ওষুধ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছিলেন যার সাহায্যে কতক ধরনের ক্যানসার রোগ খুব কম সময়ের মধ্যে সারানো সম্ভব। এর সঠিক ডোজ এবং কোন্ জাতের মৌমাছি এবং কী ফুলের মধু এটা অবশ্য কেউ জানে না। সুখের বিষয়, যে কাগজপত্র খোওয়া গিয়েছিল সেগুলিতে মৌমাছিরা রঙ চিনতে পারে কি না তাই নিয়ে কতকগুলি পরীক্ষার কথা লেখা ছিল। তোমরা জানো কি না জানি না, পরীক্ষা করে দেখা গেছে মৌমাছিরা সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয় নীল রঙে। তারপরই তারা আকৃষ্ট হয় সাদায়, তারপর লাল, সবুজ,

এবং সবচেয়ে কম আকৃষ্ট হয় কমলা রঙে। অবশ্য সবুজ রঙে আকৃষ্ট কম হবার কারণ আছে, ফুলের রঙ শুনেছি সবুজ হয় না। কিন্তু কমলা রঙে তাদের আকর্ষণ সবচেয়ে কম কেন, সেটা ঠিক বোঝা যায় না। মৌমাছি-বিশেষজ্ঞ ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক লর্ড এভবারি কেন্টে একশোবার পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, আজ থেকে অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে। তবে মৌমাছি সব দেশে এক নয়। তাদের স্বভাবও আলাদা হয়। উনি মৌমাছিদের রঙ পছন্দ নিয়ে গবেষণা করছিলেন, এবং উনি দেখেছিলেন মৌমাছিদের কমলা রঙও পছন্দ করানো সম্ভব। একটি কমলা রঙের কাগজে সিরাপ মাখিয়ে রেখে এবং নীল, সাদা এবং অন্যান্য রঙের কাগজে সিরাপ না মাখিয়ে ল্যাবরেটরির কয়েকটি টেবিলে রেখে দেখা গেছে প্রথম প্রথম তারা নীলের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু যখনই বুঝতে পেরেছে আসলে কমলা রঙের কাগজেই রয়েছে তাদের প্রিয় সিরাপ, তখন আর তারা নীল রঙের দিকে ঝোঁকেনি। তখন তারা কমলা রঙের দিকেই আকৃষ্ট হয়েছে, এমনকি তাতে সিরাপ না থাকলেও তারা কমলা রঙের দিকেই প্রথমে ছুটে গেছে। ওরাও যে বুদ্ধিমান এতে সেটাই প্রমাণ হয়।"

মাসি বললেন, "যাই হোক,ওই কাগজ কেউ যদি কপিও করে থাকে তা হলে ক্ষতি হয়নি তেমন। এখন অবশ্য বিশেষ জরুরি কাগজপত্র লোহার আলমারিতে রাখা থাকে, যার দু'টো চাবি। দু'টো চাবিই একসঙ্গে না ঘোরালে সে-আলমারি খোলা সম্ভব নয়। সেটা হল প্রথম দরজা। দ্বিতীয় দরজা খোলা আরও শক্ত, সেটা হল নম্বরি তালা। সাত অঙ্কের একটি সংখ্যা রয়েছে যেটি ঠিক-মতো না মিললে কারুর পক্ষেই সে-আলমারি খোলা সম্ভব নয়। কিন্তু একজন বৈজ্ঞানিককে যদি কেবলই রোজ দু'তিনবার কাগজপত্র আলমারি থেকে বার করতে হয়, আর রাখতে হয়, সেটা কম ঝামেলার ব্যাপার? এই উদ্বেগ একজন বৈজ্ঞানিকের কতখানি ক্ষতি করতে পারে সেটা তোমরা নিশ্চয়ই ভাবলে বুঝতে পারবে। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। রায়বাবুকে তো বটেই, এমন কি শিবুচরণ গোবেচারা লোক, সাতে-পাঁচে থাকে না, বোধহয় বোকাও, বাজার করে কিন্তু হিসেবই ভাল করে বোঝে না, তাকেও উনি আজকাল বিশ্বাস করেন না। এখন আবার চশমা নেবে সে। তাতে তার চোখদুটো বেশ বড় আর গোল দেখাবে, আর উনি বোধহয় ওকে তখন আরও সন্দেহ করবেন। ওঁর ধারণা যারা বড়-বড় চোখে তাকায় তাদের মনে প্যাঁচ আছে। কী অদ্ভুত ধারণা বলো তো!

"এদিকে অমূল্যবাবুকেও উনি মাঝে-মাঝে সন্দেহ করার কথা ভাবেন। যদিও উনি ওঁর আত্মীয়। অমূল্যবাবু মোটাসোটা, একমাথা টাক। সর্বদা কোট পরে থাকেন, যেন দারুণ ঠাণ্ডা চারদিকে। অবশ্য ওঁর ওপর সন্দেহ হওয়ার কথা একেবারেই নয়। উনি সরল সাদাসিধে মানুষ। দাদার গর্বে গর্বিত। সব সময়ে দাদার প্রশংসায় অস্থির। কোথাও বার হন না বিশেষ। মাসে একবার হয়তো শিলিগুড়িতে গিয়ে সিনেমা দেখেন। মাঝে-মাঝে বলেন একটা টিভি থাকলে বেশ হত। উনি অবশ্য টিভি-বিরোধী নন, তবে টিভি কিনতে যে সময় লাগে কিংবা মানসিক অবস্থা প্রয়োজন সেটা তাঁর নেই। নিজের কাজকর্ম নিয়ে এমন ব্যস্ত যে টিভি আনলেও তিনি দেখবেন না যে তাতে কোনও ভুল নেই।"

"মাসি, আপনিও তো বৈজ্ঞানিক?" দোলগোবিন্দ বলল।

"আমি?" মাসি হাসলেন। "আমি কেবল বিজ্ঞানের জানা জিনিস নিয়ে একটু সহজ ভাষায় লিখি যা ছোটদের ভাল লাগে। আমার লেখা মৌমাছির কথা তোমাদের বাড়িতে পাঠিয়েছিলাম তো কয়েক বছর আগে, পড়োনি?"

দোলগোবিন্দ লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করল, সেটা পড়া হয়ে ওঠেনি।

আমার চাই শক্তি আর সেই মনভোলানো স্বাদ,
যা একমাত্র মর্টনই দিতে পারে। দৌড়ের
প্রতিযোগিতায়, একের পর এক উত্তেজনার
মূহর্তে মর্টন আমার চাই-ই চাই।
জেতার জন্য যে বাড়তি শক্তি ও বাড়তি স্ফূর্তি
প্রয়োজন তার জন্য চাই মর্টন।
যারা প্রথম হয়, মর্টন প্রতিপদে
তাদের সঙ্গী।

MORTON
SWEETS

CC/M—3/86 BEN

মর্টন কন্‌ফেকশনারি অ্যাণ্ড মিল্ক প্রোডাক্টস্ ফ্যাক্টরী পোঃ অঃ মারহাওড়া ৮৪১৪১৮, জিলা ঃ সরন, বিহার

মাসি বললেন, "এ ছাড়া রয়েছে সরলপ্রাণ রাজা এবং কোয়াচি। পাহাড়ি ভুটানের লোক। অত্যন্ত সহজ জীবনযাপন। খাওয়া-দাওয়া পেলে আর কিছু চায় না। পৃথিবীতে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা তারা জানেও না, জানার দরকারও মনে করে না। বেশ আছে। কিন্তু উনি মাঝে মাঝে বলেন, "ওদের দেখতে সরল সাধু মনে হলেও অন্তরে কী আছে কে জানে ? বিশেষ করে টাকার লোভ বড় লোভ। কেউ যদি ওদের হাজার টাকা দিয়ে বলে এটা করো, তা হলে ওরা কি তা ছেড়ে দেবে ? খুন করতে বললে হয় তো খুনও করে দেবে।"

মাসির কিন্তু মনে হয় ওরা একেবারেই তা করবে না। করতে পারে না। অনেকবার তিনি তার প্রমাণ পেয়েছেন। একবার একটা দামি ঘড়ি তিনি বাগানে ভুলে ফেলে এসেছিলেন। কিন্তু কোয়াচি সেটা দেখতে পেয়ে ফেরত দিয়ে যায়। একবার ব্যাঙ্ক থেকে টাকা এনে আলমারিতে তুলতে ভুল হয়ে গিয়েছিল, বৈজ্ঞানিক বাজে কাগজের সঙ্গে প্রায় ছ'শো টাকার নোট ফেলে দিয়েছিলেন ঝুড়িতে। সে ঝুড়ির কাগজ পোড়াতে নিয়ে গিয়েছিল রাজা। পুড়িয়ে ফেলেছি বললেই সে ওই টাকাগুলি হজম করতে পারত—কিন্তু তা করেনি। "নোটগুলি দেখতে পেয়েই সে ছুটে এসে আমাকে জানায়। না, ওদের ওপর আমার কোনও সন্দেহ হয় না।"

মাসি এর পর বললেন, "আমার কিন্তু এ-বাড়িতে যাঁরা আছেন তাঁদের কারও ওপরেই সন্দেহ হয় না। তোমাদের বৈজ্ঞানিক মেসোকে তা কে বোঝাবে ? দিন-দিন খিটখিটে হয়ে পড়ছেন উনি। কোথাও বেড়াতে গেলে বোধহয় ভাল হত। কিন্তু আগামী ফেব্রুয়ারিতে জুরিখে যাওয়ার কথা আছে, তার আগে অন্তত দু'শো বিশেষ ধরনের ক্যানসার-রোগীর ওপর পরীক্ষা করা দরকার তাঁর নবতম আবিষ্কার। মনে হয় সেটা সম্ভব হবে না, অতএব জুরিখেও যাওয়া হবে না ধরে নিতে পারো।"

॥ ৩ ॥

সেদিন সন্ধে সাতটাতেই ডিনার শেষ। খাবার টেবিলে পবনরাজ এলেনই না। বলে পাঠালেন দুটো ডিমের স্যাণ্ডউইচ আর এক পট চা পাঠিয়ে দিতে। রাত্রে তাঁর কাজ আছে। অনেক রাত জাগতে হবে।

মাসি বললেন, "একেবারেই সামাজিক নন উনি। মাঝে-মাঝে এত অসুবিধে হয় আমাদের। একবার বৈজ্ঞানিক উইলহেলম স্টাইনার এসেছিলেন, এখানে দু'দিন ছিলেন, কিন্তু উনি ওঁর সঙ্গে বোধহয় সব সমেত দু'ঘণ্টাও সময় দিতে পারেননি। অবশ্য ওঁর পরীক্ষা নিয়ে খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। ওই সময় উনি পরীক্ষা করছিলেন মৌমাছিদের সময়জ্ঞান আছে কি না। প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের মৌমাছিকে বিভিন্ন সময়ে সিরাপ সবরবরাহ করে দেখছিলেন ওই মৌমাছিগুলি বিশেষ সময়ে বিশেষ টেবিলে হাজির হয় কি না। অবশ্য স্টাইনার আসাতে মোটেই তিনি খুশি হননি।"

বিকাশ বলল, "কী বোঝা গেল ? সময়জ্ঞান আছে মৌমাছিদের ?"

সৌদামিনী বললেন, "বোঝা গেল ওদের সময়জ্ঞান আছে ঠিকই। সকাল সাতটা থেকে ন'টার মধ্যে এক দলকে একটা টেবিলে সিরাপ দেওয়া হল, অন্য দলকে অন্য টেবিলে দেওয়া হল সিরাপ সকাল এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে, আবার অন্য এক দলকে দেওয়া হল বিকেল দুটো থেকে তিনটের মধ্যে। এইভাবে দু'তিন দিন চলার পর দেখা গেল বিশেষ বিশেষ মৌমাছি ঠিক ঠিক সময়ে ঠিক ঠিক টেবিলেই আসছে। ওদের ঘড়ি নেই, কিন্তু সময়জ্ঞান আছে। আমাদের অনেকের যেমন ঘড়ি আছে সময়জ্ঞান নেই, ওদের তা নয়। তবে ওদের একটা অসুবিধেও আছে, যেমন মানুষকে যদি বলা যায় আজ এগারোটায় খেতে পাবে, পরদিন বারোটায়, তার পরদিন একটায় এবং তারপর দিন আবার এগারোটায় এবং এইভাবে বারোটা, একটা, আবার এগারোটায় খেতে, তা হলে মানুষেরা ঠিক সেটা বুঝে নেবে, কিন্তু মৌমাছিদের সেটা শেখানো যায় না। রাশিয়াতে একবার একটা পরীক্ষা করা হয়েছিল একদল মৌমাছিকে উনিশ ঘণ্টা পর পর খেতে দিয়ে। তাতে উনিশ ঘণ্টা ঠিকই রইল, কিন্তু প্রতিদিনই সময়ের তফাত হতে লাগল। এতে প্রথম দিনে যদি সন্ধে সাতটায় খাদ্য দেওয়া হয় তা হলে দ্বিতীয় দিন হবে বেলা দুটো, তারপর দিন হবে সকাল ন'টা, তারপর দিন ভোর চারটে এবং তারপর সেদিনই রাত এগারোটা। কিন্তু দেখা গেল মৌমাছিরা কিছুতেই এই উনিশ ঘণ্টা ব্যাপারটা মনে রাখতে পারছে না। তা হলে কি মৌমাছিরা সূর্যের আলো দেখে সময় ঠিক করে ? অনেক পরীক্ষায় তাই প্রমাণ হল বলে মনে করা হলেও পরে দেখা গেল, খনির গভীরে যেখানে সূর্যের আলো একেবারেই ঢুকতে পারে না সেখানে তারা দৈনন্দিন সময় ঠিকই বুঝে নেয়। এই নিয়ে স্থির সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে অবশ্য আরও পরীক্ষা করা দরকার।"

"আচ্ছা, মৌমাছিরা কত বছর বাঁচে ?"

মাসি বললেন, "এটার উত্তর শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে। একটি রানি-মৌমাছি পাঁচ বছরেরও বেশি বাঁচতে পারে, আর কর্মী-মৌমাছি মাত্র ছ' সপ্তাহ। রানি-মৌমাছির কাজই হল ডিম পাড়া। ওরা প্রতিদিন হাজার হাজার ডিম পাড়তে পারে বিশেষ করে ফুলের সময়, সাধারণত বসন্তকালে। মধু যখন সহজে পাওয়া যায় তখন ডিমও বেশি পাড়ে। প্রচুর মৌমাছি হলে যখন মৌচাকে জায়গার অভাব দেখা দেয়, তখন হাজারে হাজারে কর্মী-মৌমাছি তাদের রানিকে নিয়ে চলে যায় অন্য কোনও জায়গায় বসতির খোঁজে। পুরনো বাড়ি, বড় গাছের খোঁদল, পাথরের কোনও গর্তে, গুহায়, এমনকি বড় বড় পাথর বা ব্রোঞ্জের মূর্তির নীচে। আমি একবার আগ্রা ফোর্টে ছ' সাতটা মৌচাক দেখেছিলাম।

তা হলে পুরনো মৌচাকে রানি-মৌমাছি থাকে না ?

পুরনো রানিটি থাকে না বটে, কিন্তু তরুণী রানি একটা তখন আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠে। পুরনো রানি যতদিন থাকে ততদিন তরুণী রানিটি ঘাপটি মেরে থাকে, নইলে তার সমূহ বিপদ।"

"কেন, সমূহ বিপদ কেন ?"

"কেন না, একটি মৌচাকে রানি একটিই থাকবে এটাই তাদের নিয়ম। যদি কোনও কারণে তরুণী রানির আর্বিভাব ঘটে পুরনো রানি থাকতেই, তা হলে পুরনো রানি নির্দয়ভাবে তরুণী রানিকে করে সংহার। এ এক অদ্ভুত নিয়ম। পুরুষ মৌমাছিদের জীবনটাও খুব সুখের নয়। যদিও এক হিসেবে দেখতে গেলে তাদের কর্ম বলে বিশেষ কিছু নেই। এদের ইংরেজিতে বলে ড্রোন। এদের সংখ্যা অগুনতি হলেও এদের মাত্র একজনের সঙ্গেই রানির বিয়ে হতে পারে। এই ড্রোনেদের আর কোনও কাজ নেই, এরা মধু আনে না, এদের হুল নেই, এদের পরাগ বহন করবার ক্ষমতা নেই, এদের মোম তৈরির ক্ষমতা নেই। এদের জিভ ছোট বলে ফুল থেকে মধু খেতেও পারে না। এদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে কর্মীরা। যখন কোনও কারণে মৌচাকে খাদ্যের অভাব দেখা দেয়, তখন এদের নিষ্ঠুরভাবে খুন করে কর্মীরা। অনেক সময়ে তাদের চাক থেকে তাড়িয়েও দেয় তাতেও তারা না খেয়ে মরে যায়। তবে এদের ডানাগুলি খুব শক্ত হয়। দরকার হলে অনেক দূর উড়ে যেতে পারে রানির সন্ধানে। এদের ঘ্রাণশক্তি এত প্রবল যে, বহু দূর থেকে তারা বুঝতে পারে রানি মৌমাছি কোন্ দিকে বা কত দূরে রয়েছে। রানির সঙ্গে বিয়ের পরই এই হতভাগারা মারা পড়ে। যেসব ড্রোনের রানি জোটে না, কর্মীরা সেখানেও তাদের মেরে ফেলে।"

"আচ্ছা, মৌমাছিদের কি কথা বলার ক্ষমতা আছে ?" গভীর আগ্রহে প্রশ্ন করল দোলগোবিন্দ।

"হ্যাঁ তাও আছে।" মাসি হেসে বললেন, "ওদের ভাষা আবার এক-এক জাতের মধ্যে এক এক রকম। ধরো ভারতীয় মৌমাছিদের ভাষা অতি সরল, তুলনায় অস্ট্রিয়ার মৌমাছিরা অনেক ভালভাবে তাদের বক্তব্য বোঝাতে পারে। কোথাও মধুর সন্ধান পেলে ভারতীয় মৌমাছিরা উত্তেজিত হয়ে নাচতে থাকে, সেটা দেখে অন্য মৌমাছিরা বুঝতে পারে কোথাও খাদ্য আছে, তারা তখন খুঁজে বেড়ায় খাদ্য এবং পেয়ে যায়। কিন্তু অস্ট্রিয়ার মৌমাছিরা বুঝিয়ে দিতে পারে খাদ্য কত দূরে আছে এবং কোন্ দিকে আছে।"

মাসি বললেন, "মৌমাছিরা একদিক দিয়ে দেখতে গেলে মানুষের চেয়েও বেশি হিসেবি। একটু বেশি যান্ত্রিক। তারা যা করলে ভাল হয় তাই করে। সেন্টিমেন্টাল নয় মোটেই। যে খাদ্য তাদের থাকে তা তারা সমানভাবে ভাগ করে নেয়। যে মৌমাছির দ্বারা কোনও কাজ হবে না, তাদের তারা পাত্তা দেয় না, অনেক সময় মেরে ফেলে, কিংবা চাক থেকে তাড়িয়ে দেয়, যারা চাকের বাইরে গিয়ে আর বাঁচতে পারে না।"

মুগ্ধ বিস্ময়ে দোলগোবিন্দ আর বিকাশ শুনছিল মাসির কথা। সত্যি, মৌমাছিদের ব্যাপারে তারা বিশেষ কিছুই জানত না।

বিকাশ বলল, "আচ্ছা, নানা ফুল থেকে নানারকম মধু হয়, না মধু সবই একরকম হয় ?"

দোলগোবিন্দ বলল, "কী বোকা রে তুই। শুনলি না এক ধরনের মধু ব্যবহার করলে ক্যানসার সারতে পারে ? সব মধুতে তো ক্যানসার সারবে না, না মাসি ?"

মাসি বললেন, "কথাটা ঠিক। মধু সবই আলাদা। এক এক ফুল থেকে এক এক ধরনের মধু হয়। হাজার হাজার রকম মধুর হাজার রকমের গুণ। একজন সোভিয়েত ডাক্তার বলেছেন, বহুরকম অসুখ সারাতে পারে মধু। এগুলির মধ্যে বাত, হাঁপানি, এসবও আছে। আমাদের দেশের পুরনো কবিরাজরাও অনেক রকম মধুর গুণ খুঁজে বার করেছিলেন, কেবল চর্চার অভাবে, এবং তাঁরা সব কথা ঠিক মতো লিখে না রাখায় তাঁদের মৃত্যুর পর সেগুলো হারিয়ে গেছে। আমাদের এখন নতুন করে সে-সব কাজে উঠে পড়ে লাগতে হবে। কিন্তু বিদেশী স্বার্থ আমাদের সেই কাজে বাধা দিয়েই চলেছে। আমাদের গেলানো হচ্ছে বিদেশী কোম্পানির ওষুধ দিশি ওষুধের বদলে। বিদেশী ওষুধ খারাপ যে তা নয়। কিন্তু আমাদের কাছ থেকে তারা দু' টাকার ওষুধ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একশো টাকা। এদিকে আমাদের দেশেই এককালে ছিল বহু রকম ওষুধ। সেগুলো আমরা হারিয়েছি, আর নতুন করেও গবেষণা করতে পারছি না অর্থের অভাবে, উপযুক্ত কর্মীর অভাবে, সরকারি ঔদাসীন্য। উনি অবশ্য... "

মাসি হঠাৎ থেমে গেলেন। পরে বললেন, "তোমাদের সব কথা বলছি—কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমরা এসব কথা কাউকে বলবে না। কাউকে নয়, কেমন ?"

ওরা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে মাসি বললেন, "ওঁর ধারণা, ওঁর গবেষণা চুরি করার জন্য জার্মান এক বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করছেন। উদ্দেশ্য দুটো, সেই গবেষণা নিজের নামে চালিয়ে তিনি পেতে যান অর্থ, যশ, সম্ভবত নোবেল পুরস্কার। আরও একটা উদ্দেশ্য হল ওঁকে একেবারে খুন করে দেওয়া, যাতে উনি শেষ পর্যন্ত এই ওষুধ তৈরি করতে না পারেন। ওঁর সন্দেহ, উইলহেল্ম স্টাইনার, যিনি এখানে এসেছিলেন বন্ধুর ছদ্মবেশে, তিনি টাকার ভেল্কি দেখিয়ে স্থানীয় লোকদের দিয়ে গবেষণাপত্র চুরি করানোর চেষ্টা করে চলেছেন। একবার ওঁর নামে একটা পার্সেল আসে, সেটি নরওয়ে থেকে এসেছিল, সেটি খোলার আগে ওঁর সন্দেহ হয়। প্রেরকের যে নাম ছিল সে-নামের তিনি কাউকে চেনেন না। তিনি সেটিকে নিয়ে সোজা চলে যান কলকাতায়। সেখানকার বিস্ফোরক-বিশেষজ্ঞদের কাছে সেটি পরীক্ষা করতে দেন। সেটি ছিল একটি মারাত্মক বোমা। পার্সেল খুললেই ঘটে যেত বিরাট বিস্ফোরণ। ব্যাপারটি অতি মারাত্মক মনে হওয়ায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে জানানো হয়। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা যোগাযোগ করেন ইন্টারপোল-এর সঙ্গে। ইন্টারপোল জানিয়েছে প্রেরকের নামে কেউ নেই, সে-ঠিকানাও ভুয়ো।"

"হঠাৎ সন্দেহ হল কেন ওঁর ?"

"স্টাইনার ওঁর সঙ্গে দেখা করার পর ওঁর কেন যেন মনে হয়েছিল, লোকটি সুবিধের নয়। এক নম্বরের শয়তান ! ওঁর বিরুদ্ধে ব্রিটেনের এক বড় বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন, ও সুযোগসন্ধানী এবং জালিয়াত। এককালে হিটলারের এক মারাত্মক গ্যাস-গবেষণাগারে উনি কাজ করেছিলেন, নিজের নাম ভাঁড়িয়ে, যাতে তাঁকে কেউ ইহুদি মনে না করে ! তখন থেকেই উনি খুনি বৈজ্ঞানিক হিসেবে পরিচিত, মাত্র বাইশ বছর বয়সেই উনি হাজারের বেশি ইহুদির ওপর মারাত্মক গ্যাস ব্যবহার করে তাদের অধিকাংশেরই মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন। জার্মানদের মধ্যে বহু মানবিক গুণের লোক আছেন, কিন্তু ইনি নিজে ইহুদি হয়েও ইহুদিদের ওপর বিষ পরীক্ষা করেছিলেন। এঁর সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলেন ব্রিটেনের ওঁর সেই বন্ধু বৈজ্ঞানিক। সেই কারণেই তিনি এখানে এসে ওঁর কাছ থেকে অনেক চেষ্টাতেও একটি কথা বার করতে পারেননি। উনি স্টাইনারকে দেখে বুঝতে পেরেছিলেন তিনি খারাপ মতলব নিয়েই এসেছেন। এবং তোমাদের মেসো সম্পর্কে তিনি ভয়ঙ্কর বিরূপ ধারণা নিয়ে যান, বোধহয় স্থির করেন ওঁকে, অর্থাৎ তোমাদের মেসোকে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেবেন। পার্সেলটা পেয়ে ওঁরও তাই কেমন সন্দেহ হল। একটা অদ্ভুত অনুভূতি সেটা, ওঁর একটা অদ্ভুত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় রয়েছে বলে আমার আরও অনেক ঘটনায় মনে হয়েছে।"

মাসি থামলেন। তখন সন্ধে হয়ে আসছে। কথা তখনও শেষ হয়নি। মাসি বললেন, "ওঁর কাছে নানারকম পার্সেল আসে। কোনওটাতে সন্দেহ করেননি তিনি, কিন্তু এই বিশেষ পার্সেলটি হাতে নিয়েই তাঁর মনে হল এর মধ্যে কিছু গোলমাল আছে।

দোলগোবিন্দ বলল, "যাকে বলে ই এস পি, অর্থাৎ এক্সট্রা সেন্সরি পার্সেপশন।"

মাসি বললেন, "না। এই পার্সেলটি আকারের তুলনায় ছিল বেজায় ভারী। ওঁর কাছে যেসব পার্সেল আসে সেগুলি দেখতে বড় কিন্তু মোটামুটি হাল্কা। কোনওটায় মোমের নমুনা, কোনওটায় কিছু মধু, কোনওটায় বিশেষ ধরনের পিঁপড়ে, পিঁপড়ের চাক, মৌচাকের অংশ, কোনওটায় মৃত মৌমাছি। এই পার্সেলটি ভারী হওয়ায় ওঁর মনে সন্দেহ জাগে।

মাসি আরও বললেন, "উনি যে কেবল মৌমাছি নিয়ে গবেষণা করছেন তা নয়, পিঁপড়ে নিয়েও উনি সম্প্রতি গবেষণা করছেন। দুটি প্রাণীই দারুণ সামাজিক। কিন্তু একটা গোলমালও আছে। পিঁপড়েদের সঙ্গে মৌমাছিদের একটা সহজ বিরোধ আছে। সব পিঁপড়ের সঙ্গে সব মৌমাছির নয় অবশ্য। মৌমাছিদের মধ্যে শান্ত এবং রাগী দু' ধরনের মৌমাছি আছে। শান্ত মৌমাছিরা সহজে আক্রমণ করে না। আবার দক্ষিণ আমেরিকায় এক ধরনের বড় বড় পিঁপড়ে আছে, যারা প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা হয় এবং প্রচণ্ড আক্রমণকারী। বিশেষ করে মৌচাক আক্রমণ করে মধু খেতে তারা

ওস্তাদ। তোমাদের মেসো সেই পিঁপড়েদের একটি কলোনি বানিয়েছেন। সেটি রয়েছে বড় ল্যাবরেটরির একটা অংশে। হাজার হাজার পিঁপড়ে। দেখলেই ভয় করে। তাদের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে মাংস, চিনি, গুড়, আরসোলা। পাখির মাংস ওদের বিশেষ প্রিয়, ওদের জন্য রোজই দু-চারটে মোরগ জবাই করতে হয়। ওদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য অবশ্য মধু। ওদের যদি একবার ছেড়ে দেওয়া হয় তা হলে দু'দিনে এখানকার সব মৌচাক খেয়ে শেষ করে দেবে। মৌমাছিরা বাধা দিয়েও কিছু করতে পারবে না। বিশেষ ধরনের এক মধুর গন্ধ ওরা দু' কিলোমিটার দূর থেকেও পায়।"

অতি আগ্রহে এবং উত্তেজনায় দু' জনের চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। ওরা কত কিছু জানত না। কিন্তু একটু ভয়ও করতে লাগল। দোলগোবিন্দর মনে হল সে এক আশ্চর্য জগতের কথা শুনছে। সাধারণ মৌমাছি যে অসাধারণ একটা ব্যাপার, সেটা তার মনে হল। বিকাশও ভাবছিল, যদি বোমাটা ফেটে যেত! কী বিপদই না হত তা হলে! ভাগ্যিস পবন-মেসো সন্দেহ করেছিলেন…।

হঠাৎ পবনরাজ এসে পড়লেন। চেহারা উদ্‌ভ্রান্ত। জানালেন, তিস্তাবাজার থেকে টেলিফোন এসেছে রায়বাবুর জিপ খাদে পড়ে গেছে, রায়বাবু এবং শিবুচরণ দু' জনেই জিপ পড়তে পড়তে লাফিয়ে পড়ে বেঁচে গেছে, সামান্য আহত হয়েছে— স্থানীয় এক ভদ্রলোকের বাড়িতে ওদের রাখা হয়েছে। জিপটা যখন তিস্তাবাজার থেকে ফিরছিল তখন একটা বড় পাথর পাহাড় থেকে জিপের সামনে এসে পড়ে, রায়বাবু তাতে চমকে গিয়ে বাঁ দিকে জিপ ঘুরিয়ে নিতেই জিপটা নীচের দিকে পড়তে শুরু করে। আচমকা হলেও দু' জনেই খোলা জিপ থেকে হয় ছিটকে পড়ে যায়, নয় লাফিয়ে পড়ে। এই সময় অবশ্য পাথর পড়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটে, সবে বর্ষার প্রবল দাপট গেছে। বহু পাথর আলগা হয়ে যায়। সরকারি ইঞ্জিনিয়াররা অবশ্য নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখেন, কিন্তু তবু দুর্ঘটনা ঘটে।

পবনরাজ ধপ করে বসে বললেন, "কিন্তু এটা কি দুর্ঘটনা? না কি…!" চিন্তিত হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। বললেন, "এ এক অস্বস্তিকর অবস্থা সৌদামিনী। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। কাউকে নয়! এমনকী মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে (দোলগোবিন্দ এবং বিকাশের দিকে তাকিয়ে) তোমরাও বোধহয় আমার শত্রুপক্ষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে। …কিন্তু আমি এ কী বলছি?"

সৌদামিনী বললেন, "তুমি যে কী বলছ তার ঠিক নেই!"

পবনরাজ বললেন, "আচ্ছা ধরো ব্যাপারটা যদি দুর্ঘটনা না হয়। নাও তো হতে পারে? আমার শত্রু আমাকে জব্দ করার জন্য এটা করতেই পারে। জানো সৌদামিনী, আমাকে খতম করার জন্য কেউ যদি কোটি টাকাও খরচ করে তা হলে আমি আশ্চর্য হব না। স্টাইনারকে আমার বিশ্বাস নেই। আমার ধারণা এ সমস্তের মূলে ওই শয়তানটিই রয়েছে।"

সৌদামিনী বললেন, "তা এক কাজ করো না কেন, তোমার যদি এতই সন্দেহ হয়, তা হলে দার্জিলিংয়ের পুলিশসাহেব মুখার্জিকে টেলিফোন করে দাও। আর আজ রাত্তির থেকেই এই এপিয়ারি বাংলোয় পাহারার ব্যবস্থা করা হোক। তা হলে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারবে।"

টেলিফোন অবশ্য করা গেল না। টেলিফোন যাকে বলে তখন 'মৃত'। "একটু আগেই চলছিল, এখন এর মধ্যে হল কী? রাজা? রাজা কোথায় গেল? কোয়াচিই বা কোথায়! কতক্ষণ ধরে কেলোরও তো দেখা নেই।"

"তাই তো!" সৌদামিনী বললেন, "কেলো তো এ সময় রোজ দুধ খেতে আসে! কোথায় গেল সে? কেলো, কেলো?"

একটু পরে রাজা এবং কোয়াচি এল, দেখা গেল তারা কেলোর নিঃসাড় দেহটিকে কোনও মতে ধরে নিয়ে আসছে।

"এ কী ? এ কী ?" পবনরাজ ছুটে গেলেন। "কী হয়েছে এর ?"

কেলোর মুখে ফেনা। গাঁজলা উঠছে। কেলো করুণ চোখে পবনরাজের দিকে তাকাল।

"কেউ বোধহয় বিষ খাইয়েছে !" সৌদামিনী আতঙ্ক-মেশা গলায় বললেন। "আহা রে !"

পবনরাজ ছুটে গেলেন তাঁর ঘরের দিকে। ল্যাবরেটরিতে ঢুকে দেরাজ থেকে বের করলেন পিস্তল। সঙ্গে নিলেন একটা শক্তিশালী টর্চ, চার-ব্যাটারিওলা।

"চলো তো দেখা যাক ব্যাপারটা কী ?"

বিকাশ বলল, "দাঁড়ান, আমার পিস্তলটাও নিয়ে আসি।"

"তোমার পিস্তল ?" পবনরাজ আশ্চর্য হলেন।

"এটা এয়ার পিস্তল।" আশ্বস্ত করল দোলগোবিন্দ। দেড় মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে এল বিকাশ, পকেটে গুলি ভরতে-ভরতে পিস্তলটা হাতে নিয়ে।

"অমূল্যবাবু কোথায় ? অমূল্যবাবুকে তো দেখছি না ?" আতঙ্কিত স্বরে পবনরাজ বললেন।

সৌদামিনী বললেন, "অমূল্যবাবু তো সেই ল্যাবরেটরির পাহারায় সর্বক্ষণ রয়েছেন। তুমি না গেলে ওঁর তো ছুটি নেই।"

"চলো চলো, আগে তিন নম্বর ল্যাবরেটরিতে যাই।"

উজ্জ্বল আলোয় অমূল্যবাবু মৌমাছির ছবি তুলছিলেন একটা মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে।

"ষোলোটা ছবি তুলেছি।" অমূল্যবাবু গর্বের সঙ্গে জানালেন।

"বেশ করেছেন।" পবনরাজ বললেন। তারপর উত্তেজিতভাবে দোলগোবিন্দকে বললেন, "যাও তো মাসিকে বলো, আজ যেন রাজা আর কোয়াচি বাড়িতে না যায়।" তারপর বললেন, "অমূল্যবাবু, সর্বনাশ হয়েছে, কেলোকে কেউ বিষ খাইয়েছে মনে হচ্ছে ! বিপদ, বড় বিপদ আসছে, বুঝলেন ?"

"অ্যাঁ বিষ ? তা হলে তো···।"

"কোনও ওষুধ আছে ল্যাবে, যাতে বিষের প্রভাব থেকে কুকুরকে মুক্ত করা যায় ?"

অমূল্যবাবু বললেন, "দেখি কী ব্যাপার। কী বিষ খেয়েছে তার উপর নির্ভর করে চিকিৎসা। যদি আফিং হয় তা হলে দরকার কফি। গরম কফি গলায় ঢালতে হবে। পটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেট জলে গুলে খাওয়াতে হবে গলায় সুড়সুড়ি দিয়ে। কিন্তু যদি জানা না যায় ঠিক কোন্ বিষ, তা হলে তো আন্দাজেই···।"

"আন্দাজেই চিকিৎসা করতে হবে। আফিং কিংবা কোকেন দেওয়া হয়েছে ধরে নিন। পচা মাংস খেয়ে টোমেইন পয়জনিং-ও হতে পারে। আসল দরকার বমি করানো আর শরীরটাকে গরম রাখা। পায়ে হট-ওয়াটার ব্যাগ, তাড়াতাড়ি গরম জল···।"

সৌদামিনী ছুটে চললেন গরম জল করতে। কফি ছিল বাড়িতে, ছিল পটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেটও। অমূল্যবাবু কেলোর বন্ধ চোখ খুলে দেখলেন, চোখের মণি ছোট। একটা যেন কালো রেখা ! "মনে হচ্ছে আফিংই। ওটাই সবচেয়ে সহজে পাওয়া যায়।"

আধ ঘণ্টা চেষ্টার পর ওর গলায় একটা পেনসিল দিয়ে সুড়সুড়ি দেওয়ায় কেলো বমি করল। তারপর হাঁপাতে লাগল চোখ বন্ধ করে। অমূল্যবাবু বললেন, "ওকে ঘুমুতে দিলে চলবে না। ওকে এখন একটু হাঁটাতে হবে। ওকে অ্যাকটিভ রাখতে হবে। একটু গরম দুধ···।"

চিকিৎসা চলতে লাগল। মনে হল কেলো আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠছে। তা হলে ওকে কেউ আফিং জাতীয় বিষই খাইয়েছিল। ভাগ্যিস অমূল্যবাবু ছিলেন। অমূল্যবাবু প্রথম জীবনে ডাক্তারি পড়েছিলেন তিন বছর। পারিবারিক নানা অসুবিধের জন্য পড়া ছেড়ে দিতে হয়। পরে এক ডাক্তারের অধীনে কম্পাউন্ডার হয়ে ছিলেন, পাশ-না-করা কম্পাউন্ডার। পরে পবনরাজ তাঁকে এখানে নিয়ে আসেন। এখানকার মোটামুটি চিকিৎসার প্রাথমিক ভার তাঁরই ওপর। মুরগি, শুয়োর, মানুষ, কুকুর সবারই চিকিৎসা মোটামুটি করতে পারেন। কিছু জরুরি ওষুধ তাঁর কাছে সব সময়েই মজুত থাকে। মৌমাছির হুলের বিষ নিয়ে তাঁকে জানতে হয়েছে অনেক, সেই সূত্রে অন্য বিষ নিয়েও পড়তে হয়েছে। সেটা বেশ কাজে লেগে গেল।

এমন সময় হঠাৎ অন্ধকার !

লোডশেডিং এই অঞ্চলে হয় প্রায়ই। এটাও সেই সাধারণ লোডশেডিং-ই মনে করা কিন্তু সম্ভব হল না পবনরাজের। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "লণ্ঠনগুলো সব জ্বালো।" নিজের হাতের টর্চটি জ্বাললেন। বাড়িতে কয়েকটি লণ্ঠন দু'তিন মিনিটেই জ্বলে উঠল। তিনি বললেন, "খুব সাবধান থাকতে হবে। রাজা আর কোয়াচি হাতে লাঠি নিয়ে প্রস্তুত থাকুক। আজ এখানে একটা আক্রমণ হতে পারে। সমস্ত সম্ভাবনা সেই দিকেই যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। জিপ দুর্ঘটনা, তারপর কেলোর ব্যাপার, টেলিফোন বন্ধ, এখন বিদ্যুৎ বন্ধ। এ এক ষড়যন্ত্রের ব্যাপার। আজ রাত্রিতে সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমার কাছে পিস্তল আছে, কেউ আক্রমণ করলে সহজে পার পাবে না।"

বিকাশ সে-কথা শুনে তার পিস্তলটাকে আঁকড়ে ধরল। কাছ থেকে গুলি করলে জখম করা যাবে ঠিকই, তবে চটপট গুলি ছোঁড়া যায় না এয়ার পিস্তলটিতে। প্রতিবারই স্প্রিংটাকে জোর দিতে হয়, কয়েক সেকেণ্ড তাতে লেগে যায়। যাই হোক, একেবারে নিরস্ত্র হওয়ার চাইতে ভাল।

শসা, ডিম, টম্যাটো, স্যান্ডউইচ আর কফি। এ ছাড়া আর কোনও খাদ্য খাওয়ার কথা কারও মনেই হল না। এত উত্তেজনা। মাসিও কী রকম নার্ভাস হয়ে গিয়েছেন মনে হল। উনি কেবল বলতে লাগলেন, "আমি কী করব, আমি কী করব। "অমূল্যবাবু বললেন, "বউদি, আপনি ভয় পাবেন না। আমার কাছে এমন একটা অস্ত্র আছে যাতে যেই আক্রমণ করুক কিছু করতে পারবে না। কেবল আমাকে একটা বালতি দিতে হবে পলিথিনের।"

একটা পলিথিনের বালতিতে জল ভরে তাতে অমূল্যবাবু একটা বোতল কোত্থেকে এনে কী যেন ঢাললেন। কী রকম বিজ্‌বিজ্ করে আওয়াজ হল, আর একটা মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

"মনে হচ্ছে ক্লোরোফর্ম।" দোলগোবিন্দ বলল।

"তোমরা এর কাছেও এসো না। আমি পিচকিরি নিয়ে আসছি। বলে অমূল্যবাবু দু'মিনিটের জন্য অন্তর্হিত হলেন।

একটু পরে ফিরে এলেন। বললেন, "কেলোকে দেখে এলাম। এখন হাঁপাচ্ছে বসে বসে।" দেখা গেল অমূল্যবাবুর হাতে পেতলের একটা বড় পিচকিরি।

অমূল্যবাবু বললেন, "যদি দলবদ্ধ আক্রমণ হয় তা হলে ওপর থেকে পিচকিরি দিয়ে তাদের উপর এই জল ছেটালে দারুণ এক ব্যাপার হবে। উঁচুতে থাকার এই সুবিধে। বউদি আপনি কতকগুলো পাথর নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। কোয়াচি আর রাজার হাতে থাকবে লাঠি। দাদার হাতে পিস্তল। দোলগোবিন্দর হাতে থাকবে পাথর, আমাদের কাছে কেউ আসতে পারবে না দাদা !"

প্রস্তুত হয়ে রইল তারা। প্রথমে উত্তেজনায় সকলে খাড়া হয়ে

রইল। কিছুক্ষণ পর অবশ্য উত্তেজনা অনেকটা কমে এল। পবনরাজ কিন্তু শক্ত হয়েই বসে রইলেন। একবার দোলগোবিন্দ বলল, "শিলিগুড়িতে গিয়ে পুলিশকে খবর দিতে পারলে ভাল হত।"

"সে কি সহজ কাজ নাকি, এখান থেকে কত দূর জানো শিলিগুড়ি ?"

"ত্রিশ কিলোমিটার।" দোলগোবিন্দ বলল। "এক ঘণ্টার ব্যাপার।"

বিকাশ বলল, "যাতায়াতে সব সমেত তিন ঘণ্টা। হাঁটতে না হলে অবশ্য···।"

"হাঁটব কেন ?" দোলগোবিন্দ বলল, "এখান দিয়ে ডজন-ডজন লরি যায়, বাসও যায়।"

"রাত্রে কি বাস যায় ?"

"মাঝে-মাঝে লরি তো যায়!"

একটু পরে দোলগোবিন্দ বলল, "একটা আইডিয়া এসেছে। পুলিশকে একটা চিঠি লিখে কোনও লরি-ড্রাইভারকে যদি বলা যায়, সঙ্গে অবশ্য একটা দশ টাকার নোট দিয়ে···।"

"চমৎকার!" বলল বিকাশ। "এটা চমৎকার মতলব!"

"কিন্তু মেসো যেন জানতে না পারেন।" ফিসফিসিয়ে বলল দোলগোবিন্দ।

ওরা দু'জনে নিজেদের ঘরে গেল। বাংলায় একটা চিঠি লিখল শিলিগুড়ির থানায়। যথাশীঘ্র সম্ভব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পবনরাজ চৌধুরীর এপিয়ারি বাংলোয় সশস্ত্র পুলিশ পাঠান হোক— ভয়ঙ্কর বিপদ।

এরপর 'একটু এদিক-ওদিক ঘুরে আসি' বলে ওরা দুজনে আস্তে-আস্তে ওপরে উঠে গেল। ওপরের পথ দিয়ে প্রধান রাস্তায় একটা ঘোরা-পথে যাওয়া যায়।

কিন্তু ওই পথে যাওয়া ছাড়া উপায় কী ? সাবধানে যেতে হবে। মেসো জানতে পারলে তো যেতে দেবেন না।

মিনিট দশেক পর ওরা মোটামুটি আন্দাজেই বড় রাস্তায় পৌঁছে গেল। তার আগে অবশ্য পড়ল তালাবন্ধ বড় গেট। এই গেট দিয়ে গাড়ি যেতে পারে না। তবে গেটের একটা শিক আলগা থাকায় তাদের বেরোতে খুব একটা অসুবিধে হল না, নইলে বেরোনো শক্ত হত। মনে হল কাঁটা-তারের বেড়া দিয়ে এপিয়ারি বাংলোর সবটাই ঘেরা।

॥ ৪ ॥

বড় রাস্তায় নেমে আসার প্রায় তিন মিনিট পরেই একটি লরি আসতে দেখা গেল। দোলগোবিন্দ আর বিকাশ দু'জনে হাত নাড়াতে সেটি থামল। ভাগ্য ভাল, ড্রাইভারকে বুঝিয়ে বলাতে সে রাজি হল সঙ্গে-সঙ্গেই। দশটা টাকা তাকে না দিলেও সে এই 'সামান্য কাজটা' করতে রাজি ছিল, কিন্তু তবু ওরা জোর করেই তাকে টাকাটা দিয়ে দিল। একটু নিশ্চিন্ত হল তারা। যদিও কখনও কখনও তাদের মনে হচ্ছিল, ব্যাপারটা বাড়াবাড়িই বোধহয় করে ফেলেছেন মেসো। জিপ দুর্ঘটনা এদিকে হামেশাই হয়, প্রায়ই খবরের কাগজে পড়া যায় সেটা। জিপ, লরি, বাস। ধস্‌ও নামে না তা নয়। তা ছাড়া বিদ্যুৎ তো বন্ধ হয়ই, টেলিফোনও এদেশে ক'জনের ঠিক থাকে আর বছরে ক'দিন ঠিক থাকে ? তবে এটাও ঠিক, একই দিনে এতগুলি ঘটনা একসঙ্গে ঘটার মধ্যে একটা বিপদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ উড়িয়েও দেওয়া যায় না। তার ওপর কুকুরকে বিষ খাওয়ানো···।

ওরা উপরে উঠতেই দেখা গেল অমূল্যবাবু একটা লণ্ঠন নিয়ে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

"কী ব্যাপার তোমাদের ? কোথায় গিয়েছিলে ?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে অমূল্যবাবু প্রশ্ন করলেন।

ডাক্তারবাবুর যথার্থ পরামর্শ !

ডাক্তার মানেই তাঁর কাজের কোন বাঁধাধরা সময় নেই। যখন তখন ইমারজেন্সী,
রাত বিরেতে রুগী দেখতে ছোটা — কাজের কোন বিরাম নেই... ভীষণ ক্লান্তিকর।
সেজন্যই আমি হরলিক্সের উপর ভরসা করি।
পুষ্টিকর উপাদানে ভরপুর হরলিক্স একটি শক্তিদায়ক পানীয়,
যা সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিকে দুর করে।
সেজন্যই আমি অন্যদেরও দিনে দুবার হরলিক্স খেতে পরামর্শ দিই। তা' তো দেবই !
আমি নিজেও যে হরলিক্স খাই।

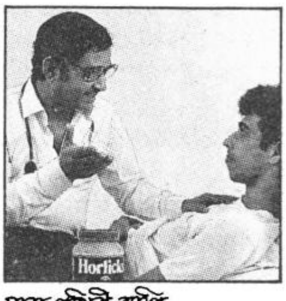

সারা পৃথিবী ব্যাপি
ডাক্তারদের বিশ্বস্ত।

হরলিক্স ঘন দুধ, মল্টেড বার্লি আর সোনালী গমের দানার পুষ্টিগুণে ভরা একটি সুস্বাদু পানীয়।
১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে, পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি পরিবারে পুষ্টি যুগিয়ে আসছে।

পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়

HMM-9239 BEN

দোলগোবিন্দ ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলায় অমূল্যবাবু মনে হল খুশিই হলেন। তবু বললেন, "বড় বিপজ্জনক কাজ করেছ বাবা। সাংঘাতিক বিপদ হতে পারত। লরির ড্রাইভার ভাল লোক না হতেও পারত। ওদের দলের লোকও হতে পারত।"

অমূল্যবাবুর হাতে একটা কাচের বয়াম।

"ওটা কী?" বিকাশ প্রশ্ন করল।

"ওটা হল সাত রাজার ধন এক মানিক।" অমূল্যবাবু বললেন। "এখানে একটা বিশেষ ধরনের মধু তৈরি হয় শুনেছ তো? বউদি বলছিলেন তোমাদের তিনি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছেন। বিশেষ এক গোলাপ এবং অন্য এক ফুলের মধু মেশাতে হয়। এ হচ্ছে সেই মধুর সংগ্রহ। এর আগে যে দু' বোতল মধু সংগ্রহ করা হয়েছিল সেগুলি গোপনে কলকাতার চিড়িয়াখানার ক্যানসার-আক্রান্ত বাঁদরদের ওপর পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। এটা হচ্ছে তৃতীয় বোতল। এই বোতলের মধুর একটা বিপদ এই যে, একটু খোলা পেলে একটা বিশেষ ধরনের পিঁপড়ে হিংস্র হয়ে ওঠে এর লোভে। প্রায় তেইশ'শো বছর আগে যখন আলেকজান্ডার সসৈন্য ভারতের দিকে আসছিলেন তখন পথে সৈন্যরা...।"

ওদের মনে পড়ে গেল, সকালে আলেকজান্ডারের কথা কী যেন বলতে চাইছিলেন রায়বাবু, কিন্তু মেসোর ধমকে তিনি শেষ করতে পারেননি।

অমূল্যবাবু বলতে লাগলেন, "সৈন্যরা খিদেয় অস্থির। হঠাৎ তারা দেখতে পেল একটি জঙ্গলে ডজনে ডজনে মৌচাক। তারা আগুন জ্বেলে মৌমাছিদের তাড়িয়ে মধু নিয়ে খেতে শুরু করে দেওয়ার পর একটা অসম্ভব কাণ্ড ঘটে গেল। অকস্মাৎ সৈন্যদের বমি হতে লাগল। তারপর অবসন্ন হয়ে সব টপাটপ মরতে লাগল। দু'তিনশো সৈন্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। ঐ মধুতে ছিল প্রচণ্ড বিষ! কিন্তু কী ফুলের মধু ছিল সেটা? কেউ জানে না। ইতিহাসে তা লেখা ছিল না। ইতিহাসে অবশ্য আরও একটা আশ্চর্য ঘটনার কথাও লেখা ছিল না। বছর দশেক আগে একজন ঐতিহাসিক পুরনো এক গ্রিক লিপি উদ্ধার করে দেখিয়েছেন আলেকজান্ডারের সৈন্যরা কেবল যে বিষ-মধু খেয়ে মারা গিয়েছিল তা নয়, মারা যাওয়ার পর বা হয়তো আগেই ওই বিশেষ মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে তাদের আক্রমণ করেছিল লক্ষ লক্ষ বড় পিঁপড়ে এবং যেখানে যেখানে মধুর ছিটে বা গন্ধ পেয়েছে তা একেবারে কুরে কুরে খেয়ে শেষ করে দিয়েছিল। ওই পথে একদিন পর যে সৈন্যরা গিয়েছিল তারা দেখতে পেয়েছিল এক বীভৎস দৃশ্য। শ'য়ে শ'য়ে মৃতদেহ, কিন্তু তাদের গায়ে মাংস প্রায় নেই। এই বৃত্তান্ত কোনও এক সৈন্য চিঠিতে লিখেছিল তারই এক প্রিয়জনকে। এই চিঠিটা বছর দশেক আগে এথেন্সের এক পণ্ডিতের হাতে আসে, তিনি...।"

টর্চ হাতে এগিয়ে আসছেন পবনরাজ। তিনি ওদের দেখে বললেন, "কী ব্যাপার, তোমরা কোথায় গিয়েছিলে? অমূল্য, তুমি জিনিসটা সাবধানে রেখেছ তো?"

অমূল্যবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এই রাখছি। এখানকার রুদ্রাক্ষ গাছটির তলায় ঝোপের মধ্যে রাখছি, কেউ এখানে খোঁজ পাবে না।"

পবনরাজ বললেন, "জায়গাটা ভালই। ওরা এলেও সন্ধান পাবে না।"

দোলগোবিন্দ ভাবল, ওরা আসবে কি? সমস্ত ব্যাপারটাই তো একটা অনুমানের ব্যাপার, একটার পর একটা কেবলই অনুমান। না, আবার হতেও পারে। মেসোর একটা অদ্ভুত শক্তি আছে। বিপদ বুঝতে পারেন। বহু পার্সেলের মধ্যে একটি হাতে নিয়েই তাঁর মনে হয়েছিল ওটাতেই রয়েছে বিস্ফোরক, এটা কম ক্ষমতা নয়। কারও কারও এ-রকম আশ্চর্য ক্ষমতা থাকে, সে খবরের কাগজে পড়েছে। বিভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিকেরা এই ক্ষমতা নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন, এবং মনে হচ্ছে কারও কারও এমন ক্ষমতা থাকা সম্ভব। সবই অবশ্য অনুমান হতে পারে, আকস্মিক ঘটনাও হতে পারে, কিন্তু কেলোকে আফিং খাওয়ানোটা? সেটা নিশ্চয়ই...

অমূল্যবাবু বিরাট রুদ্রাক্ষ গাছটির তলায় মধুর জারটিকে রেখে এলেন। বললেন, "এবারে কিছুটা নিশ্চিন্দি!"

রাত তখন অনেক হয়েছে। দোলগোবিন্দ এবং বিকাশের ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু জেগে বসে থাকতে হচ্ছে। মশার গুনগুন আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল, এখন আরও বেড়েছে। জঙ্গলের দিকে জোনাকি পোকার সমারোহ। মনে হয়, নিঃশব্দ রাত্রি। কিন্তু আওয়াজও অনেক। ঝোপের মধ্যে খচখচ আওয়াজ। খরগোশ হতে পারে, শেয়াল হতে পারে, ইঁদুর হতে পারে। মুরগিদের খাঁচা থেকে মাঝে মাঝে ঝটপট আওয়াজ তো আছেই। তা ছাড়া কয়েক মিনিট পর-পরই দ্রুত গাড়ি চলার আওয়াজ। কোনওটা টেম্পো, কোনওটা লরি। হাই উঠতে থাকে ওদের।

অমূল্যবাবু উঠে গিয়ে মাঝে মাঝে কেলোকে দেখে আসছেন এবং রিপোর্ট দিচ্ছেন। সেরেই উঠবে বলে মনে হয়। দুটো বিস্কুট আর খানিকটা দুধ খেয়েছে। বেচারা কেলো! কখনও অচেনা কারও কাছ থেকে কিছু খায় না সে। কেউ হয়তো খানিক মাংসের সঙ্গে আফিং মিশিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল। লোভে পড়ে সে তা খেয়েছে, বুঝতে পারেনি—। সাধারণত কেলো অবশ্য তা করে না।

ঘুমের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য দোলগোবিন্দ আর বিকাশ উঠে পড়ল বারান্দার মোড়া থেকে। লণ্ঠন একটা সঙ্গে নিয়ে বাগানটা ঘুরতে গেল। মাসি বললেন, "চলো, তোমাদের সঙ্গে আমিও একটু ঘুরে আসি! ঘুরতে ঘুরতে ওরা এসে পড়ল একটা ছোট্ট ঘরের কাছে। কাচের ঘর। এ রকম বেশ কয়েকটা ঘর এখানে করা আছে। কাছেই সেই রুদ্রাক্ষ গাছটি।

মাসি বললেন, "এই ঘরের মধ্যেই আছে কয়েক হাজার পিঁপড়ে কিংবা হয়তো কয়েক লক্ষই হবে। এদের জন্য রোজ কয়েক কেজি মাংস, আর প্রচুর গুড় প্রয়োজন হয়। এদের অতি সাবধানে রাখতে হয়, নইলে একবার ছাড়া পেলে এরা মানুষকে আক্রমণ করে শেষ করে দিতে পারে কয়েক মিনিটেই। বড় বিপজ্জনক এরা। এমন কী রাগী মৌমাছিদের হাত থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব, কিন্তু এদের হাত থেকে বাঁচা সম্ভব নয়।"

হঠাৎ ধপধপ আওয়াজ। রুদ্রাক্ষ গাছ থেকে জনাচারেক লাফিয়ে পড়ল তাদের সামনে। মুখে তাদের কালো কাপড় জড়ানো। একজন চাপা এবং ক্রুদ্ধ গলায় বলল, "এক পা নড়বে না, তা হলে খতম করে দেব।"

একটা বড় ছোরা ঝকঝক করে উঠল। বাকি তিনজন নীরব। কিন্তু তারা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল না। ওদের ঘিরে ধরল। প্রত্যেকের হাতেই ছোরা ঝকঝক করছে।

ওদের একজন বলল, "এবার তা হলে আসল কাজের কথায় আসা যাক।"

দোলগোবিন্দর পেটের মধ্যে কেমন গুলিয়ে উঠছে। বিকাশের মাথাটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। তার জ্যাকেটের পকেটে এয়ার পিস্তলটা। একটা গুলি তাতে ভরা আছে। কিন্তু পিস্তলে হাত দিতে সাহস হচ্ছে না। হাত পা সবই থরথর করে কাঁপছে।

ঢ্যাঙা-মতো চেহারার একটি লোক বিকৃত স্বরে বলল, "পাগলা বিশুর কথা জানিস তোরা? আমি হচ্ছি সেই পাগলা বিশু!" বলে

খিটখিট করে হেসে উঠল। উন্মাদের হাসির মত হা-হা হাসি নয়। চাপা, শয়তানি হাসি। "তোদের এখানে সব কাগজপত্র নিতে এসেছি। এখানকার মালিক কোথায় রে ?"

একজন বলল, "মধুর জারটা তো পেয়েই গিয়েছি।" বলে ঝোপ থেকে সেটি তুলে নিয়ে বুকের কাছে তুলে দেখল। "সাত রাজার ধন এক মানিক এভাবে আমাদের একেবারে হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। মৌচাকটাই বা কোথায় !" বলে সে অমূল্যবাবুর মাথায় একটা চাঁটি বসিয়ে দিল।

মাসি হঠাৎ 'উঁউঁ' করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। অমূল্যবাবু তাঁকে ধরতে গেলে একজন বলল, "খবর্দার,একদম নড়বি না ! দেব এক কোপে গলা কেটে।"

অমূল্যবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। যেন পাথরের মূর্তি।

ঢ্যাঙা লোকটি, যে নিজেকে পাগ্‌লা বিশু বলেছিল, অমূল্যবাবুর গলার কাছে ছোরাটি ধরে বলল, "একেবারে টুঁ শব্দটি নয়। আমাকে নিয়ে চল যেখানে সব জরুরি কাগজপত্র থাকে,আর এই মধুর বিশেষ মৌচাক···।"

বিকাশ কাঁপছে। সে আস্তে-আস্তে পকেটে হাত ঢুকিয়ে পিস্তলটাকে তুলে ধরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল মধুর-জার-হাতে-করা লোকটির দিকে। অতি কাছ থেকে গুলি করল, ফট্‌ করে একটা আওয়াজ হল। লোকটির হাতের জার ফেটে মধু সমস্ত তার গায়ে হাতে। দ্রুত এই ঘটনা ঘটায় ঢ্যাঙা লোকটি একটু হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, কিন্তু দু'তিন সেকেন্ড মাত্র। "শিগ্‌গির, শিগ্‌গির,মধু ! ওটা বাঁচাতে হবে।" মুখের থেকে কালো কাপড় খুলে ফেলল। "মধু চাই, এর এক আউন্সেরই দাম লক্ষ টাকা ! মধু এক বিন্দু যেন নষ্ট না হয়। এই কাপড়ে যতটুকু ধরে। পাত্র যোগাড় করতে হবে !"

মধু বাঁচাতে গিয়ে তাদের খেয়াল হয়নি যে,সৌদামিনী দেবী, যিনি এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলেন,তিনি গড়াতে গড়াতে অনেকটা দূরে চলে গেছেন, তুলে নিয়েছেন একটা বিরাট পাথর এবং সেটা ছুঁড়ে মেরেছেন সেই ভয়ঙ্কর পিপড়েদের কাচের ঘরের উপর। ঝনঝন আওয়াজ শুনে যখন ডাকাতরা সেদিকে চোখ ফেরাল,তখন তাদের সারা হাতে এবং গায়ে মধু চট্‌-চট্‌ করছে, আর হাজারে হাজারে লাখে লাখে বড়-বড় পিঁপড়ের বাহিনী তাদের ঘিরে ধরেছে।

মাসির চিৎকার, তারপর অমূল্যবাবু, দোলগোবিন্দ আর বিকাশের চিৎকার শুনে পবনবাবু পিস্তল নিয়ে ছুটে এসেছেন। পবনবাবু জোরালো টর্চের আলো ডাকাতদের মুখের উপর ফেলে বললেন, "হ্যান্ডস্‌ আপ !"

কিন্তু তাদের আর সে-ক্ষমতা ছিল না। তাদের গায়ে মধুর গন্ধে তখন আক্রমণ করেছে সেই রাক্ষুসে পিঁপড়ের বাহিনী।

আর সে কী চিৎকার ! মরণভয়ে ভীত, বেদনার্ত সে চিৎকার শুনে মাসি মনে মনে বললেন, "ইশ,কী সাঙ্ঘাতিক ! ওদের পিঁপড়েদের হাত থেকে রক্ষা করে পুলিশের হাতে দিলেই সর্বোত্তম হত। কিন্তু তার কোনও উপায় নেই। মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই চার জন জোয়ান লোক একেবারে শেষ হয়ে গেল। সে বেদনাদায়ক দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।

হঠাৎ দুপ্‌দুপ আওয়াজ। পুলিশের হুইশ্‌ল। চার জন সশস্ত্র পুলিশ এবং একজন পুলিশ অফিসারের আবির্ভাব।

পবনরাজ বললেন, "পালাও সব এখান থেকে। আপনাদের গাড়ি আছে ? সরে পড়ুন, সরে পড়ুন, এক মুহূর্তও এখানে থাকবেন না। সাংঘাতিক পিপড়ের দল এক্ষুনি আমাদের আক্রমণ করবে। ওদের বিরাট খিদের কাছে এবং হিংস্রতার কাছে আমাদের বাঁচবার কোনও সম্ভাবনাই থাকবে না, একবার যদি ওরা আক্রমণ করার সুযোগ পায়। চলুন চলুন সব ! চলে এসো তোমরা। আমরাও যাব।"

পুলিশ অফিসার বললেন, "কী ব্যাপার ?"

পবনরাজ বললেন, "ব্যাপার সব পরে গুছিয়ে বলব। এখন প্রধান কাজ হচ্ছে এখান থেকে পালানো। অমূল্যবাবু আসুন, আর কিছু সঙ্গে নিতে হবে না।" স্ত্রীকে বললেন, "সৌদামিনী,তুমি চলে এসো, দাঁড়িয়ে থেকে কোনও লাভ নেই। রাজা আর কোয়াচি,তারা শিগ্‌গির পালা। সবাইকে খবর দিয়ে দে। গ্রামে এই পিঁপড়ে গেলে কাউকে বাঁচানো যাবে না। গোরু ছাগল মানুষ মুরগি হাঁস কেউ রেহাই পাবে না। দোলগোবিন্দ, বিকাশ, চলো চলো, আর সময় নেই !"

হাঁপাতে লাগলেন পবনরাজ। তারপর একমিনিটের মধ্যে এপিয়ারি বাংলো ফাঁকা হয়ে গেল। অমূল্যবাবু বললেন, "পিঁপড়ে মারবার একটা উপায় আছে—রানি-পিঁপড়েকে ধরে তাকে···।"

"সেসব পরের কথা।" ছুটতে ছুটতে বললেন পবনরাজ। "এখন আমাদের বাঁচতে হবে। প্রথম কাজ এই মারাত্মক, সাংঘাতিক খুনে পিঁপড়েদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া।"

একটা জিপে তারপর শিলিগুড়ির একটা হোটেলে যাওয়া, সকালে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার, এবং পরে রানি-পিঁপড়েকে খুঁজে বার করে তাকে ধ্বংস করা এবং আরও পঞ্চাশ রকম ঘটনা ঘটে গেল এক সপ্তাহের মধ্যে। দেশ-বিদেশ থেকে আধডজন কীট বৈজ্ঞানিক ছুটে এলেন ব্যাপারটি জানতে। এপিয়ারি বাংলো বিখ্যাত হয়ে গেল রাতারাতি।

কিন্তু একটা ক্ষতিও হয়ে গেল। তারপর দু'বছর চলে গেছে, পবনরাজ চৌধুরী ওই বাংলোতেই থাকেন, কিন্তু সেই রাত্রিতে তিনি যে শক্‌ পেয়েছিলেন সেই শক্‌ থেকে আর উদ্ধার পাননি। তারপর থেকে তিনি গবেষণা কিছুই করতে পারেননি। ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে গেলেই তাঁর সব মনে পড়ে যায়, সেই রাত্রের বীভৎস সব ঘটনা। ওখানে আর একটি মৌমাছিও নেই। তাঁর গবেষণার সব কাগজও আলমারিতে বন্দী। রায়বাবু, শিবুচরণ দু'সপ্তাহ পরে আরোগ্য লাভ করে ফিরে এসেছিল, এখনও সকলেই ঐ বাড়িতে আগের মতই থাকেন, খান-দান, কিন্তু কোনও কাজ নেই। রাজা এবং কোয়াচিত্ত কাজে বহাল আছে। আছে সবাই। একমাত্র সৌদামিনীর মনের জোর সবচেয়ে বেশি। তাঁর ধারণা, আস্তে আস্তে তাঁর স্বামী আবার পুরনো উৎসাহ ফিরে পাবেন। ফিরে পেতেই হবে। নিয়মিত ডাক্তার আসেন শিলিগুড়ি থেকে। ডাক্তার বলেন, "খুব একটা হতাশ হওয়ার কারণ নেই। অনেক সময়েই শক চিরস্থায়ী হয় না। পবনরাজও সামলে উঠবেন, তবে আস্তে আস্তে।" প্রভুর মেজাজের সঙ্গে তাল রেখে কেলোও একটু বিষণ্ন, তবে সম্পূর্ণ সুস্থ।

সৌদামিনী ভাবেন, আহা যেন তাই হয় ! কিন্তু সেই রাত্তিরের কথা ভাবলে তাঁরও বুকটা ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করতে থাকে। কিছুতেই ভুলতে পারেন না। একটি অবশ্য ভাল খবর পাওয়া গেছে, স্টাইনারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক জেলখানায় আটক রাখা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে এক বৈজ্ঞানিকের গবেষণা লোপাট করার অপরাধ প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আর দোলগোবিন্দ, বিকাশ—ওরা ?

পাগলা বিশুর দলকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ওদের দু'জনকেই পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল প্রতিশ্রুত পাঁচ হাজার টাকা ! তাই দিয়ে দোলগোবিন্দ বানিয়েছে ছোটখাট একটা ল্যাবরেটরি। সে মেসোর মতো একজন বৈজ্ঞানিক হতে চায়। আর বিকাশ কিনেছে পোকা-মাকড় সংক্রান্ত ডজনখানেক বই। দোলগোবিন্দর সে এখন প্রধান সহকারী !

ছবি : বিমল দাস

ডাকটিকিট

ডাকটিকিটে ভুলভ্রান্তি

পরীক্ষার খাতায় তোমরা যদি কোনও ভুল করো, পরীক্ষক নম্বর কেটে দেন। অঙ্কে ভুল করলে তো একেবারে গোল্লা! ভুলের মাসুল গুনতে হয় তোমাদেরই। কিন্তু ডাকটিকিটে যদি কোনও ভুলভ্রান্তি থাকে তো মুশকিল। গত সংখ্যায় তোমাদের বলেছি, কী করে ডাকটিকিট ছাপা হয়, তার মধ্যে ভুলভ্রান্তি থেকেও যেতে পারে। তাই ডাকটিকিট ছাপার সময় প্রতি-পর্বে ডাককর্মীরা তা পরীক্ষা করে দেখেন। এমনকী, ছাপা শেষ হলে ডাকঘরে বিক্রির জন্যে পাঠানোর আগে আবার পরীক্ষা করে দেখা হয়। কিন্তু ভুল তবুও নজর এড়িয়ে যায়। ভারতীয় ডাকটিকিটে সবচেয়ে বড় ভুল হল, ১৮৫৪ সালে লিথোগ্রাফ পদ্ধতিতে ছাপা চার আনা দামের টিকিট। এই টিকিটে আটকোনা ফ্রেম ছাপা হয়েছিল একটি 'ডাই'-এর সাহায্যে লাল রঙে। আর মহারানি ভিক্টোরিয়ার মাথার প্রতিকৃতি ছাপা হয়েছিল অন্য একটি ডাই-এ নীল রঙে।

১৮৫৪ সালের মহারানি ভিক্টোরিয়ার উলটো-ছাপা ডাকটিকিট

সম্ভবত একটিমাত্র পাতায় মহারানির মাথা উলটোভাবে ছাপা হয়েছিল এবং তা ডাকঘরে বিক্রির জন্য পাঠানোও হয়েছিল। এ-পর্যন্ত ভুল করে মাথা উলটোভাবে ছাপানো ২৮টির মতো ডাকটি পাওয়া গেছে। সম্প্রতি লন্ডনের এক ডাকটিকিট-নিলামে এরকম একটি টিকিট বিক্রি হয়েছে প্রায় দু' লক্ষ টাকায়। আর-একটি মাথা উলটোভাবে ছাপানো ডাকটিকিট খামের ওপর লাগানো সিলমোহর মারা অবস্থায় বিক্রি হয়েছে ৭ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকায়। ভাবতে পারো, ভুল টিকিটের এরকম দাম!

আর-একটি বিশ্ববিখ্যাত উলটো-ছাপা টিকিট হল আমেরিকার উলটো-প্লেন। ১৯১৮ সালে ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া ও নিউইয়র্কের মধ্যে বিমান-ডাক চলাচল শুরু হয়। তাই ২৪ সেন্ট দামের একটি বিশেষ বিমান-ডাকটিকিট ছাপা হয়। সেই টিকিটটিতে আমেরিকার প্রথম ডাক-বহনকারী বিমান CURTISS JN-4 যা JENNY নামে পরিচিত ছিল, তার ফোটো। বিমান-ডাক শুরু হবার আগের দিন ডব্লু· টি· রবি নামে একজন ভদ্রলোক ওয়াশিংটনের এক ডাকঘর থেকে এই বিশেষ বিমান-ডাকটিকিটের একটা পুরো পাতা কিনে ফেলেন। বাড়ি ফিরে উলটো-ছাপা দেখে অবাক হয়ে যান। তবে এই টিকিটের একটিমাত্র পাতাই ছাপা হয়েছিল উলটোভাবে।

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

ম্যাজিক

বাধ্য বলের জাদু

একটা পিং পং বল নাও, তারপর দুটো ছুঁচ জোগাড় করো, একটা ছুঁচ হবে পিং পং বলের ব্যাসের চেয়ে একটু ছোট। আর-একটা বড়। এবার খানিকটা মজবুত সুতো নাও। একটা কথা মনে রাখতে হবে, সুতোটা যেন দুটো ছুঁচেরই ভিতর দিয়ে সহজে যাতায়াত করতে পারে। সুতোটায় দুটো ছুঁচই গাঁথো। প্রথমে ছোট ছুঁচটা গাঁথো, একটু সুতো ছাড়ো, তারপর গেঁথে নাও বড় ছুঁচটা। এবার পিং পং বলটা নাও। বড় ছুঁচটা দিয়ে বলটার মাঝখান এফোঁড়-ওফোঁড় করে দাও। এবার ধীরে-ধীরে সুতোয় গাঁথা ছোট ছুঁচটা পিং পং বলের ভেতর ঢুকিয়ে দাও। ছবি দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধে হবে। খেলাটা যখন দেখাচ্ছ, বন্ধুরা দেখছে, সুতোয়-গাঁথা একটা বল রয়েছে তোমার হাতে। তুমি থামতে বললে থেমে যাচ্ছে, চলতে বললে চলছে বলটা। 'বাধ্য বলের' এই খেলাটা কীভাবে দেখাবে তা জানো তো? জিনিসটা যেমনভাবে বলেছি, তেমনভাবে তৈরি করে নাও। এবার খেলা দেখাবার সময় সুতোটা আলগা করে ধরলেই বলটা চলতে শুরু করবে, আর যখন 'স্টপ্‌' বলবে তক্ষুনি সুতোটাকে টান করে ধরো, দেখবে বাধ্য বল স্টপ্‌ শুনে নট নড়নচড়ন।

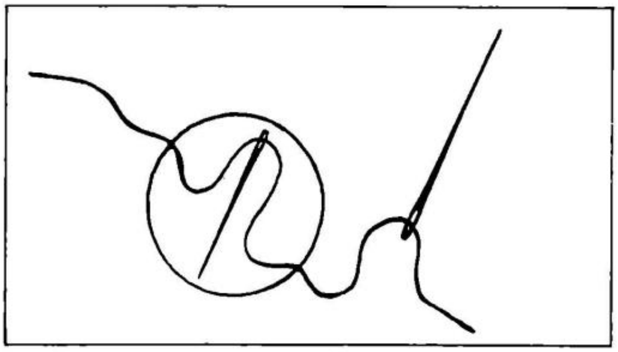

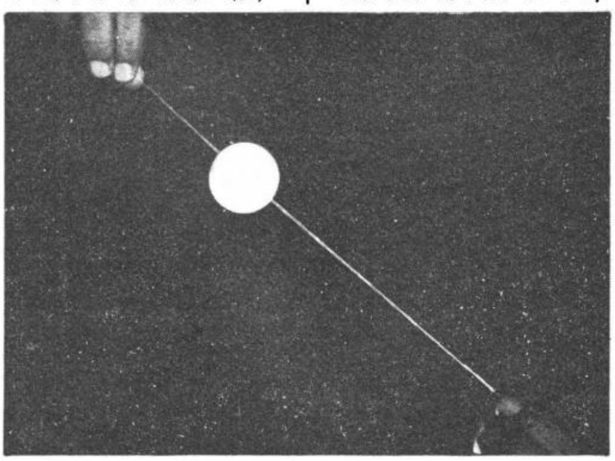

(জাদুকর) তাপস বসু

বরফ কাটার কাজে সূর্য

সম্প্রতি ভূবিজ্ঞানীদের একটি সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয় । এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা সৌরশক্তি চালিত একটি ড্রিল তৈরি করেছেন বরফ কাটার জন্য । যন্ত্রটি এক ঘণ্টায় প্রায় দশ ফুট বরফের স্তর ভেদ করতে পারে । ফলে, ভারী বৈদ্যুতিক ড্রিল নিয়ে যেসব দুর্গম জায়গায় পৌঁছনো শক্ত, সেখানে এই নতুন ড্রিল ব্যবহার করে ভূবিজ্ঞানীরা খুব সহজেই বরফের নমুনা সংগ্রহ করতে পারবেন ।

সৌরশক্তিচালিত এই ড্রিল নিয়ে প্রথম অভিযান চালানো হয় পেরুর কোয়েলকায়া বরফচূড়ায় । এই জায়গাটি এতই দুর্গম যে, হেলিকপ্টারে করেও বৈদ্যুতিক ড্রিল চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক জেনারেটর পৌঁছে দেওয়া যায়নি । ফলে নতুন আবিষ্কৃত ড্রিল ব্যবহার করে অভিযাত্রীরা সফল হয়েছেন ।

জলে দ্রবণীয় বন্দুক

নিউ হ্যাম্পশায়ারের একটি ছোট কোম্পানি 'টাফা ইনকর্পোরেটেড' সম্প্রতি এমন একটি ধাতু-সঙ্কর আবিষ্কার করেছে যা নুন বা চিনির মতোই জলে গুলে যায় । কোম্পানির বিজ্ঞান-গবেষকরা কিন্তু নিতান্ত আকস্মিকভাবেই এই নতুন ধাতু-সঙ্করটি আবিষ্কার করে ফেলেছেন । তাঁরা একটি বন্দুকের ডিজাইন উন্নত করার চেষ্টায় গবেষণা করছিলেন । না, বন্দুকটা গুলি-ছোঁড়া বন্দুক নয় ।

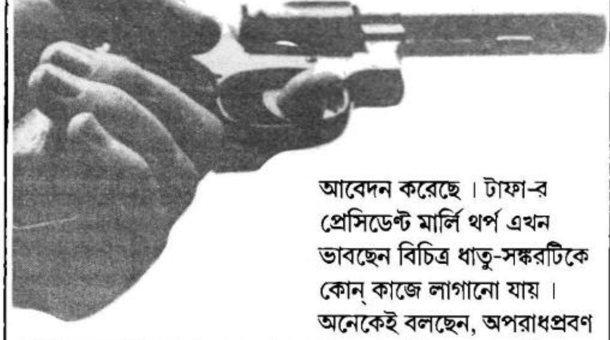

সেটা তরল ধাতু স্প্রে করে মোম বা কাঠের মডেলের ওপরে । যার ফলে শক্ত ধাতব ছাঁচ তৈরি হয়ে যায় । ধাতু স্প্রে করার জন্য বন্দুকটি দুটি ভিন্ন ধাতুর তারকে বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম কণায় পরিণত করে । একদিন ঠিক এই কাজটি করতে গিয়ে এমন একটি ধাতু-সঙ্করের ছাঁচ তৈরি হল যে, গবেষকরা সবিস্ময়ে লক্ষ করলেন, সেটা দিব্যি জলে ধুয়ে যাচ্ছে । ওই বিচিত্র ধাতু-সঙ্করের ছোট একটি টুকরো জলে দ্রবীভূত হতে প্রায় বারো মিনিট সময় নেয় । আর তখন হাইড্রোজেনের বুদ্বুদ বেরিয়ে আসে । ধাতু-সঙ্করটি তৈরি হয়েছে অ্যালুমিনিয়াম ও অন্য একটি ধাতু দিয়ে । দ্বিতীয় ধাতুটির নাম গোপন করে টাফা বলছে 'এক্স' ধাতু । 'এক্স'-এর পরিচয় গোপন রেখে টাফা নতুন ধাতু-সঙ্করটির জন্য পেটেন্টের আবেদন করেছে । টাফা-র প্রেসিডেন্ট মার্লি থর্প এখন ভাবছেন বিচিত্র ধাতু-সঙ্করটিকে কোন্ কাজে লাগানো যায় । অনেকেই বলছেন, অপরাধপ্রবণ মানুষরা এই ধাতু-সঙ্কর দিয়ে বন্দুক কিংবা ছুরি তৈরি করার কথা ভাববে । কারণ কাজ সেরে এই ধাতু-সঙ্করের তৈরি অস্ত্র টয়লেটে ফেলে ফ্লাশ টেনে দিলেই হল । অস্ত্র উধাও হয়ে যাবে । কিন্তু থর্প জানিয়েছেন, এই সঙ্করটি অ্যালুমিনিয়ামের মতোই একটু নরম ধাতের ।

বহুরূপী তবল

ডঃ জেকিল ও মিঃ হাইডের মতোই এই তরলের দুই রূপ । আধুনিক গাড়ির শক অ্যাবজরভার-এ এই তরল ব্যবহার করা হচ্ছে, কারণ একটি বোতাম টেপামাত্রই এই বিশেষ তরল মুহূর্তে কঠিন পদার্থে পরিণত হয় । আবার অন্য একটি বোতাম টিপলেই কঠিন পরিণত হবে তরলে । ফলে, এই দুটি বোতামের সাহায্যে কোনও গাড়ি

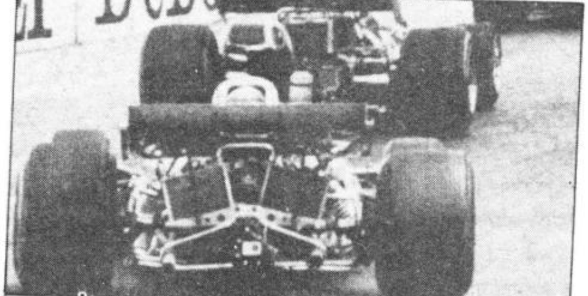

সব ধরনের পথেই দিব্যি চলতে পারে, তার ক্ষমতার বিশেষ তারতম্য হয় না । অদ্ভুত এই তরলে রয়েছে তেলের মধ্যে নিলম্বিত সিলিকা জেল । এর পোশাকি নাম 'ইলেকট্রোরিওলজিক্যাল ফ্লুইড' । এই তরলে সামান্য একটু ভোল্টেজ দিলেই সেটা কঠিন হয়ে যায় । যেমন, কোনও পাইপে যদি এই তরল থাকে, তা হলে পাইপের দু-প্রান্তে ভোল্টেজ প্রয়োগ করলেই পাইপের তরল কঠিনে পরিণত হবে । রূপান্তর ঘটতে সময় লাগবে মাত্র কয়েক মিলিসেকেণ্ড (১ মিলিসেকেণ্ড = এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ) । মার্কিন বিজ্ঞানী উইলস্ উইনস্লো ১৯৪৭ সালে প্রথম এই ঘটনা আবিষ্কার করেন । এখন এ-নিয়ে দ্রুত গবেষণা করছে গ্রেট ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপান । বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগামী ১৯৯০ সালের মধ্যেই ইলেকট্রোরিওলজিক্যাল ফ্লুইড এরোপ্লেন ল্যাণ্ডিং-এর কাজে ব্যবহার করা যাবে, তখন যে-কোনও ধরনের রানওয়েতে প্লেন নামাতে তেমন অসুবিধে হবে না । এ ছাড়া রোবট, কম্পিউটার বর্তনী, অ্যান্টিলক ব্রেক, পাইল ড্রাইভিং ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এই তরলের ব্যবহার নতুন দিগন্ত খুলে দেবে ।

সাফ-সুতরো জুতো

বরফ কাদা বা অন্য কোনও পিছল জায়গায় সহজে পা তো পিছলেই যাবে না, উপরন্তু এই জুতো নিজেই নিজের সোল পরিষ্কার রাখে । জুতোর সোলের সামনের দিকটা খানিকটা তেরছা খাঁজ কেটে তৈরি । খাঁজগুলো তেরছা হওয়ার ফলে হাঁটার সময় একটা কৃন্তন বল বা শিয়ার ফোর্স তৈরি হয় । এই বল সোলে কোনও পাথর, মাটি ইত্যাদি জমতে দেয় না । তাদের ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় সোলের বাইরে । জুতোটি তৈরি করেছে আমেরিকার ওয়ারিংটনের জোর্ডান ডেভিড সেফটি প্রোডাক্টস্ ।

অনুসন্ধানী

অরিন্দম দেবনাথ

তিন দিকে জল, নীল জল

চারদিকে পাহাড়, আর পাহাড়ের ওপর ঘন জঙ্গল। বিরাট বিরাট গাছপালা, পাহাড়গুলোর চারদিকে রয়েছে নীল জল, নোনা জল অর্থাৎ সমুদ্র। এর নাম নর্থ সি, এই নর্থ সি নরওয়েকে তিনদিকে ঘিরে রেখেছে।

যে জায়গার কথা বলছি, সেটা নরওয়ের পশ্চিমের ছোট্ট একটি জেলা। নাম বোমলো। বোমলো দ্বীপপুঞ্জের সিগ্গারভাগ নামে এক জায়গায় আমার বন্ধু আন্নার বাড়িতে আমি চারদিন ছিলাম। আমার ঘরটা ছিল একেবারে নর্থসি'র ওপর। সামনের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু নীল জল, আর দু'ধারে ডাইনে-বাঁয়ে বন-জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের মালা। তারই মাঝে কয়েকটা বাড়ি ছবির মতো সাজানো।

এখানে নর্থ সি'র বুকে দেখা যায় পাল খাটানো অসংখ্য নৌকার সারি। একজন কিংবা দুজনে মিলে এগুলো চালানো যায়। এ ছাড়া মোটর-বোট, মাছ ধরার নৌকা, ওয়াটার-স্কুটার দেখা যায়। মোটরবোট এবং ওয়াটার-স্কুটারগুলো যখন জল কেটে খুব জোরে এগোতে থাকে, তখন দু'পাশে ছেটানো জল, যেন ফোয়ারা হয়ে আরোহীদের স্নান করিয়ে দিতে চায়, তবে মজার কথা হল, আরোহীদের গায়ে জল প্রায় লাগে না বললেই চলে।

গতবছর পাঁচ অগস্ট আমি এবং আমার আরও তিন নরওয়েজিয়ান বন্ধু হেলগে, এনরিক এবং লার্ডস মিলে পনেরো ফুট লম্বা, পাঁচ ফুট চওড়া একটা মোটর-বোট নিয়ে রওনা হয়েছিলাম বোম্‌লো দ্বীপপুঞ্জের মধ্যেই ছোট্ট একটা দ্বীপের উদ্দেশে—নাম থোস্কা। সেটা নরওয়ের পশ্চিম সীমান্ত। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল মাছ ধরা।

আমরা যখন রওনা দিলাম, তখন আবহাওয়া খুব একটা ভাল ছিল না। তাপমাত্রা ছিল পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। অবশ্য নরওয়ের এই বোম্‌লো দ্বীপপুঞ্জে প্রায় সব সময়ই বৃষ্টি হয়।

'সিগ্গারভাগ' থেকে 'থোস্কা'র দূরত্ব প্রায় ১৭ কিঃ মিঃ। যেতে হবে মোটর-বোটে। রওনা হবার মিনিট কুড়ি পরে, মনে হল আমাদের পক্ষে আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। কারণ, টিপটিপ করে বৃষ্টি তো পড়ছিলই, তার সঙ্গে এবার শুরু হল জোরালো হাওয়া। তা ছাড়া আমাদের মোটর-বোটে আচ্ছাদন প্রায় ছিল না বললেই চলে। অন্যদিকে জলের ঢেউগুলো ছিল বেশ উঁচু ও বিপজ্জনক। আমাদের বোটের অবস্থা টালমাটাল। বিরাট ঢেউগুলো যেন আছড়ে পড়ছিল আমাদেরই ওপর। যদিও গা ঢেকে নিয়েছিলাম ওয়াটারপ্রুফ জ্যাকেট এবং প্যান্ট দিয়ে, তবুও আমাদের চোখে-মুখে ঢুকে যাচ্ছিল নোনা জল।

দু'পাশেই বিরাট ঢেউ, মনে হচ্ছিল যেন দু'পাশেই জলের প্রাচীর। যে কোনও মুহূর্তে আমাদের বোট বুঝি ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেঙে পড়বে। কিন্তু কপাল ভাল, শেষপর্যন্ত আমরা পৌঁছে গেলাম গন্তব্যস্থলে। থোস্কাদ্বীপের পথে চোখে পড়ল একটা লাইটহাউস, দ্বীপে পৌঁছনোর আগে-আগেই সমুদ্রে মাছ ধরতে শুরু করেছিলাম বঁড়শি ফেলে।

বঁড়শিগুলো একটু বিশেষ ধরনের, এতে কোনও খাবার থাকে না। বঁড়শির ঠিক ওপরেই থাকে পেতলের একটা ছোট্ট মাছ। আর

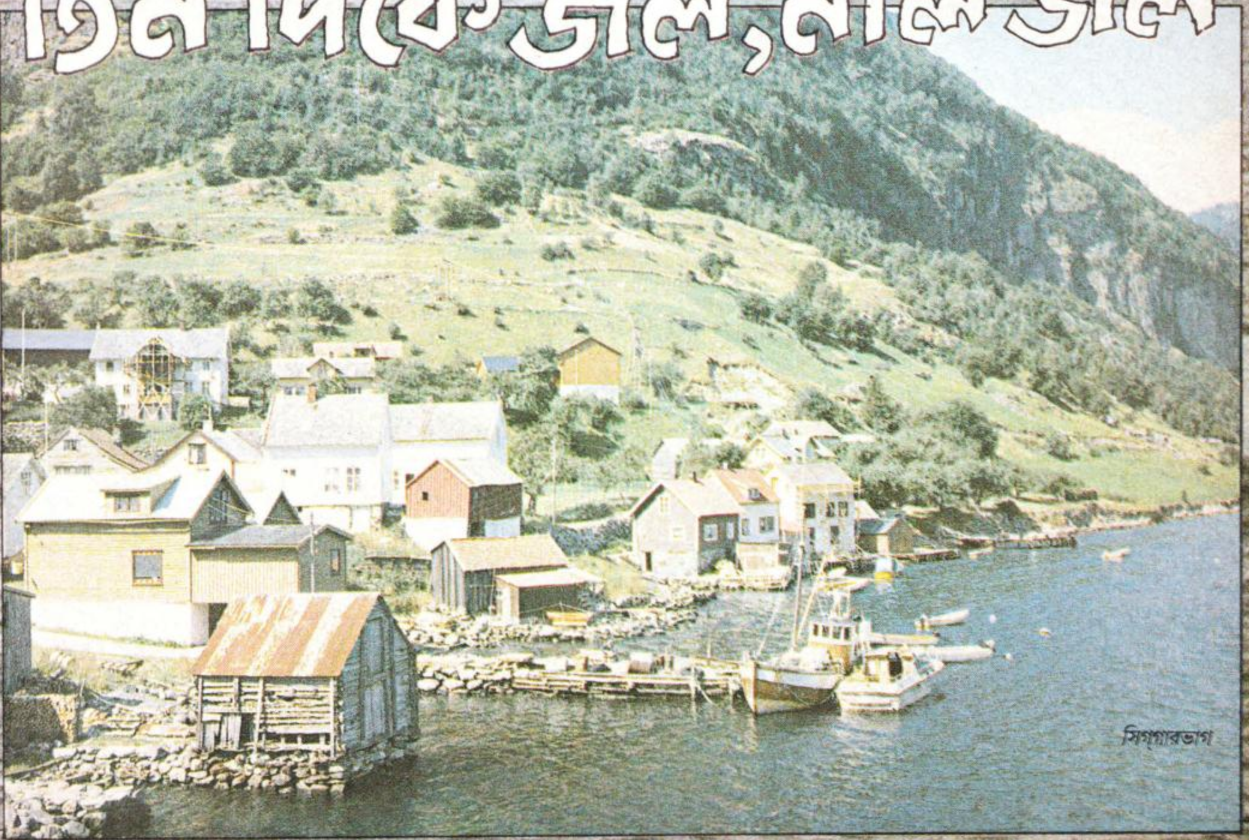

সিগ্গারভাগ

পেতলের মাছগুলো চকচক করে। মাছগুলোও খাবার ভেবে সেগুলো গিলে ফেলে, তৎক্ষণাৎ বঁড়শিতে টান লাগে। এরপরে কাজ শুধু হুইল গুটিয়ে জ্যান্ত মাছগুলো টেনে তোলা।

মাছ ধরার সময় আমাদের মাঝে-মাঝেই হতাশ হতে হয়েছিল। প্রথমবার আমার বঁড়শিতে টান লাগতেই হুইল গোটাতে শুরু করলাম। অনেক ওজন অনুভব করলাম। কিন্তু বড় মাছ হলে যেরকম বঁড়শিতে ঝাঁকুনি হওয়া উচিত ছিল, সেটা পেলাম না! সবাই আমাকে উৎসাহ দিতে লাগল তাড়াতাড়ি হুইল গুটিয়ে মাছ তোলার জন্য। ওপরে তুলে দেখতে পেলাম, মাছ নয়! বিরাট লাল রঙের জেলিফিশ। আসলে আমি ছাড়া বাকি তিনজন প্রথমেই বুঝতে পেরেছিল, ওটা কোনও মাছ নয়। কারণ, আমার বঁড়শিতে কোনও ঝাঁকুনির লক্ষণ না দেখেই ওরা বুঝেছিল। এর ঠিক পরেই আমার বঁড়শিতে ধরা পড়ে একটা ম্যাকরেল। ওজন ছিল ১৭০০ গ্রাম-এর মতো। সারা দিনে মাত্র একটা ম্যাকরেলই ধরা পড়েছিল। আবার অনেক মাছ বঁড়শিতে গেঁথেও বোটে তুলতে পারা যায়নি, তোলার আগেই খুলে পড়ে গেছে।

আমরা মাছ ধরেছিলাম প্রচুর। যেমন সি-ট্রাউট কড, ম্যাকরেল ইত্যাদি। আমরা সবাই মিলে মাছ ধরেছিলাম মোট পঞ্চাশটার মতো। প্রত্যেকটা মাছই ছিল ৭৫০ গ্রাম থেকে ২০০০ গ্রামের মধ্যে। তবে আমরা কিন্তু চলন্ত অবস্থায় মাছ ধরিনি। মোটর-বোটের মুখ স্রোতের উলটোদিকে করে ইঞ্জিন চালু করে রাখা হয়েছিল, ফলে মোটর-বোট ছিল মোটামুটি স্থির। বোট চালাচ্ছিল এনরিক। বয়স পঁচিশ। সে একজন দক্ষ বোট-চালক। নরওয়ের বেতারে সে অভিনয়ও করে। হেলগে একজন সাংবাদিক। সে 'অ্যাটলানটিকস' পত্রিকার এডিটর-ইন-চিফ, বয়স ৪২। লার্ডস একজন ছাত্র। আমারই বয়সী। বছর-কুড়ি।

সন্ধে সাতটায় গিয়ে পৌঁছলাম থোস্কা দ্বীপে। জানতে পারলাম এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। এই দ্বীপে সাধারণত কেউ থাকে না। তবে এক ভদ্রলোক এখানে ছিলেন। এখানকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং প্রচন্ড শীত উপেক্ষা করেও। বছর দুয়েক হল তিনি মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর কাহিনীটিও বড় করুণ। তিনি মারা যান মাথায় সিগাল পাখির ঠোক্কর খেয়ে। বুঝতে পারা যায়নি, কেন সিগাল তাঁর মাথায় ঠোক্কর মেরেছিল। এখানে এই পাখিগুলোই ছিল ওঁর সঙ্গী।

মাছের লোভে সিগালের ঝাঁক

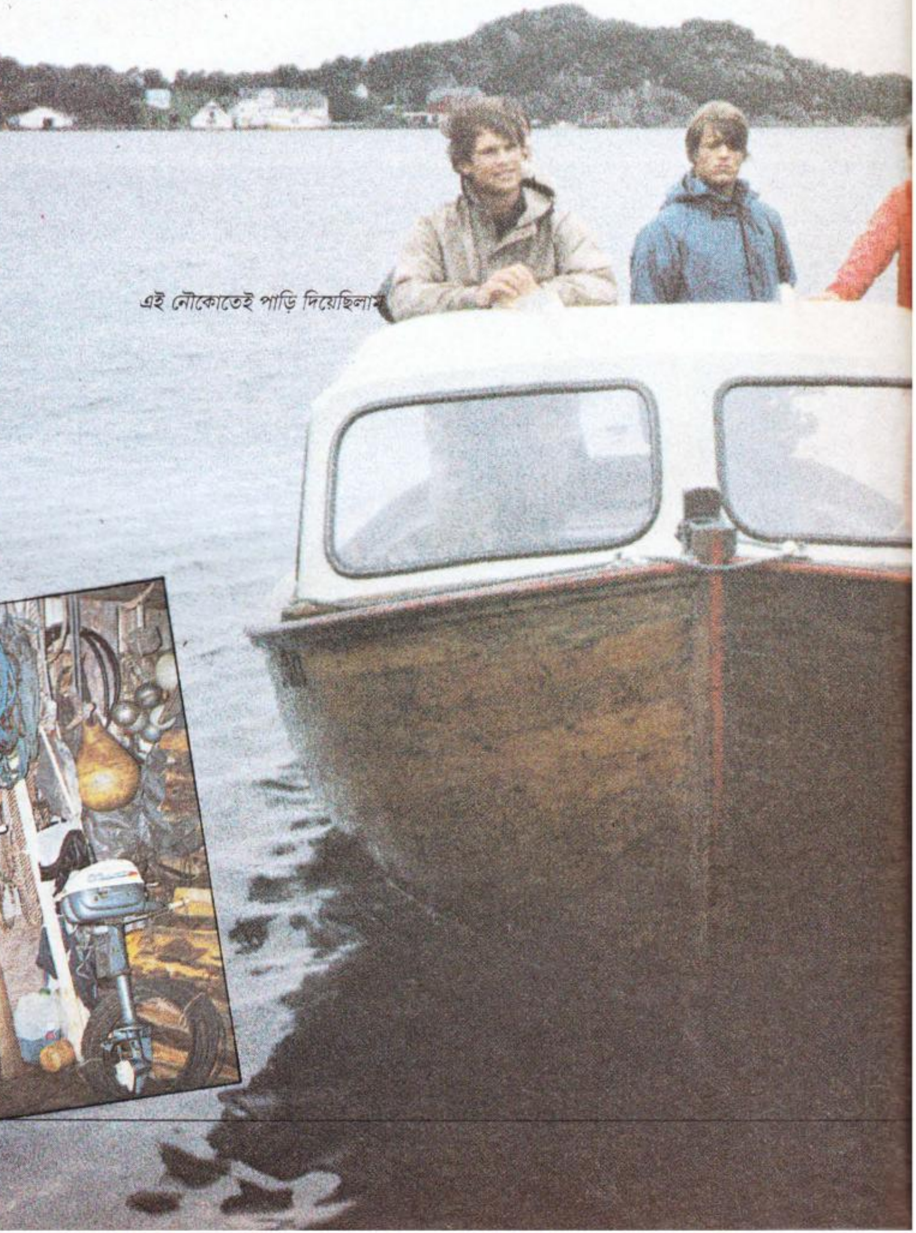

এই নৌকোতেই পাড়ি দিয়েছিলাম

মাছ-ধরার সরঞ্জাম

থোস্কাদ্বীপে আমরা টিফিন সারলাম সঙ্গে-আনা খাবার দিয়ে। থোস্কাদ্বীপটা ঘুরে দেখা হল। সে যেন প্রকৃতির নিজ-হাতে-গড়া এক চমৎকার উদ্যান। জলস্রোত বয়ে চলেছে তার আপন পথ ধরে। মাঝে-মাঝে স্রোতের একাংশ যেন লুকোচুরি খেলছে জল থেকে সোজা উঠে যাওয়া পাহাড়ের ধূসর চাঁইয়ের সঙ্গে। আছড়ে-পড়া স্রোত দ্বিগুণ উৎসাহে ফোয়ারা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে নীচে, সুনীল ফেনিল জলরাশিতে। অভিভূত হওয়ার মতো দৃশ্য।

আসার পথেও কিছুক্ষণ মাছ ধরা হল। ফেরার সময় সমুদ্র ছিল অপেক্ষাকৃত শান্ত। মোটর-বোটে বসেই মাছ কাটছিল এনরিক। আর এই মাছের লোভে আমাদের বোটের পেছনে ও মাথার ওপরে সিগালের ঝাঁক উড়ছিল। আর সমুদ্রের জলে তরল সোনা ঢেলে দিচ্ছিল সূর্য। আমরা যখন 'সিগ্‌গারভাগ'-এ ফিরে এলাম তখন ঘড়িতে রাত এগারোটা। তখনও সূর্য ডোবেনি। এইজন্যই নরওয়েকে 'নিশীথ সূর্যের দেশ' বলে।

সিগ্‌গারভাগে ফিরে দেখেছিলাম পিছনে পড়ে আছে নীল জলরাশি। আর একটি নিঃসঙ্গ সিগাল।

ফোটো : অরিন্দম দেবনাথ

পাহাড়ের গায়ে ফুটে আছে অজানা ফুল

ড্র্যাকুলার মুখোমুখি

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই কাচের জানলা দিয়ে চোখে পড়ল আকাশের গায়ে লাল অক্ষরে লেখা কাস্‌ল ড্র্যাকুলা। অক্ষরগুলো থেকে চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত!

আমি একা শুয়ে আছি হোটেলের ঘরে। কানাডার অন্টারিওতে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের কোল ঘেঁষে পোস্টকার্ডের গায়ে আঁকা ছবির মতো সুন্দর 'নায়েগ্রা টাউন'। সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় অজস্র হলিডে টাউনের একটি হল এই নায়েগ্রা শহর।

আমাদের দেশে এখনও হলিডে টাউনের ব্যাপারটা একেবারেই চালু হয়নি। অবিশ্বাস্য, বিদঘুটে, মজার হযবরল উপাদান দিয়ে পুরো একটা শহর বানাবার মতো প্রতিভা এখনও ভারতীয় চরিত্রে প্রকাশ পায়নি। আমরা 'প্লেন লিভিং অ্যান্ড হাই থিঙ্কিং'-এ বিশ্বাস করি বলেই বোধহয় হলিডে টাউনের মজাটাকে আজও ধরতে পারিনি।

যাই হোক, নায়েগ্রা শহরে সারাদিন ধরে জলপ্রপাত দেখার উপরি পাওনা হিসেবে নানারকম মজা লুটতে লুটতে ক্লান্ত হয়ে রাত বারোটা নাগাদ হোটেলে ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ যেন কেউ ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিল। আর তার পরেই হোটেলের জানলা দিয়ে চোখে পড়ল ওই ভয়ঙ্কর দুটো শব্দ: কাস্‌ল ড্র্যাকুলা।

ড্র্যাকুলার পরিচয় নিশ্চয় নতুন করে

সাক্ষাৎ বিভীষিকা

হোটেলের জানলা থেকে দেখা কাস্‌ল ড্র্যাকুলা

তোমাদের দিতে হবে না। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে ড্র্যাকুলার সিনেমা দেখে ভয়ঙ্কর ভয় পেয়েছিলাম। মনে আছে, হঠাৎ ঠোঁটের পাশ থেকে বেরিয়ে-আসা ধারালো দাঁত দিয়ে কাউন্ট ড্র্যাকুলা একের পর এক নিষ্পাপ, সরল মানুষের গলা ফুটো করে রক্ত খেয়ে তেষ্টা মেটাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখার পর রাত্তিরে একা ঘুমোতে পারতাম না। শুধু তা-ই নয়, সিনেমায় দেখেছিলাম, ড্র্যাকুলা যাদের রক্ত খাচ্ছে, তারাও একে-একে রক্তখেকো ভ্যাম্পায়ার হয়ে যাচ্ছে! অর্থাৎ, তাদেরও ঠোঁটের পাশে লম্বা ধারালো একজোড়া দাঁত গজাচ্ছে আর সেইসঙ্গে তাদের মন বলছে, রক্ত চাই, রক্ত।

এই অভিজ্ঞতার অনেক পরে ব্রাম স্টোকার-এর 'ড্র্যাকুলা' উপন্যাসটি আমি পড়ি। তখন তো আর ছেলেমানুষ নই। তবুও ওই উপন্যাস পড়ার পর থেকেই কারও ঠোঁটের পাশে লম্বা ধারালো দাঁত দেখলেই আমার গা ছমছম করে।

যতদূর জানি, ব্রাম স্টোকার পাঁচটি উপন্যাস লিখেছিলেন: দ্য স্নেক্স পাস (১৮৯০), ড্র্যাকুলা (১৮৯০), দ্য মিস্ট্রি অব দ্য সি (১৯০২), দ্য জুয়েল অব সেভেন স্টারস্ (১৯০৪) এবং দ্য লেডি অব দ্য শ্রাউড (১৯০৯)। এদের মধ্যে দ্বিতীয় উপন্যাস ড্র্যাকুলা-ই ধোপে টিঁকেছে। ব্রাম স্টোকার এই একখানা লেখার জোরেই পৃথিবী জয় করেছেন। শেলির স্ত্রী মেরি শেলি যেমন 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' লিখেই অমর হয়ে আছেন।

ব্রাম স্টোকারের ফুটবল খেলা এবং লেখা দুটোই সমান অপ্রত্যাশিত। স্টোকার ছেলেবেলায় ছিলেন রুগণ্ দুর্বল ও খোঁড়া। কিন্তু স্রেফ মনের জোরে তিনি ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ফুটবল খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিলেন।

স্টোকারের চাকরিজীবন শুরু হয় ডাবলিন কাস্‌ল-এ। সেখানে দশ বছর মুখ গুঁজে চাকরি করেছেন। সাহিত্যের ধারে-কাছেও যাননি। এরপর সার হেনরি আরভিং নামের বিখ্যাত অভিনেতার সেক্রেটারি হিসেবে সাতাশ বছর চাকরি করেছিলেন স্টোকার। প্রত্যেক দিন সার হেনরির প্রায় পঞ্চাশটি চিঠি লিখে দিতেন স্টোকার। আর এই চিঠি লিখতে-লিখতেই তিনি সাহিত্য রচনা শিখে গেলেন। লিখে ফেললেন পাঁচ-পাঁচটা উপন্যাস।

এবার নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে, কী এমন গল্প স্টোকারের ড্র্যাকুলা, যাতে আজও লোকে তা মনে রেখেছে, পড়ে আজও আমরা ভয় পাই? ড্র্যাকুলা আসলে ডায়েরির মতো করে লেখা একটা উপন্যাস। জোনাথান হার্কার নামের এক যুবক যেন এই ডায়েরিটা লিখছে। এই ডায়েরি থেকেই আমরা জানতে পারছি কাউন্ট ড্র্যাকুলা আসলে এক ভয়ঙ্কর ভ্যাম্পায়ার। হার্কার তার স্ত্রী মাইনা, ডক্টর সেওয়ার্ড এবং ডক্টর ভ্যান হেলসিং—এই চারজনের সঙ্গে ড্র্যাকুলার মোকাবিলা নিয়েই স্টোকারের গল্প। কীভাবে লুসির মতো একটি সরল সুন্দর মেয়ে ভ্যাম্পায়ার ড্র্যাকুলার কামড় খেয়ে নিজেই ভ্যাম্পায়ার হয়ে যাচ্ছে এবং রক্তের তেষ্টায় ছটফট করছে, সে-গল্প পড়ে কার না গা-ছমছম করবে?

তবে ১৮৯০ সাল থেকে ১৯৮৬, এই ৯৬ বছরে সিনেমায়, থিয়েটারে ড্র্যাকুলা গল্পের খোলনলচে পালটে গেছে। সম্ভবত ১৯২৭ সালে ড্র্যাকুলার গল্প থেকে প্রথম নাটক লেখা হয়। অনেকে মনে করেন, ১৯৩১ সালে ড্র্যাকুলার চরিত্রে বেলা লুগোসিকে নিয়ে যে সিনেমাটি তৈরি হয় সেটাই প্রথম ড্র্যাকুলা চলচ্চিত্র। আসলে কিন্তু প্রথম ড্র্যাকুলা-ফিল্ম তৈরি হয় ১৯২২ সালে জার্মানিতে। ছবিটির নাম 'নস্‌কেরাটু।'

একটা কথা, স্টোকার কি ড্র্যাকুলার গল্পটা সম্পূর্ণভাবেই বাতাস থেকে বানিয়েছিলেন? মোটেই না। ড্র্যাকুলার কাহিনীর বীজ রয়েছে স্লাভ জাতির কুসংস্কার, পুরাকাহিনী এবং কিছু-কিছু লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে। স্লাভেরা এখনও বিশ্বাস করে যে, পাপী ও দুর্বৃত্তদের আত্মা পৃথিবীতে ফিরে আসে

টমাস প্রেস্ট ভ্যাম্পায়ার নিয়ে প্রথম উপন্যাস লেখেন উনিশ শতকের মাঝামাঝি। ওই উপন্যাসের ভিত্তিতে তৈরি সিরিয়ালের প্রচ্ছদ

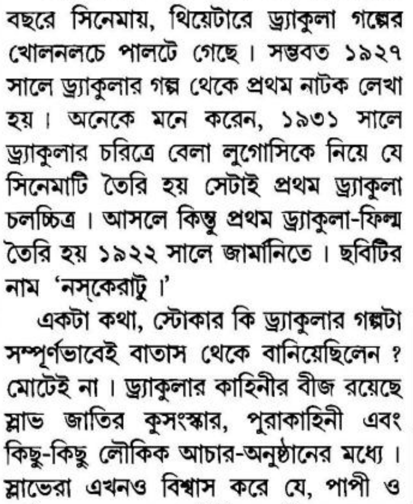

শিল্পীর আঁকা ভলাদ-এর প্রতিকৃতি। ব্রাম স্টোকার এঁকে নিয়েই লিখেছিলেন ড্র্যাকুলার গল্প

ভ্যাম্পায়ারের রূপ ধরে। রাতের অন্ধকারে কফিনের বুক থেকে দুষ্ট আত্মা বাদুড় হয়ে বেরিয়ে এসে মানুষের রক্ত খায় আর ভোরবেলার আলো ফুটতেই আবার ফিরে যায় কফিনের মধ্যে। সাধারণ বাদুড় আর বাদুড়রূপী দুষ্ট আত্মার তফাত বোঝা যাবে কী করে? স্লাভদের বিশ্বাস, ভ্যাম্পায়ারের ছায়া পড়ে না, এমনকী আয়নাতেও না। শুধুমাত্র পবিত্র ক্রুশের ছোঁয়ায় ভ্যাম্পায়ারের ধ্বংস হয়। রাত্রে রসুনের মালা পরে শুলেও নাকি ভ্যাম্পায়ার এসে রক্ত খেতে পারে না। কী করে বোঝা যাবে কোন্ কফিন থেকে জন্ম নিয়েছে রক্তপিপাসু ভ্যাম্পায়ার? যদি কফিনের মধ্যে মৃতদেহে পচন না ধরে, তা হলেই বোঝা যাবে, সেটা ভ্যাম্পায়ারের বাসা। অপবিত্র আত্মা যাতে ভ্যাম্পায়ার হয়ে ফিরে আসতে না পারে, তাই আজও পলিনেশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় কেউ-কেউ সমাধির উপর জ্বালিয়ে রাখেন পবিত্র আগুন। এই পুরনো সংস্কার এবং ধর্মবিশ্বাস থেকে যে ভ্যাম্পায়ার-কাহিনী জন্ম নিয়েছে, সেখান থেকেই স্টোকার তাঁর ড্র্যাকুলা উপন্যাসের মূল ভাবনাটা পেয়েছিলেন।

হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলাম আর বলতে গিয়ে এতদূর কথায়-কথায় চলে এলাম, সেখানেই আবার ফিরে যাওয়া যাক। মনে আছে তো, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে হোটেলের জানলা দিয়ে আমার চোখে পড়ল আকাশের গায়ে লেখা ভয়ঙ্কর দুটো শব্দ, কাস্‌ল ড্র্যাকুলা? ব্যাপারটা কী, ভাল করে বোঝার জন্য জানলার কাছে এগিয়ে গেলাম। দেখতে পেলাম আমার হোটেলের সামনেই একটা মস্ত বড় বাড়িই হল ড্র্যাকুলা কাস্‌ল। বাড়িটা এমনভাবে

তৈরি যে, দেখলেই যেন গা-ছমছম করে ওঠে। বাড়িটা অবশ্য খুবই নতুন আর মোটেই কাস্‌লের মতো দেখতে নয়। ভাবলাম এই বাড়ির রহস্য আমাকে ভেদ করতেই হবে।

পরের দিন সন্ধেবেলা কাস্‌ল ড্র্যাকুলার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি, সেখানে রয়েছে

একটা টিকিট কাউন্টার। টিকিট বিক্রি করছে একটি কমবয়সী মেয়ে। যেমন ভাল দেখতে তেমনি গম্ভীর। মনে হল, মেয়েটির গলায় কার যেন ধারালো দাঁতের দাগ। টিকিট কিনে যেই ভিতরে গেলাম, বাইরের জগতের সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক মুহূর্তে শেষ হয়ে গেল। বরফের মতো ঠাণ্ডা বিশাল ঘর। সেখানে

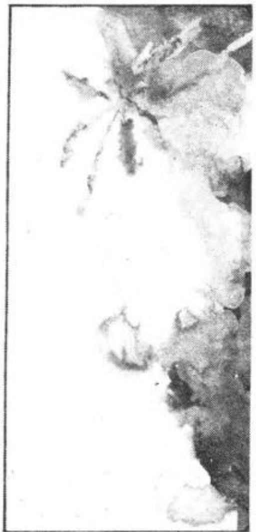

ভয়ঙ্কর ড্র্যাকুলা ! ধারালো দাঁত দিয়ে গলা ফুটো করে রক্ত খায় !! ব্রাম স্টোকারের লেখা সেই ড্র্যাকুলার গল্প নিয়ে হয়েছে নানান চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন-ছবি। ড্র্যাকুলাকে এক একজন এক একভাবে কল্পনা করেছেন। এমনকী এই নেকড়ে-মানুষটিকেও ড্র্যাকুলার মতো গলা ফুটো করে রক্ত খেয়ে তেষ্টা মেটাতে দেখা গিয়েছে।

জ্বলছে লাল আলো। আর সেই ঘরের মাঝখানে আমার দিকে তাকিয়ে কালো পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় আট ফুট লম্বা ক্রাউন্ট ড্রাকুলা ! কালো চুল পিছনের দিকে টানটান করে উলটে আঁচড়ানো। মুখে অল্প হাসি। কিন্তু লাল চোখে যেন রক্তের তেষ্টা। আর মনে হল, ঠোঁটের পাশ দিয়ে

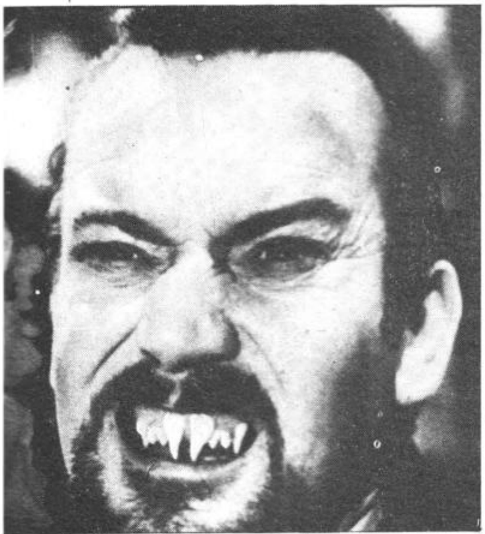

টেম্‌স টেলিভিশনের ড্রাকুলা

উঁকি মারছে দুটো ছুরির ফলার মতো দাঁত।

ক্রমশ বুঝতে পারলাম, কাস্‌ল ড্রাকুলা সত্যিই ড্রাকুলার বাড়ি। কে যেন মন্ত্র পড়ে আমাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। ঘুরে-ঘুরে এই বাড়ির মধ্যে এ-ঘর সে-ঘর করে যতই বেড়াচ্ছি, ততই বুঝতে পারছি নানাভাবে ড্রাকুলা আমায় ঘিরে ফেলছে। কখনও শুনতে পাচ্ছি ড্রাকুলার নিজের কণ্ঠস্বর, কখনও অন্ধকার থেকে কারা যেন ক্রমাগত আউড়ে যাচ্ছে ড্রাকুলার রক্ত খাওয়ার ভয়ঙ্কর নানা কাহিনী। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে এমন সব মানুষের জবানবন্দী টেপ করে আনা হয়েছে, যারা ড্রাকুলাকে নিজের চোখে দেখেছে।

হঠাৎ একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি, আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে একটি সুন্দরী মেয়ে। আমার চোখে চোখ পড়তেই সে অল্প একটু হাসল। আর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঝিলিক মারল একজোড়া দাঁত। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, আর বেরিয়ে এসেই যা দেখলাম, তাতে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। ঠিক আমার সামনে একটা লোক পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে অল্প একটু ঝুঁকে পড়ে একটি মেয়ের গলা কামড়ে শুষে নিচ্ছে রক্ত। মেয়েটির মুখে কিন্তু যন্ত্রণার চিহ্ন নেই। বুঝলাম, এই মেয়েটা আস্তে-আস্তে ভয়ঙ্কর ভ্যাম্পায়ারে পরিণত হবে। তখনও সমস্ত বাড়িটা আমার ঘুরে দেখা বাকি। কিন্তু বিশ্বাস করো, আর সাহসে হল না। আমি তাড়াতাড়ি চম্পট দিলাম। রাস্তায় বেরিয়ে আসার মুখে নজর পড়ল সেই টিকিট কাউন্টারের দিকে। মেয়েটি এবার হাসল। স্পষ্ট দেখলাম, তার ঠোঁটের পাশে লম্বা ছুঁচলো দুটো দাঁত !

এই ঘটনার অনেকদিন পরে আবার ড্রাকুলার সঙ্গে আমার দেখা হল কলকাতার বিদ্যামন্দির-এর মঞ্চে। ড্রাকুলার এই কলকাতা ভ্রমণ দি এসেক্স রেপার্টোরি থিয়েটার কোম্পানির সৌজন্যে। বুঝতেই পারছ, জলজ্যান্ত ড্রাকুলাকে নিয়ে নাটক। নাটকটির নাম ছিল ড্রাকুলা স্পেক্ট্যাকুলা। ড্রাকুলার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন জিম কেটার। নাটকে স্টোকারের গল্পের কিছুই প্রায় অবশিষ্ট ছিল না। ড্রাকুলা একটু-আধটু রক্ত খেয়ে আর সন্তুষ্ট নয়। সে এখন তার কাস্‌লের মধ্যেই বানিয়ে ফেলেছে একটা দুর্দান্ত রক্তের ফ্যাক্টরি। সেখানে গ্যালন-গ্যালন রক্ত তৈরি হচ্ছে। আর সেই রক্ত খেয়ে নেচে-গেয়ে বেশ আনন্দে আছে ড্রাকুলা আর তার ছয় স্ত্রী। কোনও স্ত্রী আবার হিপি, কোনওটি পাঙ্ক, কোনওটি স্কিনহেড।

কিন্তু এই ড্রাকুলা থিয়েটারের নতুনত্বটা আসলে অন্য জায়গায়। শেষ পর্যন্ত ড্রাকুলা কাকে কামড় দিয়ে রক্ত চুষে নেবার জন্যে বেছে নিল জানো ? সেই যে বিখ্যাত অভিনেত্রী মেরিলিন মনরো, যিনি পরে আত্মহত্যা করেছিলেন, তাঁকে। মনরোর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অ্যালিস্‌ন হার্ডিং। সত্যিই তাঁকে দেখতে মনরোরই মতো। নাটকের একটা দৃশ্যে ড্রাকুলা মন্ত্র পড়ে মনরোকে শুইয়ে দিল তার তিন স্ত্রীর পিঠের ওপর। আর অন্য তিন স্ত্রীকে নিয়ে সে মনরোর গলায় ফুটিয়ে দিল দাঁত। অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা ঘটছে একেবারে শেষে। ড্রাকুলার কামড় খেয়ে মনরো নিজেই হয়ে উঠছে ভয়ঙ্কর ভ্যাম্পায়ার। তার ঠোঁটের তলা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসছে লম্বা দুটো দাঁত।

নাটক দেখে সেই রাত্রে ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরে ট্যাক্সিওয়ালাকে পয়সা মিটিয়ে দেওয়া মাত্র সে অল্প একটু হাসল। আর আমার চোখে পড়ল রক্ত-হিম-করা এক দৃশ্য। ট্যাক্সি ড্রাইভারেরও ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে একজোড়া ভয়ঙ্কর দাঁত। সেটাই আপাতত ড্রাকুলার সঙ্গে আমার শেষ মুলাকাত !

আপনার বাচ্চাকে দিন সেরেল্যাকের অনন্য লাভ

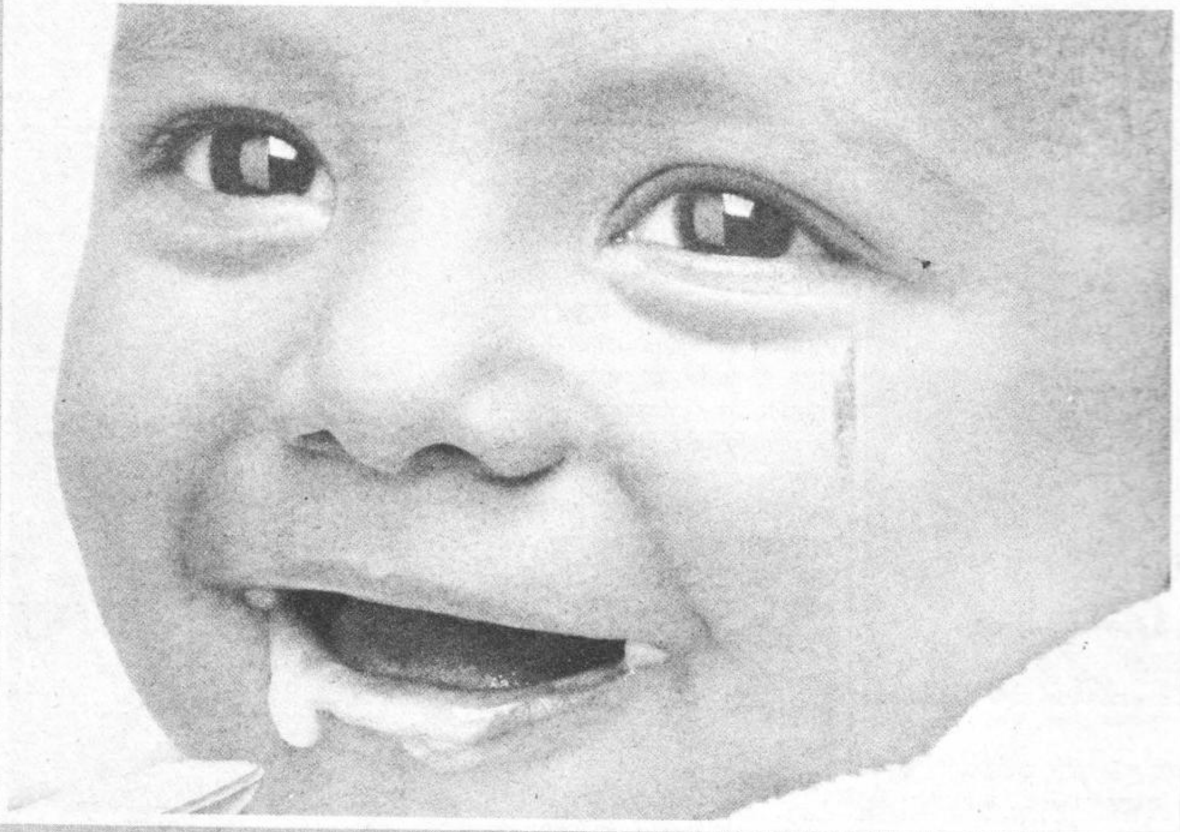

শক্ত আহারের আদর্শ শুরু

আপনার বাচ্চা ৪-মাসে পড়লেই দুধের সঙ্গে ওর দরকার শক্ত আহারের। তখন থেকেই ওকে দিতে শুরু করুন সেরেল্যাকের অনন্য লাভ।

সম্পূর্ণ পুষ্টির লাভ : সেরেল্যাকের প্রতি আহারে আছে আপনার বাচ্চার জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম পুষ্টি উপাদান — প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটস্, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ। আপনার বাচ্চার বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এইসব উপাদান, সঠিক মাত্রায় সুষম ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে।

চমৎকার স্বাদের লাভ : সেরেল্যাক শুধু পুষ্টিকরই নয়, চমৎকার স্বাদেও ভরপুর। সেরেল্যাকের স্বাদ তাই বাচ্চাদের দারুন মুখরোচক।

সময় বাঁচার লাভ : সেরেল্যাক এক তৈরী আহার। দুধ ও চিনি তাতে দেওয়াই থাকে, শুধু ফোটানো ঈষৎ উষ্ণ জল মিশিয়ে নিলেই হলো—চট্‌পট্ খাবার তৈরী।

আপনার বাচ্চার সুষম পুষ্টির জন্য সেরেল্যাক আহার স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে তৈরী করতে টিনের গায়ে লেখা নির্দেশাবলী দয়া ক'রে সঠিক্ ভাবে মেনে চলুন।

বিনামূল্যে সেরেল্যাক পুস্তিকার জন্য
এই ঠিকানায় লিখুন : সেরেল্যাক
পোস্টবক্স নং-৩
নিউদিল্লী-১১০০০৮

SAA/FSL/C/3799 (RI) BEN

Nestlé

সেরেল্যাকের যত্ন : পুষ্টিতে সম্পূর্ণ – স্বাদে অনন্য

সত্যিই ছিল ড্র্যাকুলা

নিল ও'ব্রায়েন

বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ই· এম· ফর্স্টার একবার বলেছিলেন, 'আমরা লেখকরা কায়দা করে এটাই বোঝাতে চাই যে, আমরা বাস্তবে যা দেখি শুধু তা-ই লিখি না। কিন্তু আমি বলব একজন লেখক সেটাই লেখেন।' সাহিত্যের বেশ কিছু নাম-করা চরিত্র এবং গল্প কিন্তু বাস্তব ঘটনার ওপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবং এটা খুবই মজার যে, রক্ত-মাংসের মানুষই আমাদের অবাক করে সাহিত্যে স্থান করে নেয়।

'মুখ স্থির, একটুও কাঁপছে না ঠোঁট, তার ভেতর থেকে বেরিয়ে রয়েছে তীক্ষ্ণ, অদ্ভুত কয়েকটা দাঁত।' এই বর্ণনা থেকে আমরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারি, কার কথা বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, ড্র্যাকুলা— যাকে নিয়ে গত পঞ্চাশ বছর ধরে তৈরি হচ্ছে ভয়ের অসংখ্য চলচ্চিত্র বা 'হরর ফিল্ম'। আট থেকে আশি যে কোনও বয়সের লোকই এই সব ছবি দেখে ভয় পেতে ভালবাসেন।

ড্র্যাকুলা নামে সত্যিই কি কেউ ছিল? ছিল। ইতিহাস এই সত্য সমর্থন করে। কিন্তু আমরা গল্পে যতটা ভয়াবহ চরিত্র হিসেবে ড্র্যাকুলাকে দেখি, তার চেয়েও নাকি ভয়ঙ্কর ছিল আসল ড্র্যাকুলা। তবে সে ভ্যাম্পায়ার ছিল না কখনও।

পূর্ব ইউরোপের লোক-গল্পের নায়ক হলেন ভ্লাদ টেপেস। তিনি আনুমানিক ১৪৩২ সালে ট্রান্সিলভেনিয়ায় জন্মেছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন ওয়াল্লাচিয়ার শাসক এবং রাজকুমার। ওই জায়গাটি এখনকার রুমানিয়ার ভেতর চলে এসেছে। প্রবল সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে তুর্কিদের বাধা দেওয়ার জন্য তাঁকে ড্রাগন উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই ড্রাগনকেই রোমানিয়ান ভাষায় বলে 'ড্রাকুল'।

এরপর ভ্লাদ টেপেসের বাবা শত্রুদের

হাতে নিহত হন। তরুণ ভ্লাদ তার প্রতিশোধ নেন এবং সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তুর্কিদের সঙ্গে তাঁর খারাপ সম্পর্ক চলতেই থাকে। ভ্লাদ নিপুণ কৌশলে শুরু করেন গেরিলা যুদ্ধ, যার ফলে শত্রুপক্ষ পিছু হটতে বাধ্য হয়। ভ্লাদের সৈন্যেরা কমপক্ষে ২০ হাজার তুর্কিকে হত্যা করে এই যুদ্ধে।

ভ্লাদ যখন শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন ওয়াল্লাচিয়ায় আইনের শাসন বলে কিছুই ছিল না। ভ্লাদ আইন-ভঙ্গকারীদের কঠোরভাবে শাস্তি দিতে শুরু করলেন। শূলে চড়ানোর যে পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেছিলেন, তা ছিল খুবই অদ্ভুত। মাটি থেকে উঠে-আসা, তীক্ষ্ণ

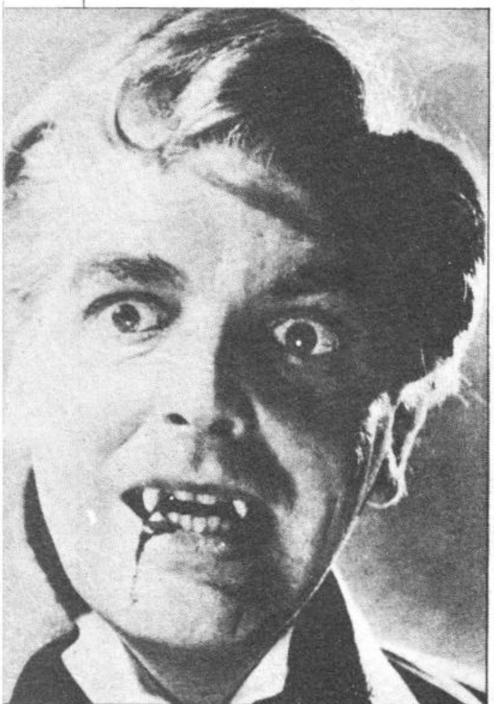

আসল ড্রাকুলা কিন্তু ভাল মানুষই ছিলেন

মুখ কাঠের শলাকার ওপর আসামিকে ছুঁড়ে দেওয়া হত এবং এ ভাবেই এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যেত তার শরীর। এর জন্যই আড়ালে তাঁকে, 'যমদূত' নামে ডাকা হত, রুমানিয়ান ভাষায় যা হল 'ভ্লাদ টেপেস'। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, তাঁর শাসন কালে দেশে আইন-শৃঙ্খলা ফিরে এসেছিল বেশ ভালভাবেই।

কিন্তু ভ্লাদ তাঁর প্রতিবেশী জার্মানভাষী স্যাক্সনদের সঙ্গে এ-সময় জড়িয়ে পড়েন। স্যাক্সনরা তাঁকে অসুবিধেয় ফেলার জন্য তাঁর লোকজনদের আটকে রাখে। এবং যখন কোনওভাবেই তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসা সম্ভব হল না, তখন ওই ভয়ঙ্কর পদ্ধতিতে অসংখ্য স্যাক্সনকে হত্যা করা হয়। সারা ইউরোপে বিশেষ করে জার্মানভাষীদের মধ্যে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে এক অত্যাচারী দৈত্য হিসেবে। শত্রুপক্ষের অতর্কিত হামলায় তিনি নিহত হন। ঘটনাটি ঘটে আনুমানিক ১৪৭৬ সালে।

বুখারেস্টের কাছে স্নাগভ-এ যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। কিন্তু ১৯৩০ সাল নাগাদ তাঁর কবর খুঁড়ে দেখা গেল, তাঁর কফিন ফাঁকা। হয়তো এ-কাজও তাঁর শত্রুদেরই।

পিতার প্রতি শ্রদ্ধাচিহ্ন হিসেবে ভ্লাদ সব-সময় সই করতেন 'ড্রাকিলা' বা 'ড্রাগলিয়া' নামে। এইসব নাম থেকেই 'ড্র্যাকুলা' নামটি ক্রমশই বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

এই যদি আসল পরিচয় হয়, তবে রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার-এর কথা কী করে চালু হল? বস্তুত ওই স্যাক্সনরাই ওঁকে এক দৈত্য হিসেবে বর্ণনা করেছে, যে অন্যের ওপর অত্যাচার করে এবং অন্যের রক্তপান করে আনন্দ পায়। ভ্লাদকে নিয়ে লেখা অসংখ্য 'হরর-কমিক্স' সারা পূর্ব ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর এই ভয়ঙ্কর দিকটা আসলে বানিয়ে-তোলা আতঙ্ক-কাহিনী। কিন্তু ওই বর্বর মধ্যযুগে তাঁর চেয়েও অনেক নিষ্ঠুর লোক ছিল।

কয়েকশো বছর পর এক আইরিশ ঔপন্যাসিক ভ্যাম্পায়ার নিয়ে পূর্ব ইউরোপের পটভূমিকায় একটি উপন্যাস লিখবেন বলে খুঁজতে খুঁজতে ভ্লাদ টেপেসের কথা জানতে পারেন। ভ্লাদকে নিয়ে লেখা তাঁর রোমহর্ষক বই ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থায়ীভাবে এই কিংবদন্তীর জন্ম দেয়।

কয়েকজন ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন যে, ড্র্যাকুলা মানে হল 'শয়তানের পুত্র' এবং তাঁরা এটাও প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আসল ড্র্যাকুলা গল্পের ড্র্যাকুলার মতোই ভয়ঙ্কর ছিল। হতে পারে। কিন্তু আজও রুমানিয়ার গ্রামে গ্রামে তাঁকে স্মরণ করা হয় একজন বীর হিসেবে। সেই বীর যিনি তাঁর লোকজনদের রক্ষা করেছিলেন, যিনি খ্রিস্টধর্মের করেছিলেন জয়গান। এমনকী অনেক গ্রাম তাঁর নামেই চিহ্নিত হয়েছে।

কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশ ড্র্যাকুলাকে ভ্যাম্পায়ার হিসেবেই জানে। অশুভ আত্মার বারবার মৃত্যু হয়েছে আমরা জানি। কিন্তু ড্র্যাকুলা যতদিন আমাদের স্নায়ুকে আতঙ্কিত করবে, মাথার চুল খাড়া দাঁড় করিয়ে দেবে, ততদিন তাকে নাটকে, মঞ্চে, টেলিভিশনে, সিনেমায়, কমিক্‌সে, গল্পে বারবার ছড়িয়ে পড়তে দেখা যাবে।

১ কুকুর কোনও কিছু খাবার সময়ে মুখ তোলে না কেন?

২ জীবদেহের কার্যগত ও গঠনগত একক যে কোষ তার শক্তিঘর কাকে বলে?

৩ জেনেটিক্স বা জিন-তত্ত্বের জনক কে?

৪ আমাদের রক্তের রঙ লাল কেন?

৫ মানুষ-ছাড়া দু'পায়ে কারা হাঁটাচলা করে?

৬ মস্তিষ্ক-বাক্স কাকে বলে?

৭ এই দলে কোন্‌টি বেমানান—রুই, কাতলা, তিমি, হাঙর আর পুঁটি

৮ মাছের দেহের দু'পাশে প্রায় কানকো থেকে লেজের পাখনা পর্যন্ত যে পার্শ্বরেখা থাকে তার কী প্রয়োজন?

৯ খুব গরমে কুকুর কেন তার জিভ বার করে হাঁপায়?

১০ কোন প্রাণীরা তাদের জীবনের অর্ধেক জলে আর অর্ধেক ডাঙায় কাটায়?

উত্তর

(১) কুকুরের মুখের গঠন এমনই যে তার কোনও গাল নেই তাই মুখে খাবার নিয়ে মাথা তুললেই তা পড়ে যায়। (২) মাইটোকনড্রিয়াকে। (৩) গ্রেগর মেণ্ডেল। (৪) হিমোগ্লোবিন নামের এক পদার্থের জন্য। (৫) মানুষ বনমানুষ ছাড়া পাখিরাও দুপায়ে হেঁটেচলে বেড়ায়। (৬) করোটি। (৭) তিমি ছাড়া বাকিরা সকলেই মাছ শ্রেণীর। (৮) ওই রেখা মাছের ভারসাম্য রক্ষা করে। (৯) জিভ বার করে প্রচুর লালা নিঃসরণ করে তারা তাদের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, ঠিক যে কারণে আমরা ঘামি। (১০) ব্যাঙের মতন উভচর শ্রেণীর প্রাণীরা।

সুব্রত ঘোষ

অন্ধকারের ভয়ংকর
পালাও !
ওরে ডরিস, আবার ইঁদুর !
সত্যি মা, আর পারা যায় না !
ইঁদুরের জ্বালায় এখানে আর তিষ্ঠোনো যাচ্ছে না !
অথচ শান্তিতে থাকবেন বলে তোর বাবা এই গাঁয়ের বাড়িতে এসেছেন !
সুতরাং…
দ্যাখো, এখানে থাকা অসম্ভব ! একটা-কিছু ব্যবস্থা করো !
আরে, দু-চারটে ইঁদুর তো থাকতেই পারে ! তাই নিয়ে অত উতলা হলে চলে ?
ইঁদুরের জ্বালায় রাত্তিরেও একটু ঘুমোবার জো নেই !
ঠিক আছে, ঠিক আছে, দেখি, কেউ কোনও বিহিত করতে পারে কি না !
অতঃপর…
গাঁয়ের পুরনো বাড়ি, ওখানে ইঁদুরের উৎপাত তো হবেই !

এমন একটা লোক আছে, যে ইঁদুর তাড়াতে পারবে…

বাড়ির মধ্যে অন্ধকার, আর অন্ধকারের মধ্যে…

লোকটা জানাল, কী তার পরিচয়, কী তার নাম !

নীলমূর্তি রহস্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : সন্তু তার কলেজের দুই বন্ধু জোজো আর অরিন্দমের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল বারুইপুর। সেখানে জোজোর পিসেমশাই অংশুমান চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ। তিনি একজন বৈজ্ঞানিক। ওই অংশুমান চৌধুরী কাকাবাবুকে চেনেন অনেক দিন ধরে, কিন্তু কাকাবাবুর ওপর তাঁর খুব রাগ। এরপর একদিন কয়েকজন লোক কাকাবাবুর নাম করে সন্তুকে ডেকে নিয়ে গেল বাড়ি থেকে। তারপর কাকাবাবুর খোঁজ করতে সে হাওড়ায় এসে উঠে পড়ল একটা ট্রেনে, সেখানে কাকাবাবুর বদলে হঠাৎ পেয়ে গেল জোজোকে। ওদিকে অংশুমান চৌধুরীও কাকাবাবুকে জোর করে নিয়ে এসেছেন অন্য একটা ট্রেনে। কাকাবাবুর সঙ্গে তিনি একটা প্রতিযোগিতায় নামতে চান। তারপর....

স্টেশন ওয়াগনটা কোন্ডাগাঁওতে যখন পৌঁছল তখন রাত প্রায় এগারোটা। চারদিক একেবারে নিঝুম, রাস্তায় আর কোনও গাড়ির শব্দ পর্যন্ত নেই। কোনও দিকে একবিন্দু আলোও দেখা যায় না।

গাড়ি চালাচ্ছে মাধব রাও নিজেই। কাকাবাবু বসে আছেন তার পাশেই। গাড়ির মধ্যে রয়েছেন অংশুমান চৌধুরী আর তাঁর সহকারী ভিমু। তাঁদের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

গাড়ি থামিয়ে মাধব রাও বললেন, "ব্যাস, এই পর্যন্ত! সারাদিন গাড়ি চালিয়ে আমি একেবারে থকে গেছি। আজ রাতের মতন এখানেই রেস্ট নিতে হবে।"

অংশু চৌধুরী ঘুমোচ্ছিলেন। গাড়ি থামতেই তিনি জেগে উঠে বললেন, "পৌঁছে গেছি? কোথায় এলাম? এ-জায়গাটার নাম কী?"

মাধব রাও বললেন, "এই তো আপনার কোন্ডাগাঁও। দেখুন, মাইলপোস্টে নাম লেখা আছে। এবারে কী করবেন?"

অংশু চৌধুরী জানলা দিয়ে টর্চ ফেলে রাস্তাটা দেখলেন। তারপর বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবারে ডান দিকের রাস্তাটায় চলুন। এক মাইলের মধ্যে একটা সাদা বাড়ি দেখতে পাবেন, সেখানেই থামবেন। ভিমু, তৈরি হয়ে নে!"

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল এবং খানিক বাদে একটা বড় সাদা বাড়িও পাওয়া গেল। সেটা একটা পি· ডব্লু· ডি'র বাংলো। গেট খোলা। গাড়ির আওয়াজ শুনেই গেটের বাইরে একটি লোক এসে দাঁড়াল।

ভিমু আগে গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞেস করল, "সব ঠিক আছে?"

লোকটি বাংলাতেই বলল, "হ্যাঁ স্যার। সব ঠিক আছে। এখানে কুকুর-বেড়াল কিছু নেই। রান্না-টান্নাও সব করে রেখেছি।"

কাকাবাবু এক দৃষ্টিতে সামনের অন্ধকার দেখছিলেন চুপ করে। আকাশে অল্প-অল্প মেঘ। অনেক দূরে মাদলের শব্দ হচ্ছে, ডুং-ডুং, ডুং-ডুং।

মাধব রাও বললেন, "এবারে নামুন মিঃ রায়চৌধুরী।"

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে নামলেন। ডাকবাংলোর গেটের কাছে এসে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু এখানে আছে?"

অংশু চৌধুরী বললেন, "হ্যাঁ। আপনার ভাইপো আর আমাদের জোজো এখানেই আছে। কোনও চিন্তা নেই।"

কাকাবাবু চেঁচিয়ে ডাকলেন, "সন্তু, সন্তু?"

কোনও উত্তর এল না। ডাকবাংলোর লোকটি বলল, "ছেলে দুটি তো চলে গেছে, স্যার!"

অংশু চৌধুরী অবাক হয়ে বললেন, "চলে গেছে? তার মানে? কোথায় চলে গেছে?"

লোকটি বলল, "আজ সন্ধেবেলাতেই চলে গেল। ওরা বলল যে, এই জায়গা ভাল লাগছে না। তাই বোধহয় নারানপুরের দিকে গেল!"

"সঙ্গে কে ছিল?"

"সঙ্গে আর-একজন লোক ছিল, নাম ঠিক জানি না।"

কাকাবাবু অংশু চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি সন্তুর কথা বলে আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছেন। এখানেও সন্তুর দেখা পাওয়া গেল না। এর পরেও কি আপনাকে আমি বিশ্বাস করব?"

অংশু চৌধুরী বললেন, "এখানেই থাকার কথা ছিল। সন্ধেবেলা ওরা দু'জনে কেন চলে গেল তা আমি জানি না। আপনাকে আমি মিথ্যে কথা বলব কেন? নারানপুর এখান থেকে বেশি দূরে নয়, কাল সকালেই খোঁজ করা যাবে।"

"আপনি যে সত্যি কথা বলছেন তার প্রমাণ কী?"

"প্রমাণ, মানে, তারা তো ছিলই এখানে। এই, ইয়ে, ছেলে দুটি ডাকবাংলোর খাতায় নাম-টাম লেখেনি?"

ডাকবাংলোর লোকটি বলল, "হ্যাঁ স্যার, লিখেছে। ওদের সঙ্গের লোকটি সব চার্জ মিটিয়ে দিয়ে গেছে।"

অংশু চৌধুরী বললেন, "কই, খাতাটা দেখাও এঁকে।"

সবাই ঢুকে এল ডাকবাংলোর মধ্যে। কাকাবাবু খাতাটা দেখলেন। সন্তু নিজের নাম লিখেছে। সুনন্দ রায়চৌধুরী। হাতের লেখাটা যে সন্তুরই, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কাকাবাবু বললেন, "আপনাদের চালাকিটা বোঝা এমন কিছু শক্ত নয়। আপনারা সন্তুকে বলছেন, আমি এক জায়গায় আছি। সেই শুনে সন্তু সেখানে যাচ্ছে। আবার আমাকে বলছেন, সন্তু অমুক জায়গায় আছে। আমিও তাই শুনে সেখানে যেতে রাজি হচ্ছি। সন্তুকে এখান থেকে সরানো হল কেন, আমি জানতে চাই।"

অংশু চৌধুরী হাসতে হাসতে বললেন, "আরে মশাই, আপনি আমাকে ধমকাচ্ছেন কেন? আপনার ভাইপো যদি নিজের ইচ্ছেয় অন্য জায়গায় চলে যায়, তা হলে আমি কী করব?"

কাকাবাবু এর উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, মাধব রাও হাত তুলে বললেন, "আগে একটা কথা বলতে দিন। আমি খুব টায়ার্ড। এই বাংলোতে আমার থাকার ইচ্ছে নেই। আমি আজ রাতেই জগদলপুরে

চলে যাব। তার আগে আমার বন্ধু অনন্ত পটনায়কের পক্ষ থেকে আমি একটা ফাইনাল কথা বলে নিতে চাই।”

ডাকবাংলোর লোকটির দিকে ফিরে তিনি বললেন, “আপনি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াবেন, প্লিজ। আমি এঁদের দু'জনের সঙ্গে প্রাইভেটলি কথা বলতে চাই।”

লোকটি বাইরে চলে যেতেই মাধব রাও দরজা বন্ধ করে দিলেন। চুরুট ধরিয়ে বললেন, “মিঃ রাজা রায়চৌধুরী, এবারে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, আপনাকে কিংবা আপনার নেফিউকে কলকাতা থেকে নিয়ে আসার ব্যাপারে আমাদের কোনও দোষ দিতে পারবেন না। এসব ব্যবস্থা করেছেন মিঃ অংশু চৌধুরী। সে আপনি ওঁর সঙ্গে বুঝে নেবেন। আমরা কেউ আর এর মধ্যে থাকতে চাই না। আমরা শুধু আমাদের চুরি যাওয়া মূর্তিটা সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড।”

কাকাবাবু বললেন, “আপনাদের মূর্তি সম্পর্কে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই।”

মাধব রাও বললেন, “আমার কথাটা শেষ করতে দিন। এরপর থেকে আমরা আর আপনাদের কাছে থাকব না। আমি জগদলপুরে দিনদশেক থাকব। এর মধ্যে আপনাদের একজন যদি মূর্তিটা উদ্ধার করে আনতে পারেন, তা হলে আমরা তিন লক্ষ টাকা দেব। সব খরচ-খরচা আপনাদের। আর যদি দু'জনে একসঙ্গে উদ্ধার করে আনেন, তা হলে টাকাটা দু'জনের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে।”

কাকাবাবু দারুণ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, “আমি কতবার বলব যে, আপনাদের ওই মূর্তি-টুর্তির ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ নেই?”

মাধব রাও বললেন, “মিঃ রায়চৌধুরী, আমি শেষবার অনুরোধ করছি, আপনি আমার সঙ্গে এরকম ধমক দিয়ে কথা বলবেন না। আপনি কাজ করতে চান তো ইউ মে গো টু হেল! আপনার যা খুশি করুন। আমাদের অফার আমি জানিয়ে দিয়েছি, এখন আমি চলে যাচ্ছি!”

কাকাবাবু মাধব রাও-এর হাত চেপে ধরে বললেন, “না, এখন আপনার যাওয়া চলবে না। আপনি আমাকে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। এখন আপনি আমাকে নারানপুরে নিয়ে চলুন। আমি আজ রাতেই সন্তুর খোঁজ করতে চাই।”

মাধব রাও এক ঝটকায় নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। অন্য হাতটা কোটের পকেটে ঢুকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, “আমার ওপর গায়ের জোর ফলাবার চেষ্টা করবেন না। তার ফল ভাল হবে না। আপনাকে আমি নারানপুরে নিয়ে যেতে বাধ্য কেন হব? আমি কি আপনার হুকুমের চাকর?”

কাকাবাবু কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন মাধব রাও-এর দিকে।

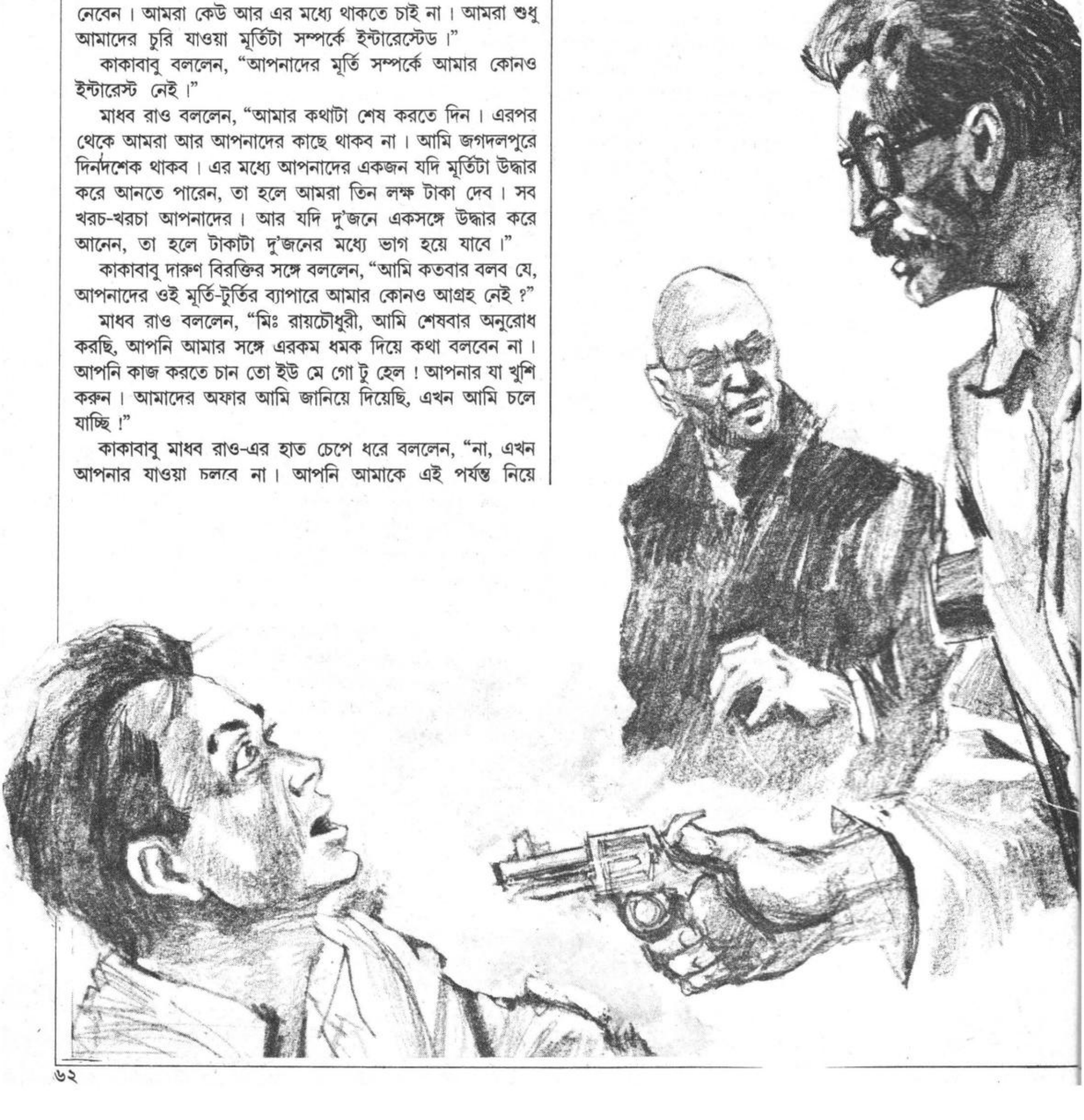

তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "না, আপনি আমার হুকুমের চাকর নন। আমি আপনার সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলেছি বলে দুঃখিত। আমার মেজাজ ঠিক নেই। আমাকে আর আমার ভাইপোকে আপনারা কেন অকারণ ঝঞ্ঝাটে জড়াচ্ছেন?"

অংশু চৌধুরী কাষ্ঠ হাসি দিয়ে বললেন, "কী রাজা রায়চৌধুরী, মাধব রাওকে পকেটে হাত ঢোকাতে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন নাকি? আপনাকে তো সবাই খুব বীরপুরুষ বলে জানে?"

কাকাবাবু বললেন, "শ্রীকৃষ্ণ কখন শিশুপালকে বধ করেছিল জানেন? শিশুপালের একশোটা অপরাধ ক্ষমা করবার পর। আপনার অপরাধও কিন্তু প্রায় একশোটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।"

অংশু চৌধুরী বললেন, "নিজে ভয় পেয়ে উলটে আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? এবারে আমার গায়ে একটু হাত ছোঁয়ালে কিন্তু আমি আপনার অন্য পা'টা আস্ত রাখব না। আমি যা বলছি, মন দিয়ে শুনুন। আমার যথেষ্ট টাকা আছে, আমার আর টাকা-পয়সার প্রয়োজন নেই। ওদের ওই তিন লাখ টাকা পুরস্কারের লোভে আমি এ-কাজে নামিনি। আপনার সঙ্গে আমার একটা প্রাইভেট চ্যালেঞ্জ আছে। আপনি মূর্তিটা উদ্ধার করে আনতে পারলে ওই তিন লক্ষ টাকা আপনিই পাবেন, আমি ভাগ বসাতে যাব না। আর আপনার আগেই আমি যদি মূর্তিটা সরিয়ে আনতে পারি, তা হলে সবার সামনে আপনাকে মাথার চুল আর ওই গোঁফ কামিয়ে ফেলতে হবে। এবারে আপনাকে আমি ন্যাড়া করবই।"

কাকাবাবু এখনও মাধব রাও-এর হাত ছাড়েননি। অংশু চৌধুরীর দিকে তিনি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন। মাধব রাও-এর চোখ থেকে তিনি চোখ সরাননি। তার ঠোঁটে পাতলা হাসি ফুটে উঠল। তিনি খুব মৃদু স্বরে বললেন, "এক্সকিউজ মি!"

তারপরই তিনি বিদ্যুৎ-গতিতে মাধব রাও-এর হাত ধরে জোরে একটা টান দিলেন। সেই টানে অতবড় চেহারাটা নিয়েও মাধব রাও উঠে গেলেন শূন্যে, তারপর হুড়মুড়িয়ে পড়লেন অংশু চৌধুরীর ঘাড়ে। আচমকা আঘাত পেয়ে অংশু চৌধুরী যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন।

বিশেষ ব্যস্ততা না দেখিয়ে কাকাবাবু মাধব রাও-এর কোটের পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে নিলেন। অংশু চৌধুরীর হাতের লাঠিটা ঠেলে দিলেন দূরে। তারপর মাধব রাও-এর দিকে আবার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "উঠুন। আশা করি আপনার বেশি লাগেনি।। আমি দুঃখিত।"

মাধব রাও-এর চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। যেন এখনও তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, এইমাত্র যে-কাণ্ডটা ঘটে গেল, সেটা ম্যাজিক না অন্য কিছু।

অংশু চৌধুরী উপুড় হয়ে পড়ে যন্ত্রণায় উঁউঁ করছেন। কাকাবাবু মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে বললেন, "এনাফ অফ দিস মাঙ্কি বিজনেস। মাধব রাও, আপনি দেখুন, ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে গেছেন কি না। ওঁর দিকে তাকাতে আমার ইচ্ছে করছে না, কিছুতেই আমি রাগ সামলাতে পারছি না। ওঁকে টেনে তুলুন।"

কাকাবাবু মাধব রাও-এর রিভলভারটা খুলে দেখলেন গুলি ভরা আছে কি না। সেফটি ক্যাচটা তিনি লক করলেন। তারপর তিনি বললেন, "হয়তো আপনারা জানেন না, তাই জানিয়ে রাখছি যে, আমার হাতের ছ'টা গুলির একটাও ফশকায় না। আমার একটা পা খোঁড়া তাই আমার দুটো হাতে চারজন মানুষের শক্তি। আর মাথাটাও, লোকে বলে, বেশ ধারালো। এরপর থেকে আর কোনও রকম চালাকি আমি সহ্য করব না। উঠে বসুন, আমরা এক্ষুনি নারানপুর যাব। সেখানে সন্তুকে পেয়ে গেলে কালই আমি বাড়ি ফিরব। আপনাদের মূর্তি গোল্লায় যাক, আমার তাতে কিছু আসে যায় না।"

অংশু চৌধুরী দেওয়ালে ভর দিয়ে উঠেছেন। কাকাবাবু বললেন, "দেরি করছেন কেন, উঠুন!"

প্রায় ভয়ে কাঁপতে কাঁপতেই উঠে দাঁড়ালেন অংশ চৌধুরী। কাকাবাবু তাঁর জামার পকেট থাবড়ে দেখলেন আর কোনও অস্ত্র আছে কি না। তারপর রিভলভারের নলের এক খোঁচা দিয়ে বললেন, "নারানপুরে গিয়েও যদি সন্তুকে দেখতে না পাই, তা হলে আপনার ভগবানও আপনাকে বাঁচাতে পারবে না।"

ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরোবার পর ডাকবাংলোর লোকটি বলল, "স্যার, খাবার গরম করব?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার বাংলোতে কুকুর নেই কেন? কুকুর পোষা ভাল। রাত্তিরবেলা খাবারদাবার বেঁচে গেলে কুকুরগুলো খেতে পারে। আমাদের এখন খাওয়ার সময় নেই।"

রাত্রির অন্ধকারে স্টেশন ওয়াগনটা ছুটে চলল আবার। (ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

গ্রিক দোভাষীর বিপদ

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে: এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় শার্লক হোমস এবং ওয়াটসনের মধ্যে কথা হচ্ছিল। তিনি সেদিন তাঁর বড় ভাই মাইক্রফটের কথা বললেন, ডাইয়োজিনেস ক্লাবে গিয়ে ওয়াটসনের সঙ্গে আলাপও করিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে মিঃ মেলাস নামে এক দোভাষীকে ডাকলেন। মেলাস তাঁর সমস্যার কথা বলতে শুরু করলেন। ল্যাটিমার নামে একজন লোক তাঁকে দোভাষীর কাজ করবার জন্য নিয়ে যান। সেখানে ক্রাটিদেস নামে এক গ্রিক ভদ্রলোককে আনা হয়। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মেলাসকে তাঁর পারিশ্রমিক দিয়ে গাড়ি করে একটা জায়গায় নামিয়ে দিলেন হ্যারল্ড। সেখানে যেসব বিচিত্র ঘটনা চোখে দেখেছেন, সব বলে মেলাস চুপ করলেন। তারপর শার্লক হোমস এবং মাইক্রফট এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে করতে সমাধান-সূত্র খুঁজে পেলেন। তারপর···

মাইক্রফট চিঠিটা মুড়ে রেখে বললেন, "চিঠিটা লেখা হয়েছে লোয়ার ব্রিক্সটন থেকে। শার্লক, এখন যদি আমরা ওর সঙ্গে দেখা করতে যাই তা হলে কি কোনও খবরটবর পাওয়া যাবে বলে মনে করো?"

"দ্যাখো মাইক্রফট, বোনের দুঃখের কথা শোনার চাইতে ওর ভাইয়ের জীবনের দাম অনেক বেশি। আমার মনে হয়, আমাদের এক্ষুনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর গ্রেগ্‌সনের সঙ্গে যোগাযোগ করে সোজা বেকেনহ্যাম যাওয়া উচিত। এ-কথাটা ভুলে যাচ্ছ কেন যে, একজনকে তিলে-তিলে মেরে ফেলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখন প্রতিটি মুহূর্তই আমাদের কাছে দামি।"

আমি বললুম, "তা হলে তো মিঃ মেলাসকে আমাদের সঙ্গে নেওয়া উচিত। আমাদের তো একজন দোভাষীর সাহায্য লাগবে।"

"ঠিক বলেছ," শার্লক হোম্‌স বললে, "ওয়াটসন, একটা গাড়ি ডাকতে বলে দাও। আমরা এক্ষুনি বেরোব।"

আমি লক্ষ করলুম যে, কথা বলতে বলতে হোম্‌স টেবিলের প্রথম ড্রয়ার খুলে রিভলভার বের করে পকেটে পুরে নিলে। আমি ব্যাপারটা দেখেছি দেখে হোম্‌স বললে, "এটা সঙ্গে থাকা দরকার। যা শুনছি তাতে লোকগুলো অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক প্রকৃতির।"

আমরা যখন প্যালম্যালে মিঃ মেলাসের ঘরে গিয়ে পৌঁছলুম তখন সন্ধে পেরিয়ে গেছে। একজন ভদ্রলোক তাঁর কাছে এসেছিলেন। তিনি বেরিয়ে গেছেন।

মাইক্রফট হোম্‌স বললেন, "কোথায় গেছেন বলতে পারেন?"

যে মহিলাটি দরজা খুলে দিয়েছিলেন তিনি বললেন, "তা তো আমি জানি না। শুধু দেখলুম যে, উনি গাড়ি চেপে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে চলে গেলেন।"

"ভদ্রলোক কি নিজের নাম বলেছিলেন?"

"না তো।"

"আচ্ছা, যিনি এসেছিলেন তাঁকে কি দেখতে খুব সুন্দর? তাঁকে দেখে কি অল্পবয়সী বলে মনে হয়েছিল?"

"না, তিনি তো অল্পবয়সী নন। মাঝবয়সী। বেঁটে। ভদ্রলোকের চোখে চশমা আছে। কথাবার্তা খুব ভাল। মুখে হাসি লেগেই আছে। কথা বলবার সময়েও ভদ্রলোক হাসছিলেন।"

"ঠিক আছে। চলে এসো," বলে শার্লক হোম্‌স আমাদের প্রায় টানতে-টানতে নিয়ে চলে এল। স্টকল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাবার সময় গাড়িতে হোম্‌স বললে, "ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে গেছে। ওই লোকগুলো আবার মেলাসকে পাকড়েছে। সেদিন রাত্তিরেই ওরা টের পেয়ে গেছে যে, মিঃ মেলাস খুব ভিতু। ওঁর একফোঁটা সাহস নেই। সেদিন ওই ল্যাটিমার আর তার শাকরেদকে দেখেই মেলাস ভয় পেয়ে যায়। আর সেটা ওরা বুঝতে পেরে স্রেফ ভয় দেখিয়ে ওঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছে। ওরা ওঁকে নিয়ে গেছে দোভাষীর কাজ করাবার জন্যেই। তবে কাজ হয়ে গেলে ওরা যে মেলাসকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শাস্তি দেবে এতে কোনও সন্দেহই নেই।"

আমরা ভেবেছিলুম যে, আমরা যদি ট্রেনে যাই তো গাড়িটা বেকেনহ্যামে পৌঁছবার আগেই আমরা বেকেনহ্যামে পৌঁছে যাব। কিন্তু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়ে ইন্সপেক্টর গ্রেগ্‌সনকে খুঁজে বের করতে দেরি হল। তারপর সার্চ ওয়ারেন্ট বের করতে আরও ঘন্টাখানেক লেগে গেল। কাগজপত্র নিয়ে গ্রেগ্‌সনকে সঙ্গে করে আমরা যখন লণ্ডন ব্রিজে পৌঁছলুম তখন পৌনে দশটা বাজে। সেখান থেকে ট্রেন ধরে আমরা চারজন যখন বেকেনহ্যাম প্ল্যাটফর্মে নামলুম তখন সাড়ে দশটা বাজে। স্টেশন থেকে গাড়ি করে আধ-মাইলটাক যেতেই মারটলসে পৌঁছে গেলুম। বিরাট হাতাওয়ালা বাড়ি। বড় রাস্তা থেকে বাড়িটা অনেক ভেতরে। বাড়িটাও বিরাট। আমরা বাড়ির কাছে এসে গাড়িটা ছেড়ে দিলুম। তারপর আমরা বাড়ির ভেতরে চলে গেলুম। বিরাট বাড়িটা অন্ধকার।

ইন্সপেকটর গ্রেগ্‌সন বললেন, "সব জানলা তো দেখছি বন্ধ। মনে হচ্ছে বাড়িতে লোকজন নেই।"

হোম্‌স বললে, "পাখি উড়ে গেছে। বাসা খালি।"

"এ-কথা কেন বলছেন?"

"ঘন্টাখানেক আগে প্রচুর মালপত্র-বোঝাই একটা গাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে গেছে," হোম্‌স বললে।

ইন্সপেকটর হো-হো করে হেসে উঠলেন, "আমি গেটের আলোয় গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছি বটে, তবে মালপত্তর নিয়ে যাওয়ার কোনও চিহ্ন দেখছি না তো!"

হোম্‌স বললে, "একটু ভাল করে দেখলে দেখবেন দু'ধরনের দাগ রয়েছে। একটা দাগ বাইরে থেকে গাড়ি আসার, আর-একটা গাড়িটা বেরিয়ে যাওয়ার। বাইরে যাওয়ার দাগটা বেশ গভীরভাবে পড়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, গাড়িতে অনেক জিনিসপত্র চাপানো হয়েছিল।"

ইন্সপেকটর নাচার ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "নাহ্‌, আপনার কথা ঠিক ধরতে পারলুম না। কিন্তু এ-দরজা খোলা সহজ হবে না। যাক, আগে তো দেখি বাড়ির ভেতরে কেউ আছে কি না।"

ইন্সপেকটর কড়া ধরে জোরে নাড়া দিলেন, তারপর 'বেল' বাজালেন, কিন্তু কোনও লাভ হল না। ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিলে না। হোম্‌স কোথায় যেন গিয়েছিল। একটু পরেই ফিরে এল।

"আমি একটা জানলা খুলে ফেলেছি," হোম্‌স বললে।

হোম্‌স যে-রকম কায়দা করে জানলার ছিটকিনি খুলে ফেলেছে তা দেখে ইন্সপেকটর গ্রেগ্‌সন বললেন, "ভাগ্যে আপনি পুলিশের হয়ে এ-কাজ করলেন তাই রক্ষে, না হলে কিন্তু ফ্যাসাদ বাধত। যাক, অবস্থা বিবেচনা করে আমরা ওই জানলা দিয়েই ঢুকতে পারি। দরজা কেউ খুলে দেবে বলে মনে হচ্ছে না।"

আমরা সকলে একে-একে সেই জানলা দিয়ে একটা বড় ঘরে ঢুকলুম। দেখে মনে হল এই ঘরের কথাই মেলাস আমাদের বলেছিলেন। ইন্সপেকটর তাঁর লণ্ঠনটা জ্বাললেন। লণ্ঠনের আলোয় ঘরটা দেখলুম। পর্দা-টাঙানো জানলা, দুটো দরজা, একটা জাপানি বর্ম, মিঃ মেলাস যা-যা বলেছিলেন। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। টেবিলের ওপর দুটো কাঁচের গেলাস, একটা খালি ব্রাণ্ডির বোতল আর কিছু খাবারের গুঁড়ো ছড়ানো হয়েছে।

হঠাৎ শার্লক হোম্‌স বলে উঠল, "ওটা কী?"

আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগলুম। আমাদের মাথার ওপর থেকে খুব চাপা একটা গোঙানির শব্দ কানে আসছিল। হোম্‌স দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে হলের দিকে এগিয়ে গেল। হলে এসে আমরা বুঝতে পারলুম, শব্দটা ওপর তলা থেকেই আসছে। একটুও দেরি না করে হোম্‌স সিঁড়ি টপকে টপকে ওপরে উঠে গেল। হোম্‌সের পেছনে আমি আর ইন্সপেকটর ছুটলুম। আমাদের পিছনে মাইক্রফট হোম্‌স তাঁর মোটাসোটা চেহারা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি আসা সম্ভব, আসছিলেন।

তিনতলায় তিনটে ঘর। মাঝের ঘরটা থেকেই আওয়াজটা আসছিল। কখনও এত আস্তে যে কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। আবার এক-এক সময় আওয়াজটা খুব স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। একটা প্রচণ্ড কষ্ট যেন গলা দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দরজাটার চাবি বন্ধ ছিল। তবে ভাগ্য ভাল যে, চাবিটা লকের মধ্যে লাগানো ছিল। হোম্‌স চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলেই ঘরে ঢুকে গেল। আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে দু'হাতে নিজের গলা চেপে ধরে ছুটে বেরিয়ে এল, "ঘর কাঠকয়লার ধোঁয়ায় ভরে গেছে।... একটু অপেক্ষা করো। ... ধোঁয়াটা বেরিয়ে যাক।"

ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে আমরা দেখলুম যে, ঘরের মাঝখানে একটা তামার তেপায়া বসানো। তেপায়ার ওপরে একটা আলো জ্বলছে। আলোর শিখাটা অদ্ভুত নীলচে ধরনের। সেই আলোয় ঘরের মাঝখানটা দেখা যাচ্ছে। ঘরের বাকিটা ছায়া আর অন্ধকার। একটা অদ্ভুত ভৌতিক পরিবেশ। বাইরে থেকে দেখে মনে হল যে, ঘরের এক কোণে দেওয়ালের ধারে ঘাড় গুঁজে দু'জন লোক পড়ে আছে। খোলা দরজা দিয়ে হুহু করে বিষাক্ত ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে লাগল। কাসতে কাসতে আমাদের দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। হোম্‌স দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল খোলা বাতাসে নিশ্বাস নেওয়ার জন্যে। তারপরেই নেমে এসে ঘরের মধ্যে গিয়ে হোম্‌স ঘরের সব জানলা হাট করে খুলে দিলে আর তেপায়া সমেত সেই জ্বলন্ত আগুনটা জানলা দিয়ে বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

হাঁপাতে-হাঁপাতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে হোম্‌স বললে, "আরও দু-এক মিনিট পরেই ঘরে ঢোকা যাবে। ... মোমবাতি আছে নাকি? ... আছে? কিন্তু ওই ঘর যে-রকম গ্যাসে ভর্তি হয়ে রয়েছে তাতে ওখানে দেশলাই জ্বালানো মোটেই নিরাপদ নয়। মাইক্রফট, তুমি দরজার কাছে মোমবাতিটা ধরো, আমরা ওদের ঘর থেকে বের করে আনব। নাও, ধরো বাতিটা।"

দৌড়ে গিয়ে আমরা সেই বিষের ধোঁয়ায় অসুস্থ লোক দু'জনকে কোনওরকমে টানতে টানতে বের করে আনলুম। দু'জনের ঠোঁট নীল হয়ে গেছে। চোখ-মুখ বীভৎস-রকমের ফুলে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি, ওদের দু'জনের চোখ-মুখ এমনই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, দাড়ি ছাড়া মিঃ মেলাসকে চেনবার কোনও উপায়ই ছিল না। কয়েক ঘন্টা আগে ডাইয়োজিনেস ক্লাবে যে গ্রিক দোভাষী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে তিনি কি এই ভদ্রলোক? ভাবা যায় না যে, এত কম সময়ের মধ্যে মানুষের চোখ-মুখ এত সাঙ্ঘাতিক রকমের বদলে যেতে পারে। মিঃ মেলাসের হাত-পা শক্ত করে দড়ি

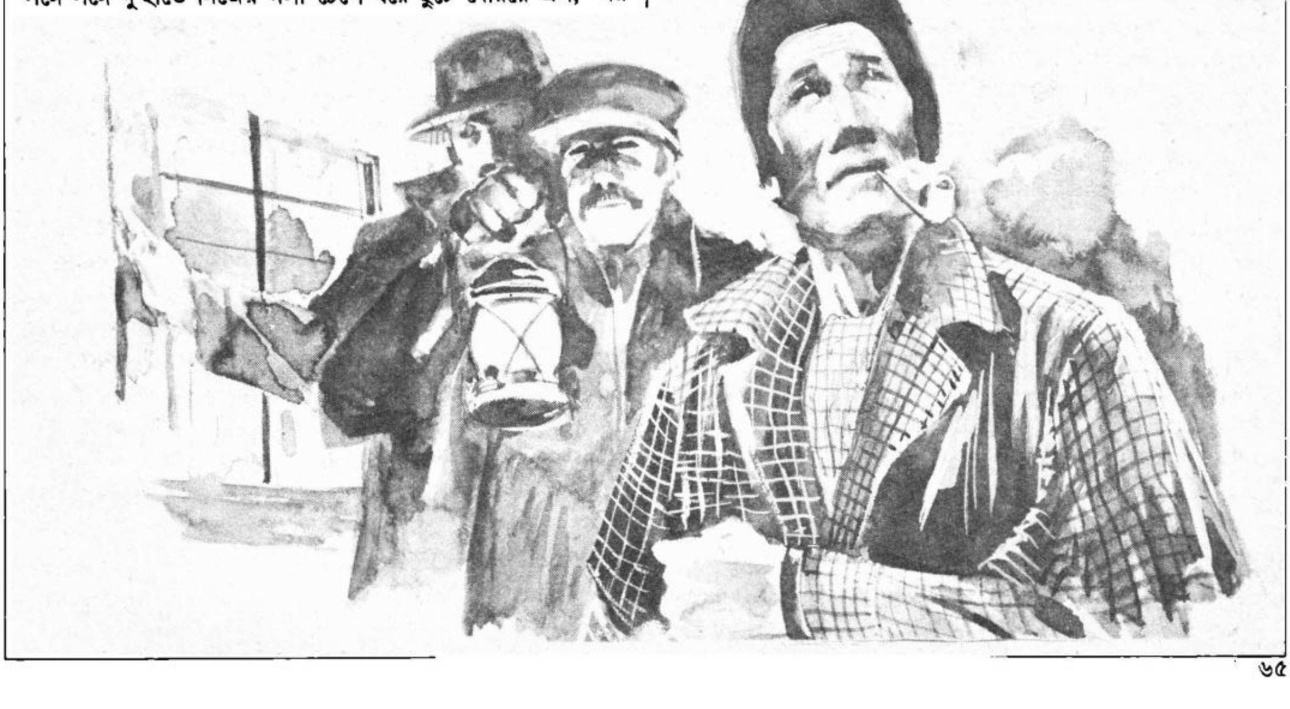

দিয়ে বাঁধা। তাঁর কপালের ঠিক নীচে চোখের ওপরে একটা কাটা দাগ। বোঝা যায় যে, কোনও কিছু দিয়ে ওঁকে জোরে মারা হয়েছিল। অপর ভদ্রলোকটির হাত-পা একইভাবে দড়ি দিয়ে বাঁধা। তার ওপর ভদ্রলোকের মুখে স্টিকিং-প্লাস্টার কেটে-কেটে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভদ্রলোক বেশ লম্বা। তবে শরীর খুবই খারাপ। না খেতে পেয়ে শুকিয়ে গেছেন। আমরা যখন ভদ্রলোককে বের করে আনলুম তখন তাঁর কাতরানি থেমে গেছে। ভদ্রলোকের দিকে এক পলক তাকিয়েই বুঝতে পারলুম যে, আমাদের আসতে দেরি হয়ে গেছে। কোনও ডাক্তারের কোনও ওষুধেই ওঁকে আর জাগিয়ে তোলা যাবে না। মিঃ মেলাস অবশ্য তখনও বেঁচেছিলেন। খানিকক্ষণ অন্তর অন্তর আমোনিয়া আর ব্রাণ্ডি দিয়ে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ওকে জাগিয়ে তোলা গেল। মিঃ মেলাস চোখ মেলে তাকালেন। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। বুঝলুম যে, অন্ধকার উপত্যকায় আমাদের সবাইকে একদিন না একদিন যেতেই হবে, সেই উপত্যকার প্রায় মুখ থেকে মিঃ মেলাসকে ফিরিয়ে আনতে পারা গেছে।

সুস্থ হয়ে মিঃ মেলাস আমাদের যে-কাহিনী শোনালেন তা আমরা যে-রকম ভেবেছিলুম তার সঙ্গে মোটামুটি মিলে গেল। মিঃ মেলাসের ঘরে ঢুকেই আগন্তুক পকেট থেকে রিভলভার বের করে। ওর হাতে রিভলভার দেখেই মিঃ মেলাস এত ভয় পেয়ে যান যে,

শার্লক হোমসের নতুন গল্প

নৌবাহিনীর চুক্তি গায়েব

আগামী সংখ্যায় শুরু হচ্ছে

তিনি কোনওরকম আপত্তি না করে ওর সঙ্গে গুটিগুটি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। এই দেখনহাসি শয়তানটা মিঃ মেলাসকে স্রেফ ভয় দেখিয়ে কী-রকম বশ করে ফেলেছে তা ভাবতে পারা যায় না। ওই শয়তানটার কথা উঠলেই আমাদের এই অনেক ভাষা-জানা পণ্ডিতমশাইয়ের হাত-পা কাঁপতে শুরু করে, মুখ একদম সাদা হয়ে যায়। যাই হোক, মেলাসকে সঙ্গে নিয়ে ওই লোকটা সময় নষ্ট না করে সোজা বেকেনহ্যামে চলে আসে। বেকেনহ্যামে মিঃ মেলাসকে আবার দোভাষীর কাজ করতে হয়। মিঃ মেলাসের এবারের অভিজ্ঞতা আগের বারের অভিজ্ঞতার চেয়েও ভয়াবহ। দুই বদমায়েশ ইংরেজ সেই অসহায় গ্রিক ভদ্রলোকটিকে অনবরত শাসাচ্ছিল এই বলে যে, তাদের কথা না শুনলে ওরা ওঁকে খুন করে ফেলবে। ওরা যখন বুঝতে পারলে যে, গ্রিক ভদ্রলোককে দিয়ে কোনওভাবেই তাদের মতলব হাসিল হবে না, তখন ওরা ওঁকে ধাক্কা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। এরপরে ওরা মিঃ মেলাসকে নিয়ে পড়ল। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে উনি যে ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তার জন্যে ওঁকে ভর্ৎসনা করল। ...তারপর উনি কিছু বোঝবার আগেই লাঠির ঘায়ে ওঁকে বেহুঁশ করে দিল। ... তারপর কী ঘটেছে তা তিনি জানেন না।

এই হল গ্রিক দোভাষীর আশ্চর্য অভিজ্ঞতার আসল রহস্য। মোটামুটিভাবে রহস্যের সমাধান হলেও কিছু-কিছু ব্যাপার কিন্তু অজানাই থেকে গেল। মাইক্রফট হোম্‌সের দেওয়া বিজ্ঞাপনের উত্তরে যে ভদ্রলোক চিঠি দিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে যে খবর পাওয়া গেল তা এইরকম :

সোফি বিরাট বড়লোকের মেয়ে। তিনি ইংল্যাণ্ডে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ইংল্যাণ্ডে এসে হ্যারল্ড ল্যাটিমার নামে এক ইংরেজ ছোকরার সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়। যে-কোনও ভাবেই হোক সোফি ল্যাটিমারের খপ্পরে পড়ে যান। ল্যাটিমার ওঁকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে। এই ব্যাপারে সোফির বন্ধুরা খুব ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, সব কথা সোফির দাদাকে চিঠির মারফত জানিয়ে দিয়েই ওরা চুপ করে যায়। ওদের ধারণা হয় যে, ওদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। ওদের আর করবার কিছু নেই। সোফির দাদা চিঠি পেয়েই অ্যাথেন্স থেকে সোজা ইংল্যাণ্ডে চলে আসেন। কিন্তু উত্তেজনার বশে তিনি একটি কাঁচা কাজ করে ফেলেন। তিনি একা-একাই হ্যারল্ড ল্যাটিমার আর তার সঙ্গীর, পরে আমরা জানতে পেরেছিলুম যে, ওই হাসি-মুখো শয়তানটার নাম উইলিয়ম কেম্প, ঘাঁটিতে গিয়ে হাজির হন। এই উইলিয়ম কেম্প লোকটা ভয়ানক পাজি। হেন জঘন্য কাজ নেই যা ও করেনি। সোফির দাদা ওদের কাছে গেলে ওরা সহজেই ওকে বন্দী করে ফেলে। একে তো ভদ্রলোক বিদেশী, তার ওপর ইংরেজি জানেন না একটুও। তাই ভদ্রলোক যে ওদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবেন না, সেটা ওরা গোড়াতেই বুঝে গিয়েছিল। আর তাই তাঁদেরকে এক বাড়িতেই বন্দী করে রাখতে ওরা ভয় পায়নি। শুধু দাদার মুখে স্টিকিং প্লাস্টার লাগিয়ে রাখত, যাতে সোফি ওঁকে দেখতে পেলেও চিনতে না পারেন। তবে তাদের এ ধারণা যে কত মিথ্যে, তা তো মিঃ মেলাসের কথা থেকেই জানতে পারা গেছে। ভাই-বোনের টান এমনই জিনিস। একনজর দেখেই সোফি তাঁর দাদাকে চিনতে পেরেছিলেন। সোফির নিজের অবস্থাও বিশেষ ভাল ছিল না। চব্বিশ ঘন্টা বাড়ির ভেতরে বন্দী। বাড়িতে লোক বলতে দু'জন কাজের লোক। গাড়োয়ান আর তার স্ত্রী। ওরা দু'জনেই আবার ল্যাটিমার আর কেম্পের লোক। সোফির দাদাকে বন্দী করে রাখার উদ্দেশ্য হল জোর করে ওঁকে দিয়ে ওঁর আর সোফির সব সম্পত্তি ওদের নামে লিখিয়ে নেওয়া। শেষকালে ওরা যখন দেখল যে ওদের কীর্তিকাহিনী সব ফাঁস হয়ে গেছে আর সোফির দাদা প্রাণ গেলেও সম্পত্তি ওদের হাতে লিখে দেবেন না, তখন ওরা সোফিকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। আগে গোঁয়ার্তুমির জন্যে সোফির দাদাকে এবং কথা দিয়ে কথা না রাখার জন্যে মিঃ মেলাসকে ওরা ভাল করে শাস্তি দিয়ে যায়।

বেশ কয়েক মাস পরে বুদাপেস্ট থেকে একটা ছোট্ট খবর ছাপা হয়েছিল। খবরটা আর কিছু নয়, শুধু এইটুকু : দু'জন ইংরেজ ছোকরা আর তাদের সঙ্গিনী এক মহিলা বুদাপেস্টে বেড়াবার সময় সাঙ্ঘাতিক রকমের দুর্ঘটনায় পড়ে। দু'জন লোকই ছুরির আঘাতে মারা যায়। হাঙ্গারির পুলিশের ধারণা, দু'জনের মধ্যে কোনও একটা সামান্য বিষয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হয়, তারপর মুখ থেকে ব্যাপারটা হাতে নেমে আসে। ছুরি খেয়ে পরস্পরের মৃত্যু ঘটে। আমি যতদূর জানি হোম্‌সের ধারণা ঠিক উলটো। হোম্‌সের দৃঢ় ধারণা যে, যদি ওই গ্রিক মহিলাটির সঙ্গে কোনওদিন তার দেখা হয় তবেই সে জানতে পারবে যে, সোফি তাঁর দাদার অকালমৃত্যুর ও তার নিজের কষ্টের প্রতিশোধ এইভাবে নিয়েছিল কি না!

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

পরদিন সকালে...
এ যে বিশাল জঙ্গল...
দু' ঘণ্টা বাদে...
এ-রকম গাছ মার্লিনস্পাইকে লাগালে দিব্যি হত...
সেইদিন বিকেলে...
ঝপাত
পচা ফল ! গাছ থেকে পড়েছে !
কিন্তু কোন্ গাছ থেকে পড়ল ?
ঝপাত
পরদিন রাত্তিরে...
এখানেই তাঁবু খাটাব !
তুষারের রাজ্যে এসে পড়েছি !
পাহাড়ের ওদিকে তিব্বত ! ওরই কাছে বিমান-দুর্ঘটনা ঘটেছে ! কাল যাব ! এখন শাম্পা খাওয়া যাক !
শাম্পা বস্তুটা আসলে কী ?
চা আর মাখনের সঙ্গে বার্লির মণ্ড ।
হু—হু—হু—অ—অ—
কিসের শব্দ ?
ইয়েতি ! ইয়েতি...ইয়েতি চিৎকার করছে !
ইয়েতি...মানে তুষারমানব !!
ভৌ-ভৌ

কপিরাইট : কাস্টারম্যান এস. এ.

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

তবে কি বথামই 'গ্রেটেস্ট'

কৃশানু ভট্টাচার্য

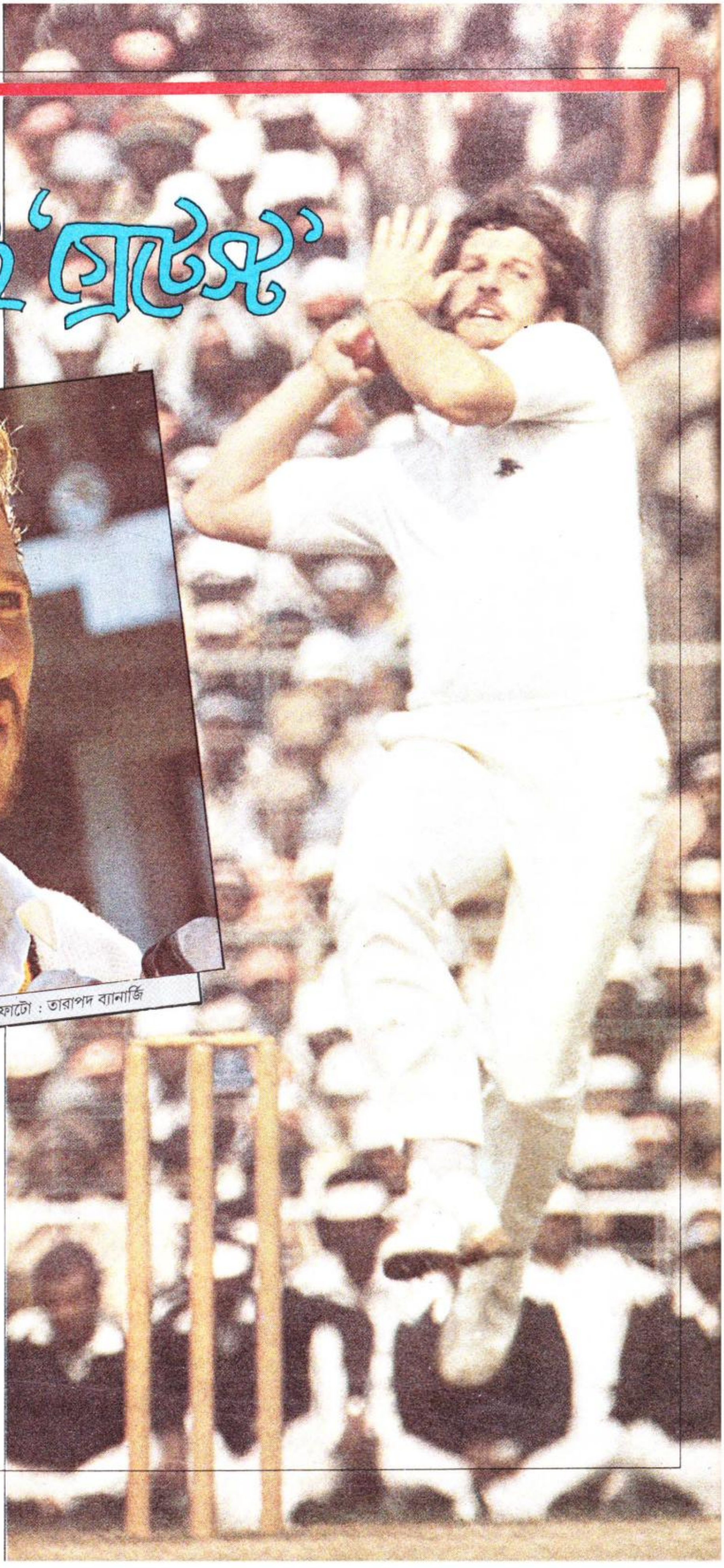

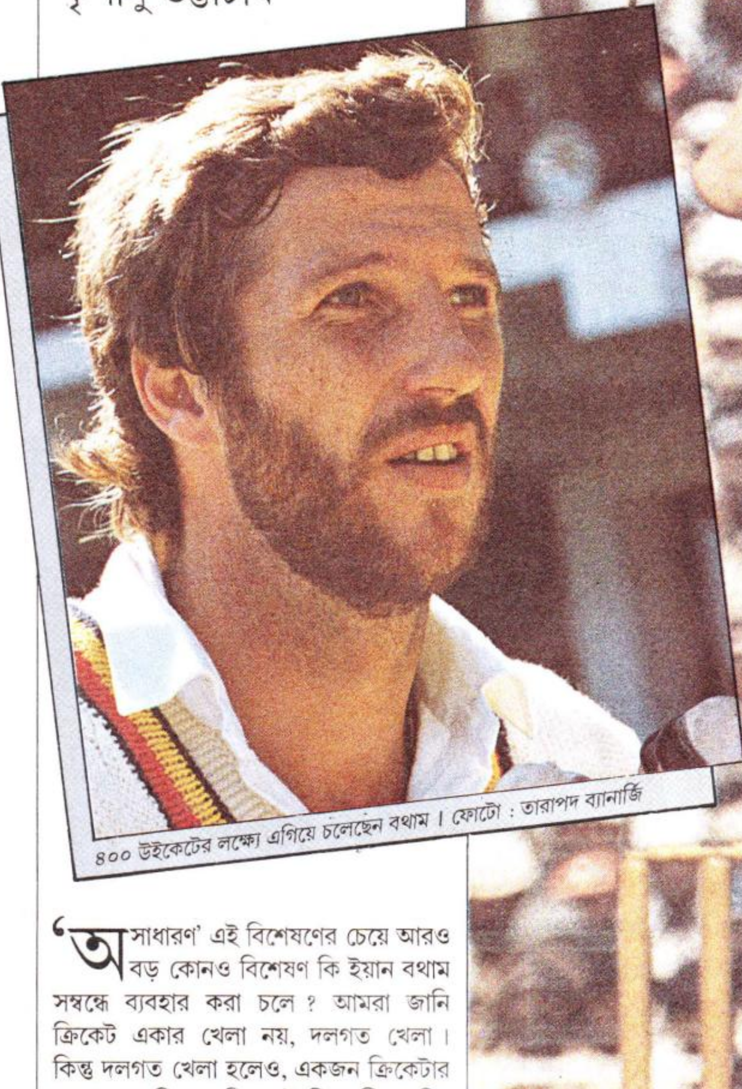

৪০০ উইকেটের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন বথাম। ফোটো : তারাপদ ব্যানার্জি

'অসাধারণ' এই বিশেষণের চেয়ে আরও বড় কোনও বিশেষণ কি ইয়ান বথাম সম্বন্ধে ব্যবহার করা চলে? আমরা জানি ক্রিকেট একার খেলা নয়, দলগত খেলা। কিন্তু দলগত খেলা হলেও, একজন ক্রিকেটার যখন একা নিজের বিক্রমেই বিধ্বংসী বোলিং করে বিপক্ষের দুর্গে ধস নামান, অথবা ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে প্রতিপক্ষের বোলারদের উড়িয়ে দিয়ে নিজের দলকে একের পর এক টেস্টে জয়ী করান, তখন তিনি নিশ্চয়ই ক্রিকেটের বিরলতম প্রতিভাদের দলে পড়েন।

১৯৮১-তে হেডিংলে টেস্টের সেই চতুর্থ দিন। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তৃতীয় টেস্টে ইনিংস

পরাজয় বাঁচানোর জন্য তখনও ইংল্যাণ্ডের দরকার ১২১ রান। লিলি, অল্ডারম্যান ও লসন-এর বোলিংয়ের মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে ইংল্যাণ্ডের প্রথম পাঁচজন ব্যাটসম্যান সাজঘরে ফিরে গেছেন। রান তখন মাত্র ১০৫। এর ঠিক এগারো ওভার পর শুরু হল ইয়ান বথাম নামের আশ্চর্য ক্রিকেটারের এক অভাবনীয় ব্যাটিং। ডিল্লি ও পরে ওল্ডের সঙ্গে মাত্র ৩১ ওভারে তিনি ১৮৪ রান যোগ করলেন। ওভার প্রতি রান প্রায় ছয়। একদিনের খেলায় ঈর্ষা করার মতো রান-রেট। বথামের ব্যাটের দাপটে বল ছাব্বিশবার সীমানা পেরিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত বথাম ওই টেস্টে ১৪৯ রানে অপরাজিত থেকে গেলেন। আর ইংল্যাণ্ড জিতল ১৮ রানে। 'কেবলমাত্র ইয়ানের পক্ষেই সম্ভব, ওইভাবে আমাদের মুঠো থেকে জয় ছিনিয়ে নেওয়া।'—টেস্ট ম্যাচে হেরে যাবার পর অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক কিম হিউজ-এর এই কথা থেকেই বোঝা যায় বথাম কোন্ জাতের ক্রিকেটার।

অথচ তেরো বছর বয়সে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে যখন মারাত্মক চোট পান বথাম, তখন কেউ ভাবতেও পারেননি যে, তিনি আবার বেঁচে উঠবেন। কিন্তু লড়াই করে বাঁচার প্রবণতাই বোধহয় তাঁকে সেদিন বাঁচিয়ে দিয়েছিল। 'পরাজয়কে আমি ঘৃণা করি'—বথামের এই সদম্ভ উক্তি কিন্তু কোনও ফাঁকা আওয়াজ নয়।

বন্ধুমহলে 'গায় দি গোরিলা' নামে পরিচিত বথামের চেহারা গোরিলার মতোই বিশাল (ওজন ৯৫ কেজি)। দক্ষ অল-রাউন্ডার হিসেবে বথামের সফলতার মূলে তাঁর এই বিশাল চেহারার অবদানও কম নয়। ১৯৭৯-৮০ সিরিজে সিডনি টেস্টে প্রচণ্ড গরমে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে বব উইলিস-এর মতো ফাস্ট বোলার মাঠ ছেড়ে চলে যান। কিন্তু বথাম টানা ১৮ ওভার বল করেন এবং সারাদিন ফিল্ডিং করেও অবসন্ন হননি। সেদিন তাড়াতাড়ি সবাই ঘুমোতে চলে গেলেও, বথাম 'মিডনাইট এক্সপ্রেস' ছবিটি দেখতে গিয়েছিলেন।

কত বড় ক্রিকেটার ইয়ান বথাম? টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র অল-রাউন্ডার, যাঁর দখলে আছে ৪৭৮০ রান ও ৩৬৬টি উইকেট। তিনি ছাড়া ইংল্যান্ডের আর কোনও ক্রিকেটার টেস্টে ১৫০০ রান ও ১৫০ উইকেট পাননি। তাঁর আগে আর কোনও অল-রাউন্ডার একই টেস্টে সেঞ্চুরি করার পরে, দশটি বা ততোধিক উইকেট দখল করেননি (বোম্বের জুবিলি টেস্ট)।

লিলির রেকর্ড ভেঙেছেন বথাম। অস্ট্রেলিয়ার পার্থ-এ সম্প্রতি দু'জনকে মাছ ধরতে দেখা গেল

অনেক দিক দিয়েই বথাম প্রথম হবার গৌরব অর্জন করেছেন। স্বদেশপ্রেমিক এই মানুষটি, প্যাকার দক্ষিণ আফ্রিকার মোটা টাকার প্রলোভন বারবার এড়িয়ে গেছেন। চারটি টেস্ট খেলার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা তাঁকে ২৫০,০০০ পাউণ্ড অবধি দিতে প্রস্তুত ছিল। মারাত্মক লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের সাহায্য করার জন্য ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের একপ্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত (প্রায় ৮৮০ মাইল) হেঁটে ৫০,০০০ পাউণ্ড তিনি সংগ্রহ করেছেন।

আবার বথামের মতো ধনী ক্রিকেটারও বিশ্বে বিরল। তাঁর বাৎসরিক আয় প্রায় ৭০,০০০ পাউণ্ড। আর কোনও ক্রিকেটার এত টাকা তাঁর আগে উপজার্ন করেছেন কি? আসলে রেকর্ড গড়ায় বথামের অপরিসীম আনন্দ। নিজের গাড়ি সাব টার্বো-তে এত স্পিড তুলেছেন যে, ওটাই এই বিশ্বে সর্বোচ্চ। প্রচণ্ড জোরে গাড়ি চালাবার অভিযোগে এর আগে একাধিকবার তিনি জরিমানা দিয়েছেন।

বিমান চালাতেও ওস্তাদ বথাম। সারা বিশ্ব চক্কর দেবার একটা পরিকল্পনা আছে তাঁর। 'আসলে ইয়ান এক জায়গায় থেমে থাকতে পারে না। নতুন কিছু করার জন্য সে মনে-মনে ছটপট করে'—বলেছেন ইয়ানের বাবা। একেবারে খাঁটি কথা। এই মুহূর্তে বথাম নিজেকে একজন দক্ষ অফ্ ব্রেক বোলার হিসেবে তৈরি করতে ব্যস্ত। 'বয়স বেড়ে গেলে আমার ফাস্ট বলে আর তেমন ধার থাকবে না। তখন রিচার্ডস-এর মতো অফ্ ব্রেক বোলার হতে পারলে, দু' একটা উইকেট পাওয়া যাবে।' সেই চেষ্টাতেই তিনি এখন ব্যস্ত।

আসলে তাঁর ভাবমূর্তি বা তাঁর দক্ষতাকে খাটো করে দেখানোর অনেক চেষ্টা আগে করা হয়েছে। কিন্তু এখনও যে তিনি বিশ্বের এক নম্বর অল-রাউণ্ডার সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কপিল বা ইমরান নন, তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রিচার্ড হ্যাডলি। কিন্তু ব্যাটিং ও ফিল্ডিং-এ হ্যাডলিকে টেক্কা দেবেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মারমুখী ব্যাটিং করে ইংল্যান্ডকে তিনি ১১টি টেস্টের পরে জয়ী করিয়েছেন। আর বথাম এখন কপিলদেব, ইমরান খান ও রিচার্ড হ্যাডলিকে ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন।

ট্রেভর-বেইলি বথামকে ইংল্যাণ্ডের 'এই শতাব্দীর সেরা ক্রিকেটার' বলেছেন। রিচি বেনোর মতে বথাম সোবার্স ও মিলারের সমকক্ষ। 'সান' পত্রিকায় বথামকে ডবলিউ· জি· গ্রেস-এর মতোই দক্ষ বলা হয়েছে।

এতসব বলার পরেও একটি প্রশ্ন থেকেই যায়, বথামই কি বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অল-রাউণ্ডার? ৮৮ টেস্টে (অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যাণ্ড চতুর্থ টেস্ট ধরে)) যিনি ৪৭৮০ রান করেছেন, ও উইকেট পেয়েছেন ৩৬৬টি, ক্যাচ ধরেছেন ১০০টির বেশি, শ্রেষ্ঠত্বের দাবি তিনি করতেই পারেন। লেন হাটনকে একবার এ-নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেছিলেন, 'গ্যারি সোবার্সের ব্যাটিংয়ের ধারেকাছে ইয়ান বথাম আসবে না। আর বোলিং? সোবার্স ছ'টি বল ছ'রকমভাবে করতে পারতেন, যা বথাম পারেন না। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইয়ান তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার।' হাটনের কথাটাই হয়তো ঠিক।

লেন্ডল ও বেকারের বড় চ্যালেঞ্জ এখন ক্যাশ

মানস চক্রবর্তী

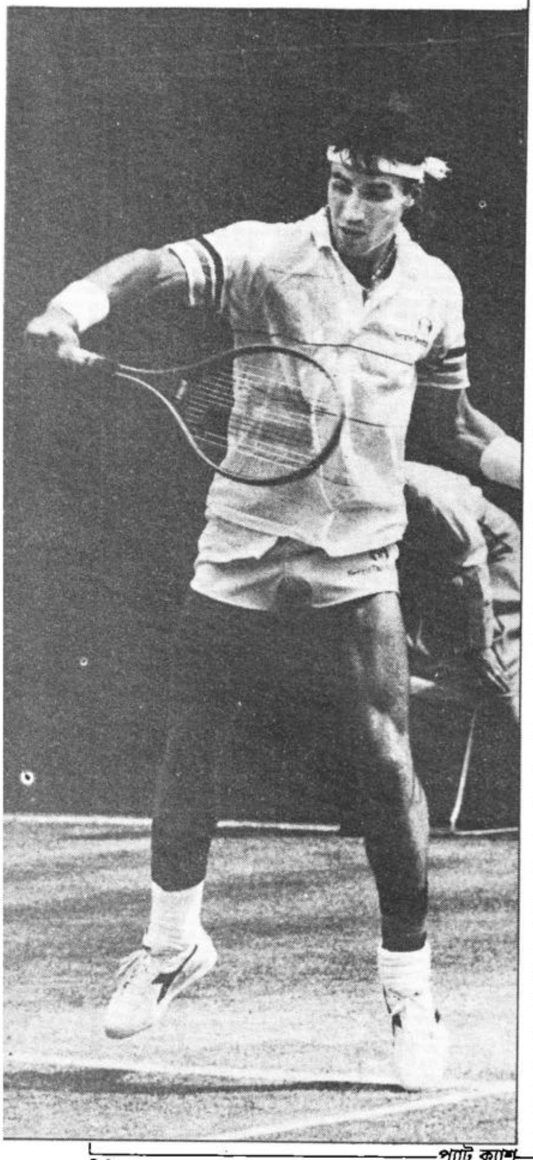

প্যাট ক্যাশ

মেলবোর্নের কোইউং স্টেডিয়ামের ঘড়িতে তখন বিকেল চারটে। ডোভস কাপের রিভার্স সিঙ্গল্‌স-এ সুইডেনের মাইকেল পার্নফর্স-এর বিরুদ্ধে পর পর দু'গেমে হেরে কোর্ট বদলের আগে ঘামে-ভেজা মুখটা তোয়ালে দিয়ে মুছে নিতে গিয়ে এক বল-বয়কে ডাকলেন প্যাট ক্যাশ—'মেলবোর্নে ক্রিকেটের কী খবর ?' উত্তর এল, 'অস্ট্রেলিয়া ইনিংসে হেরেছে।' 'সে কী ! ওখানে হার, আবার এখানেও···। নাঃ ম্যাচটা জিততেই হবে।' ২-৬, ৪-৬'এ পিছিয়ে থেকে পরপর তিনটি গেম প্যাট জিতলেন ৬-৩, ৬-৪, ৬-৩-এ। অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে আর দাঁড়াতেই দেননি। সেই সঙ্গে ১৯৮৬-র ডেভিস কাপ ফাইনালের মীমাংসা হয়ে গেল। কারণ তার আগে প্রথম সিঙ্গলসে স্টেফান এডবার্গকে হারিয়েছেন ক্যাশ। জিতেছেন ডাবলস-এ, জন ফিটজেরাল্ডকে সঙ্গে নিয়ে। শক্তিশালী সুইডেনকে হারিয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল অস্ট্রেলিয়া যে ডেভিস কাপ জিতবে, তা স্বপ্নেও ভাবেননি অস্ট্রেলিয়ার নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন নিল ফ্রেজার। ডেভিস কাপ খেলার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে ফ্রেজার এর পর বলেছেন, একা একজন খেলোয়াড় কোনও দেশকে ডেভিস কাপ ফাইনাল জিতিয়ে দিতে পারে, তা ক্যাশের আগে কেউ কল্পনাও করতে পারত না।

অবশ্য ডেভিস কাপ জেতা ক্যাশের কাছে নতুন নয়। ১৯৮৩-তেও ক্যাশ অ্যাণ্ড কোং ওই মেলবোর্নেই সুইডেনকে হারিয়েছিলেন। সেবারও মীমাংসাসূচক ম্যাচটিতে জোয়াকিম নাইস্ট্রমকে হারিয়েছিলেন ক্যাশ। এবং তখনই বোঝা গিয়েছিল—রড লেভার, কেন রোজওয়েল, জন নিউকোম্ব অথবা রয় এমার্সনের দেশ আরও একজন টেনিস প্রতিভার জন্ম দিল।

১৯৮৪-তে জীবনের সেরা ফর্মে ছিলেন ক্যাশ। উইম্বলডন এবং আমেরিকান ওপেনে তাঁর সেমিফাইনালে যাওয়া কেউ রুখতে পারেনি। ঘাস এবং কৃত্রিম টার্ফ দু'ধরনের কোর্টেই যখন ক্যাশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিলেন, তখন হঠাৎ পিঠের ব্যথা গোটা ১৯৮৫ সালটাই তাঁকে পেশাদার টেনিস থেকে সরিয়ে দিল। ১৯৮৬-র গোড়ার দিকে ক্যাশ যখন কঠোর পরিশ্রমে নিজেকে তৈরি করছেন, তখন আবার হাসপাতালে যেতে হল অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশনের জন্য। ফেরার পর দেখলেন, এ· পি· পি·তে তাঁর স্থান ৪১৮। সাধারণত এই অবস্থায় খেলা ছেড়ে দেবার কথাই সবাই বলেন। ব্যক্তিগত কোচ ইয়ান বার্কলেকে প্যাট কিন্তু বলেছিলেন, 'বছরটা শুরু করছি ৪১৮তে। শেষ করতে চাই প্রথম 'চার' সংখ্যাটি বাদ দিয়ে।' অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। ১৯৮৬-র শেষে ক্যাশের স্থান প্রথম পনেরোজনের মধ্যে।

ব্যক্তিগত দক্ষতায় তুঙ্গে থেকেও চমৎকার দলগত খেলার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ক্যাশ। অস্ট্রেলিয়ার এক টেনিস-বিশেষজ্ঞ বলেছেন, 'লক্ষ করা গেছে, ক্যাশ ভাল খেললেই গোটা অস্ট্রেলিয়া দল ভাল খেলে। ও যখন আউট অব ফর্ম, তখন দেখা যায়, ফর্ম ব্যাপারটাই যেন ওদের সকলের মধ্য থেকে উধাও।' কথাবার্তায় খোলামেলা কিন্তু একটু মেজাজি প্যাটকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, পূর্বসূরীদের ভদ্রতার প্রভাব তোমার ওপর পড়ল না কেন ? ক্যাশ অকপটে বলেন, 'আমরা বড় হয়েছি বর্গ ও কোনার্স-এর যুগে। লেভার বা ফ্রেড পেরিদের মতো পালিশ-করা জুতো কিংবা হেয়ার ক্রিম মেখে খেলার সুযোগ তো আমাদের হয়নি।' মেজাজি কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল নয়। বরং প্রচণ্ড বন্ধুবৎসল। সহখেলোয়াড় পল ম্যাকনেমি বলেন, 'ওর মধ্যে এক আউন্সও হিংসেমি নেই।'

অস্ট্রেলিয়ায় ফুটবল লিগে তাঁর প্রিয়তম বন্ধু ডিনকে (কোচ বার্কলের ছেলে) এমন কড়া ট্যাক্‌ল করেছিলেন যে, বেচারাকে তিন মাস হাসপাতালে থাকতে হয়! বার্কলে অবশ্য সেদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন, 'ওই অবস্থায় প্যাটের কড়া ট্যাকল না করে উপায় ছিল না।'

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোর্টে ওঁর কঠোর পরিশ্রম দেখে অনেকে ওঁর সঙ্গে ইভান লেণ্ডল-এর মিল খুঁজলেও, আসলে প্যাটের সঙ্গে বেশি মিল ম্যাকেনরোর। দুজনেই আইরিশ ক্যাথলিক, আইনজ্ঞের সন্তান। দুজনেরই ইলেকট্রিক গিটারের ওপর দারুণ ঝোঁক। উভয়েরই বন্ধু ভিটাস গেরুলাইটিস (আসলে ম্যাকেনরো এবং ক্যাশের গিটার দুটিই গেরুলাইটিসের দেওয়া)। এবং সবচেয়ে বড় কথা ম্যাকেনরোর মতো ক্যাশও মূলত আক্রমণাত্মক খেলোয়াড়।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত ক্যাশ গ্রাণ্ড স্লামের তকমা পাননি। যদিও দু'টি ডেভিস কাপ এবং দু'টি আণ্ডার এজ টুর্নামেন্টের খেতাব ওঁর আছে। আসলে আঘাত এবং অসুখের জন্য এখনও পর্যন্ত নিজের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে পারেননি ক্যাশ। তবে এবারের ডেভিস কাপ যদি কোনও নির্দেশক হয়, তবে ১৯৮৭-তে লেণ্ডল, বেকার ভিল্যাণ্ডারদের তিনি হয়তো বেশ কিছুটা বেকায়দায় ফেলবেন।

৩০০ উইকেট কে কীভাবে পেলেন

প্রদীপ সেন

ভারত-শ্রীলঙ্কা তৃতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনে কপিলদেবের বলে রুমেশ রত্নায়েকের স্টাম্প উপড়ে যেতেই, ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাস নতুনভাবে লেখা হয়ে গেল কটকের বারবটি স্টেডিয়ামে। সেইসঙ্গে বিশ্বের ছ'জন বোলারের সঙ্গে একই আসনে নিজের স্থান পাকা করে নিলেন হরিয়ানার 'হারিকেন' কপিলদেব।

টেস্ট ক্রিকেটে ৩০০ উইকেট পাওয়া কোনও নতুন ঘটনা নয়। কপিলদেবের আগে ৩০০ বা ততোধিক উইকেট পেয়েছেন ইংল্যাণ্ডের তিনজন—ইয়ান বথাম, বব উইলিস ও ফ্রেডি ট্রুম্যান, অস্ট্রেলিয়ার ডেনিস লিলি, নিউজিল্যাণ্ডের রিচার্ড হ্যাডলি ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ল্যান্স গিব্‌স।

ট্রুম্যান, লিলি ও উইলিস ফাস্ট বোলার হিসেবে ও গিব্‌স অফ স্পিনার হিসেবে এই লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। অন্যদিকে কপিলদেব, বথাম ও হ্যাডলি'র পরিচিতি মূলত অলরাউণ্ডার হিসেবেই। এই তিনজনও আবার মিডিয়াম পেস বল করেন। ট্রুম্যান, লিলি এবং উইলিসের মতো এঁদের তিনজনের ওপরেই আছে নতুন বলের দায়িত্ব। গিব্‌সই একমাত্র স্পিনার, যিনি টেস্টে ৩০০-র বেশি উইকেট পেয়েছেন।

৩০০ উইকেট পাওয়ার তালিকায় যিনি প্রথম বোলার, সেই ফ্রেডি ট্রুম্যান ১৯৬৪ সালে তাঁর জীবনের ৬৫-তম টেস্টে এই দুর্লভ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ইয়র্কশায়ার কাউন্টির ফাস্ট বোলার ট্রুম্যান এক খনি-শ্রমিকের ছেলে। তাঁর বলে ছিল অসম্ভব গতি ও তেজ। তাই তিনি 'ফায়ারি ফ্রেড' নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি মোট ৩০৭টি উইকেট পেয়েছিলেন। কিন্তু নিজের খামখেয়ালিপনার জন্য অনেক টেস্ট খেলেননি এবং কখনও ভারত বা পাকিস্তান সফর করেননি। তা হলে তাঁর উইকেটের সংখ্যা হয়তো আরও বাড়ত।

দীর্ঘ ১২ বছর ধরে ট্রুম্যানের রেকর্ড অটুট ছিল। ১৯৭৬ সালের ৩১ জানুয়ারি সেই রেকর্ড প্রথম ভাঙেন ল্যান্স গিব্‌স।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওটিই ছিল তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ওই সিরিজে হয়তো তিনি সুযোগ পেতেন না। কিন্তু ট্রুম্যানের রেকর্ড ভাঙার জন্যই তাঁকে শেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ৩০৭টি উইকেট পেতে ট্রুম্যানকে ১৫,১৭৮টি বল খরচ করতে হয়েছিল। আর ট্রুম্যানের রেকর্ড ভাঙতে গিব্‌সকে করতে হয়েছিল ২৬,৮৫৩টি বল। অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ।

গিব্‌সই আজ পর্যন্ত প্রথম এবং শেষ স্পিনার যিনি ৩০০ ক্লাবের সদস্যপদ পেয়েছেন। আরও দু'জন এই 'ম্যাজিক ফিগার'-এ পৌঁছতে পারতেন। ইংল্যাণ্ডের ডেরেক আণ্ডারউড মাত্র তিনটি উইকেটের জন্য এই লক্ষে পৌঁছতে পারেননি। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে গিয়েছিলেন। তাই ১৯৮২ সালের পর তিনি আর ইংল্যাণ্ডের হয়ে টেস্ট খেলার সুযোগ পাননি। অন্যজন হলেন বিষেন সিং বেদি। ২৬৬টি উইকেট পেয়ে স্পিনারদের তালিকায় তাঁর স্থান তৃতীয়।

সত্তর দশকে টেস্ট ক্রিকেট খেলা শুরু করেন লিলি, বথাম, উইলিস, হ্যাডলি ও কপিলদেব। সত্তরের দশক থেকেই শুরু হয় ঘনঘন টেস্ট খেলার ঢালাও ব্যবস্থা। ফলে গিব্‌সের পরে, ১১ বছরের মধ্যে আরও পাঁচজনের ৩০০ উইকেট পূর্ণ হয়। এঁদের মধ্যে বোলার হিসেবে সেরা ছিলেন অবশ্যই ডেনিস লিলি। মাত্র ৫৬টি টেস্টে তিনি পূর্ণ করেন ৩০০ উইকেট।

বথাম ও কপিলদেবের কৃতিত্ব অন্যদের চাইতে যেন একটু বেশি। এবং কৃতিত্ব কিছুটা হ্যাডলিরও। বিপক্ষের ব্যাটসম্যানদের আউট করা ছাড়াও, দলের সঙ্কটের মুহূর্তে এঁদের ব্যাট হাতে রুখে দাঁড়াতেও হয়। এবং এই কাজটি অনেকবার এঁরা কৃতিত্বের সঙ্গেই করেছেন।

বিস্ময়ের কথা, গ্যারি সোবার্সের মতো বোলার, যিনি ছ'টা বল ছ' রকমভাবে করতে পারতেন, তিনিও ৩০০ কেন, ২৫০টি উইকেটও পাননি ; যদিও করেছেন ৮,০৩২ রান। কিন্তু বথাম ৪,০০০ রান ছাড়াও পেয়েছেন ৩৬৬টি উইকেট। আর ৪,০০০ রানের ঘরে পৌঁছতে কপিলেরও বেশি দেরি নেই। এ-কৃতিত্ব এই দু'জনের ছাড়া আর কারও নেই।

৩০০-তম উইকেটটি কে কীভাবে পেয়েছেন ? ট্রুম্যান, গিব্‌স ও বথামের বলে ক্যাচ দিয়ে আউট হয়েছিলেন তাঁদের

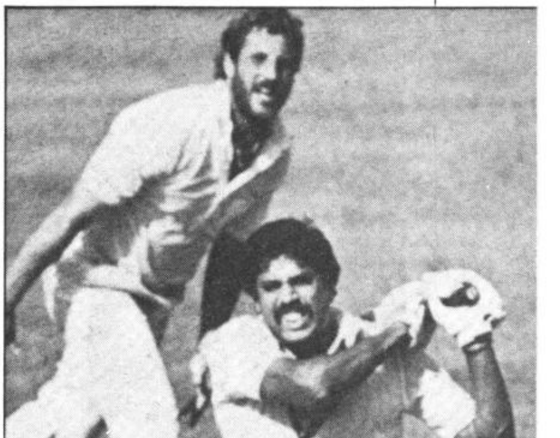

বথাম বনাম কপিল

৩০০-তম শিকার যথাক্রমে নিল হক (কট কাউড্রে), গ্যারি গিলমোর (কট জুলিয়েন) ও জেফ্ দুঁজো (কট ট্যাভারে)। হ্যাডলির শিকার বর্ডার হয়েছিলেন এল · বি· ডব্লিউ।

ব্যক্তিগত ৩০০-তম উইকেটটি পেতে বিপক্ষের ব্যাটসম্যানদের বোল্ড আউট করেছেন লিলি, উইলিস ও কপিল। এক্ষেত্রে তিন ব্যাটসম্যান হলেন যথাক্রমে জাহির আব্বাস, জেফ্ ক্রো ও রুমেশ রত্নায়েকে।

অদূর ভবিষ্যতে আরএকজন বোলার হয়তো ৩০০ উইকেট পেতে চলেছেন। এই মুহূর্তে ভারত সফরের দিকে তাকিয়ে আছেন ইমরান খান। ৩০০ উইকেটের ঘরে পৌঁছতে তাঁর প্রয়োজন আর মাত্র ১৮টি উইকেট। ইমরান হয়তো পারবেন। কিন্তু তারপর আবার কে ৩০০ উইকেট পাবেন, তা জানার জন্য আমাদের অনেক বছর অপেক্ষা করতে হতে পারে।

সত্যজিৎ রায়ের

এক অসামান্য সৃষ্টি

গোয়েন্দা ফেলুদা

এক আংটি-চুরির রহস্যভেদ করতে নতুন এক গোয়েন্দাকে এই সেদিন আমদানি করলেন সত্যজিৎ রায়। তুখোড়, মেধাবী, বুদ্ধিদীপ্ত সেই গোয়েন্দার ভালো নাম প্রদোষ মিত্র। ডাক নাম ফেলুদা। আর সেই নামেই তাঁর নাম-ডাক। সঙ্গে সহকারী তোপসে। ব্যস, সেই যে এলেন ফেলুদা, জয় করলেন, থেকে গেলেন।

'বাদশাহী আংটি'র পর কত-না রহস্যের জট খুললেন ফেলুদা। কত না নতুন-নতুন পটভূমিতে। এর মধ্যে কখন এসে জুটেছেন জটায়ু ওরফে লালমোহনবাবু। রহস্য কাহিনীর এই লেখকটি জুটে যাওয়ায় সোনায় সোহাগা। রহস্যের সঙ্গে মিশেছে কৌতুক, উৎকণ্ঠার সঙ্গে মজা। তিন বয়সী এই ট্রায়োর গল্প শুনতে উন্মুখ হয়ে থাকেন সব বয়সের পাঠককুল।

ফেলুদার রহস্য-অ্যাডভেঞ্চার :
বাদশাহী আংটি ১০·০০ গ্যাংটকে গন্ডগোল ১০·০০ সোনার কেল্লা ৮·০০ বাক্স-রহস্য ১০·০০ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ১০·০০ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ১০·০০ জয়বাবা ফেলুনাথ ১০·০০ ফেলুদা এন্ড কোং ১২·০০ গোরস্থানে সাবধান ১০·০০ ছিন্নমস্তার অভিশাপ ৮·০০ হত্যাপুরী ৮·০০ যত কান্ড কাঠমান্ডুতে ৮·০০ টিনটোরেটোর যীশু ১০·০০ ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু ১২·০০

আনন্দ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন : ৩১-৪৩৫২

বিশ্ব টেবিল টেনিসে এবার লড়াই হবে

এশীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে

রতন চক্রবর্তী

সাঁইত্রিশতম বিশ্ব টেবিল টেনিসের আসর এবার বসছে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে। ১৮ ফেব্রুয়ারি হবে এর উদ্বোধন। প্রতিযোগিতা চলবে পয়লা মার্চ পর্যন্ত। ২৪টি টেবিলে প্রায় ৭০টি দেশের ৭০০ জন প্রতিযোগী শীর্ষ বাছাইয়ের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবেন। প্রথম পাঁচদিন হবে দলগত প্রতিযোগিতা। তারপর হবে পুরুষ এবং মহিলাদের ব্যক্তিগত ইভেন্টগুলি। এর আগে দু'বার এই প্রতিযোগিতা হয়েছিল ভারতে। প্রথমবার ১৯৫২ সালে বোম্বাইয়ে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৭৫ সালে কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে।

গত বছর বিশ্ব টেবিল টেনিসের আসর বসেছিল সুইডেনের গোটেবার্গ-এ। যোগ দিয়েছিলেন ৯০টি দেশের ৫৯০ জন প্রতিযোগী। সেবারের প্রতিযোগিতায় চিনাদের ছিল একাধিপত্য। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের দলগত বিভাগেই চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল চিন।

ব্যক্তিগত বিভাগে, পুরুষ ও মহিলা দু'বিভাগেই ফাইনালে উঠেছিল চিনের চারজন খেলোয়াড়। পুরুষ বিভাগে কুড়ি বছরের কলেজ-ছাত্র জিয়াং জিয়ালিয়াং হারিয়েছিলেন তাঁর দেশের চেন লং কেনকে, তিন সেটে (২১-১৪, ২৩-২১ ও ২১-১৮)।

মহিলা বিভাগে চিনের আঠারো বছরের স্কুল-ছাত্রী কাও ইয়েন হুয়া হারান নিজের দেশেরই জেং লি গুয়ানকে ৩-১ সেটে (২১-১২, ২১-১৬, ১০-২১ এবং ২১-১৬)।

এই আসরে দলগত পুরুষ বিভাগে ভারত পেয়েছিল দ্বাদশ স্থান, আর মেয়েদের বিভাগে ভারতের স্থান ছিল উনিশতম। পুরুষদের দলগত বিভাগে ভারত সুইডেনের কাছে ৫-১ ম্যাচে হারলেও ভারতের সুজয় ঘোড়পাড়ে সুইডেনের বেংস্টন-এর কাছ থেকে একটি ম্যাচ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এবারের আসরে ভারতীয় দলে কারা থাকবেন, তা এই নিবন্ধ রচনার সময় জানা যায়নি। তবে ভারতীয়দের মধ্যে ভাল ফর্মে আছেন পুরুষদের বিভাগে কমলেশ মেহতা, অরুণজ্যোতি বড়ুয়া, সুজয় ঘোড়পাড়ে, এস· শ্রীরাম এবং মনমিত সিং।

মেয়েদের বিভাগে আছেন মোনালিসা বড়ুয়া, নিয়তি রায়, ভোম্মা পারিখ এবং লক্ষ্মী করস্থ। এঁদের মধ্যে থেকেই হয়তো চূড়ান্ত দল গঠন করা হবে।

বিশ্ব টেবিল টেনিসে চিন এবং সুইডেনের সাফল্য প্রশ্নাতীত। এদের চ্যালেঞ্জ জানাতে কোমর বেঁধে এবার প্রস্তুত হচ্ছে দুই কোরিয়া। ১৯৮৬-র সোল এশিয়াডে দক্ষিণ কোরিয়া চিনাদের নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিল।

অবশ্য কয়েকদিন পরেই চিনে এক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিযোগিতায়, কোরিয়ার এই চ্যাম্পিয়ান-দলকে চিনের বীররা বুঝিয়ে দিয়েছে, তারাই বিশ্বে সেরা।

সত্তরের দশকে বিশ্ব টেবিল টেনিসে এশিয়ার খেলোয়াড়দের একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল। এরপর ইউরোপীয়রা কিছু প্রাধান্য বিস্তার করলেও, বর্তমানে এশিয়ার খেলোয়াড়রাই এগিয়ে। চিন, দুই কোরিয়া, জাপান, যে-কোনও দেশকে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত। তাই এবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপে প্রধানত লড়াই হবে এশিয়ার খেলোয়াড়দের মধ্যে।

মোট কথা, টেনিস-দুনিয়ার রথী-মহারথীদের দুর্দান্ত সার্ভ, দুরন্ত স্ম্যাশ এবং অকল্পনীয় টপ স্পিনে মধ্য ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি জমজমাট হয়ে উঠবে। বিশেষ করে, সবার লক্ষ্য থাকবে চিনের ওপর। টেবিল টেনিসে চিন প্রতি বছরই নতুন নতুন খেলোয়াড় উপহার দেয় সারা বিশ্বকে। এবার তারা কী করে, সেটাই দেখার।

কলকাতায় নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে চিনের প্রখ্যাত খেলোয়াড় গুয়েহুয়া

রোভার্সের রয়
মেলচেস্টার রোভার্স
রোভার্স পেনাল্টি পেয়েছে । এগিয়ে এসেছে ডানকান ম্যাকে···
পেনির সঙ্গে রয়ের মিটমাট হয়েছে, কিন্তু দল দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে যাবার বিপদ এখনও কাটেনি । আজ রেডস্টোকের সঙ্গে খেলা । ভিতরে-বাইরে প্রচণ্ড ভিড় । মাঠের মধ্যে চিৎকার কিসের ? বাইরে জনতা উত্তেজিত ।
হুররে ! হুররে !
নিশ্চয় গোল হয়েছে !
আমরা এগিয়ে গেছি !
জয় রোভার্স !
আসলে গোলের ব্যাপার নয় । গোলের মুখে জটলার সময়···
হ্যান্ডবলের জন্যে পেনাল্টি !
শট নেবে ডানকান ম্যাকে !
কামানের গোলা !
এ-গোল কে আটকাবে ?
কিন্তু···
যাচ্চলে ! হল না !
যাঃ, জোর বাঁচিয়েছে তো !
তা হলে ?
আরে, ভয় কী, এখনও বিস্তর সময় রয়েছে !
আমরা খেলা দেখছি না, শুধু চেঁচাচ্ছি !
আকাশ থেকে সে এক আশ্চর্য দৃশ্য···
রোভার্স ! রোভার্স !
লড়ে যাও রোভার্স !
মেল-চেস্-টার ! মেল-চেস্-টার !
বাইরের লোকেরা ভিতরের চেয়েও বেশি চেঁচাচ্ছে···
চিৎকারের ঠেলায় ঘাবড়ে গেছে রেডস্টোকের ডিফেন্স···
যাচ্চলে !
রয়ের পায়ে বল !
গোল হতে পারে !

পরক্ষণে·
ঢুকে গেছে !
কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী এবারেও মুখ ফিরিয়ে নিলেন···
প্যাকো অফসাইড! রেফারির নজর এড়ায়নি !
গোল দিল না !
রোভার্স মরিয়া হয়ে আঘাতের পরে আঘাত হানছে !
মনে হচ্ছে, গোল হবে ...
কিন্তু নব্বুই মিনিটেও গোল হল না !
অথচ এক ডজন গোল হতে পারত !
হল না তো !
রেডস্টোকের ক্যাপ্টেন ডন জিভন্সও জানে, ভাগ্য তাদের আজ বাঁচিয়ে দিয়েছে···
আজকের ফর্মে তোমরা যে-কোনও দলকে হারাতে পারতে !
জানি ডন । প্রথম ডিভিশনে টিকে থাকাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল !
বেন গ্যালোয়ে যা বলল, তাও ভয়ের কথা ।
আমাদের উপরের টিমগুলো একটাও হারেনি । অর্থাৎ অবস্থা যথাপূর্ব !
মুশকিল !
সমর্থকদের কথা কিন্তু এত ঝামেলার মধ্যেও রয় ভোলেনি···
এ-রকম খেললে দ্বিতীয় ডিভিশনে নামব না ।
ঠিক কথা, রয় !
এমন খেলাই দেখতে চাই !
আমরা তোমার সঙ্গে আছি !
তা জানি !
এও জানি যে, ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিশনে নামলেও এরা আমাদের ছাড়বে না !
পরের সপ্তাহে লন্ডনে এফ· এ· কাপের পঞ্চম রাউন্ডের খেলা ! সমর্থকরা দল বেঁধে সেই খেলা দেখতে চলেছে···
আমরা এসে গেছি, কেলবার্ন !
LONDON 47
এফ· এ কাপ আমরা জিতবই !
জিতবই জিতব !
আগামী সংখ্যায় দারুণ চাঞ্চল্যকর সেই খেলা
(ক্রমশ)

ভূগোলের ভুল

তারাপদ রায়

আমি আর দাদা বোধহয় বছর-দুয়েক একসঙ্গে পড়েছিলাম, ক্লাস সেভেন আর ক্লাস এইট, খুব সম্ভব এই দুই ক্লাস। দাদা মোটেই পড়াশুনো তৈরি করে ক্লাসে আসত না। সারাদিন এ-পাড়া ও-পাড়ায়, খালে-বিলে, বন-বাদায় ঘুরে বেড়াত। কখনও শিমুল গাছে উঠে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিয়ে আসত লাল টকটকে ফুলের গুচ্ছ, কখনও শরবনের ভেতর থেকে খুঁজে-খুঁজে কুড়িয়ে আনত বুনো হাঁসের নীলচে ছোট-ছোট গোল-গোল ডিম।
ইস্কুলে, বাড়িতে এ-সব নিয়ে দাদা অনেক গালাগাল খেয়েছে, কিছু মারধোরও জুটেছে কপালে, কিন্তু দাদা মোটেই শোধরায়নি।
একদিন ব্যাকরণের ক্লাসে বিশিষ্টার্থক বাক্য রচনা শেখানো হচ্ছে, দাদা একটু দেরি করে ক্লাসে এল হাতে একটা গাছের ডাল, তাতে খুব ছোট ঝিরঝির ফুল, ফিকে রঙের। ক্লাসটিচার দাদাকে দেখে বললেন, "কী হে, তুমি যে একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছ।" দাদা তখন হাতের ভাঙা ডালটা দেখিয়ে বলল, "আমি নই স্যার, এই হল ডুমুরের ফুল। কবরখানার পিছনের মাঠ

থেকে পেড়ে আনলাম। ডুমুর গাছটা ছেয়ে আছে ফুলে।"
সত্যি-মিথ্যে জানি না, দাদার দৌলতে জীবনে সেই একবারই আমি এবং আমার সহপাঠীরা (মাস্টারমশাই সমেত), ডুমুরের ফুল দেখি। এর আগে বা পরে আর কখনও দেখিনি।
অবশ্য ডুমুরের ফুলের চেয়ে অনেক ভয়াবহ কাণ্ড ঘটেছিল ভূগোলের ক্লাসে। ভূগোলের মাস্টারমশাইয়ের স্বভাব ছিল গোলমেলে প্রশ্ন করায়। সেদিন কী কারণে দাদা প্রথম থেকেই ক্লাসে ছিল।
উলটোপালটা প্রশ্ন করতে করতে মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, "মাউন্ট এভারেস্ট আবিষ্কার হওয়ার আগে সবচেয়ে উঁচু পর্বতচূড়া কী ছিল?"
ক্লাসের ছেলেরা যে-যার বুদ্ধি ও জ্ঞান অনুযায়ী বলল, "আলপস", "কারাকোরাম", "কাঞ্চনজঙ্ঘা" ইত্যাদি। দাদা এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মাস্টারমশাইকে একদম বোকা বানিয়ে দিয়ে বলল, "আবিষ্কার হোক আর না হোক, তাতে কিছু আসে যায় না, মাউন্ট এভারেস্ট তো সব সময়েই ছিল। মাউন্ট এভারেস্ট আবিষ্কার হওয়ার আগেও সে ছিল সবচেয়ে উঁচু।"

ছবি : প্রবীর সেন

জানা-অজানা

বংশধারার গতির খোঁজখবর দেয় ফলের মাছি

সাধনা মুখোপাধ্যায়

গরম কালে পাকা কাঁঠাল ভাঙলেই ভন্ ভন্ করে কোথা থেকে নীল মাছি ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসে। মনে হয়, ওরা শূন্য থেকে উড়ে এল! এই মাছিদের 'ফলের মাছি' বলা হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ফলের মাছি দেখতে অনেকটা ঘরোয়া মাছির মতো—গায়ে কমলা ও কালো রঙের ছিটে। এই মাছি পাকা ফলের প্রধান শত্রু। আর এক রকম ছোট ছোট মাছি আছে, যারা ঘরে-রাখা পচা ফলের ওপর বসে। এই মাছিগুলো কিন্তু ফলের পক্ষে অতটা ক্ষতিকারক নয়। মেয়ে মাছিরা শুধু পচা ফলের ওপরই ডিম পাড়ে।

ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বেরোলে বাচ্চারা পচা ফলের গ্যাঁজলা খেয়ে বেঁচে থাকে। এরাও ফলের মাছি, এদের বৈজ্ঞানিক নাম 'ড্রসোফিলা'। বংশধারার গতি জানবার জন্যে এই মাছি খুব কাজে লাগে। এক বছরে এরা অন্তত ৩০টি বংশধারা সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের ৩০টি বংশধারা জানতে গেলে ৫০০ বছর সময় লেগে যায়।
ল্যাবরেটরিতে এই মাছির ডিম ফুটিয়ে ন'দিনের মধ্যেই তাকে বড় করে তোলা যায়। দশ দিনের মধ্যেই এরা ডিম পাড়তে পারে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই কয়েকটি ফলের মাছি মিলে পরীক্ষাগারে এত ডিম পাড়তে পারে যে, সেই ডিম থেকে একদিনের মধ্যেই নতুন প্রাপ্তবয়স্ক ফলের মাছির সংখ্যা পৌঁছে যায় হাজারে। এই সব মাছি একদিনের মধ্যেই এত বড় হয়ে যায় যে, খালি চোখেই এদের দেখতে পাওয়া যায়। বংশগতির বিবরণ নিয়ে এতদিন যেসব জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, তার অধিকাংশই পাওয়া গেছে পরীক্ষাগারে ফলের মাছির ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে

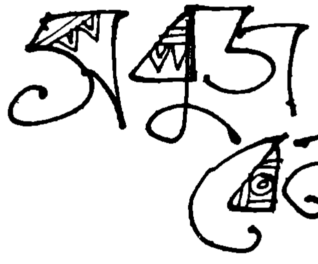

কৃষ্ণা বসু

অধীর আগ্রহে জানলার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল মহুয়া। বাবা আর মা'র ফেববার সময় প্রায় হয়ে এসেছে। বলে গেছেন তো পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটার মধ্যে নিশ্চয় ফিরব। বাড়িতে যে কাজ করে, সুধীরের পিসি, সে এর মধ্যে দু'বার বকুনি দিয়ে গেছে, "অত ছটফট করছ কেন? চুপ করে একটু এদিকে বোসো না। বাবা-মা যখন আসবে তখন তো জানতেই পারবে।"

সুধীরের পিসিকে বোঝানো যাবে না, মহুয়া কেন এত ছটফট করছে। বাবা আর মা নিউ মার্কেটে গিয়েছেন। মহুয়ার জন্য আজ একটা প্রেজেন্ট আসবে। কী প্রেজেন্ট তা অবশ্য মহুয়া জানে। না, না, ওর জন্মদিন-টন্মদিন কিছু নয়, আরও তিনমাস বাদে মহুয়ার পাঁচ বছরের জন্মদিন হবে। তখন তো অনেক ধুমধাম হবেই।

এটা একটু অন্য বাপার। বড় জেঠুর মেয়ে রঞ্জনাদির বিয়ে আসছে সপ্তাহে। মা বলছিলেন, "রঞ্জুর বিয়েতে ওকে একখানা ভাল শাড়ি তো দিতেই হয়। গয়নাই দেবার ইচ্ছে ছিল, তবে যা দাম!"

বাবা বললেন, "আজকালকার মেয়েরা গয়নার চাইতে শাড়িই বেশি ভালবাসে। তুমিও একটা নতুন শাড়ি পরবে নাকি? বউভাতে কী পরবে?"

এমন সময় বাবার চোখ পড়ল, কার্পেটের ওপর পা ছড়িয়ে বসে মহুয়া একমনে বাবা-মা'র বাক্যালাপ শুনছে।

বাবা বললেন, "মহুয়ার জন্য একটা ছোট বেনারসি পাওয়া যাবে না? বিয়ের দিন পরবে।"

মা বললেন, "শাড়ি কী সামলাতে পারবে? দু'খানা ফ্রক তো করিয়ে রেখেছি, একটা সাদার ওপর থাক্-থাক্ ফ্রিল আর একটা..."

এমন সময় মহুয়া বলে উঠল, "বাবা, আমি শাড়ি পরব।"

সেই শাড়ির প্রতীক্ষায় আজ গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে মহুয়া। তার জীবনের প্রথম শাড়ি।

ওকে সঙ্গে নিতেই চেয়েছিলেন বাবা-মা। মহুয়া নিজেই যেতে চায়নি। তার একটা বিশেষ কারণ আছে অবশ্য। গত সপ্তাহে ও বাবা-মা'র সঙ্গে ম্যাটিনিতে একটা ওয়াল্ট **ডিজনির** ছবি দেখতে গিয়েছিল। ফলে সেদিন ওর পাশের বাড়ির বন্ধু ব্রততী, মিত্রা, সামনের বাড়ির রুমা, আরও সব পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতে পারেনি।

পরদিন যখন খেলতে গেল, ওরা ওর সঙ্গে আড়ি করে দিয়েছিল, "কেন তুই কাল আসিস্নি? তোকে আর খেলায় নেব না।" মিত্রাটা খুব ঝগড়ুটে, ব্রততী বলেছিল, "নিয়ে নে না ভাই।"

ছলছল চোখে ফুলের বেডের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল মহুয়া। বাগানটা

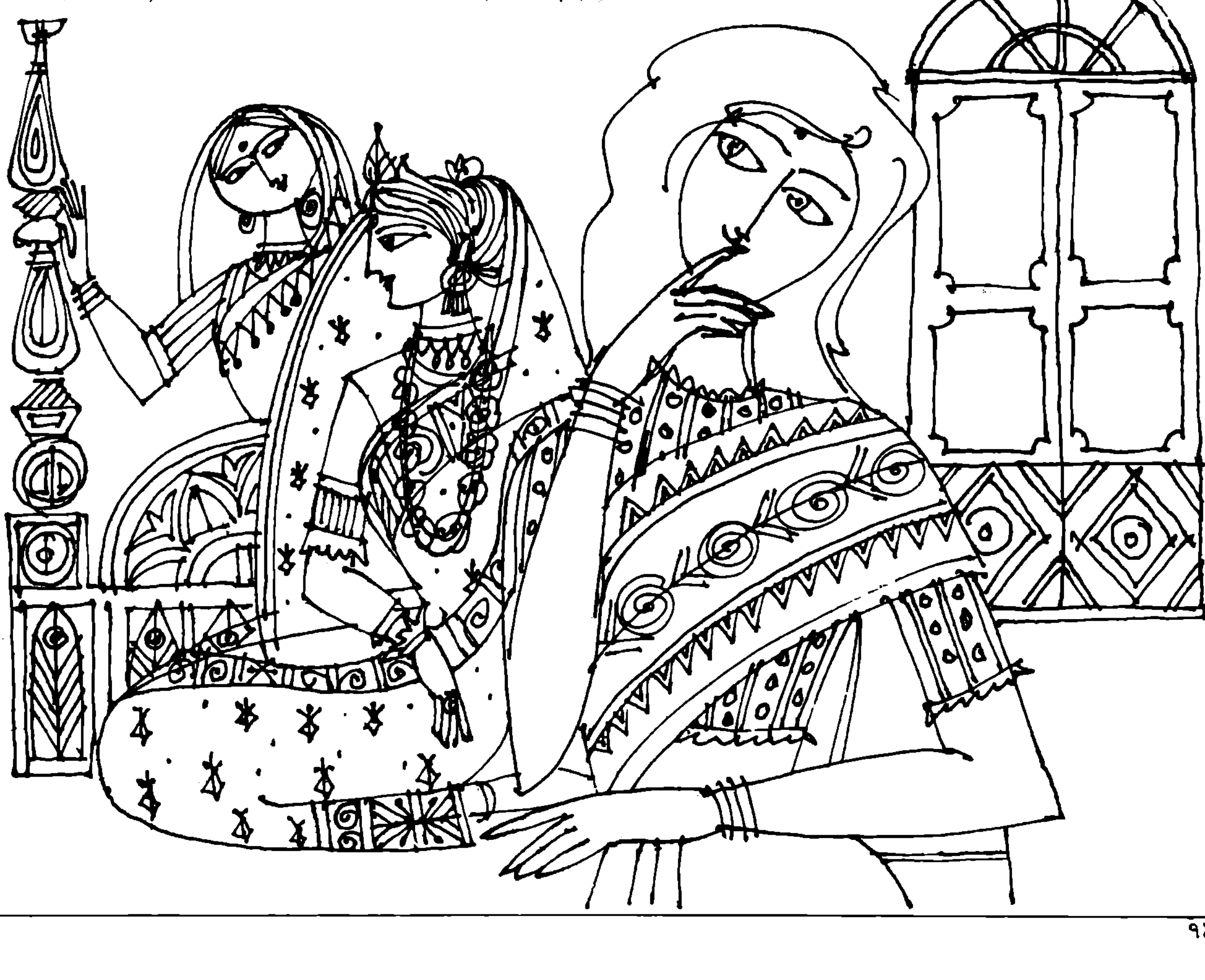

রুমাদের। রুমার মা মাসিমা হঠাৎ দক্ষিণের বারান্দা থেকে জিজ্ঞেস করলেন, "ও কী ! মহুয়া কোনায় একা দাঁড়িয়ে কেন ?" অমনি মহুয়ার চোখ দিয়ে ঝপঝপ জল পড়ে গেল।

মাসিমা নীচে নেমে এসে সব্বাইকে বকে দিয়ে গেলেন, "একদম ঝগড়া নয়, মিলেমিশে খেলো।" এই ঘটনার অল্পদিনের মধ্যেই আবার আড়ি হয়ে যাবার ঝুঁকি নিতে চায়নি মহুয়া।

তবুও আজ খেলায় ওর মন ছিল না একেবারে। কুমির-কুমির খেলায় চট্ করে কুমিরের হাতে ধরা দিয়ে বাড়িতে এসে জানলায় দাঁড়িয়ে আছে।

ট্যাকসি থেকে নামলেন বাবা-মা। সঙ্গে তিনটে শাড়ির বাক্স। মা'র হাতে দুটো, বাবার হাতে একখানা। বাবা যখন হাসিমুখে শাড়ির বাক্স খুলে একখানা সবুজ বেনারসি বার করে মহুয়ার চোখের সামনে মেলে ধরলেন, ওর মনে হল যেন স্বপ্ন দেখছে। এমন সুন্দর হালকা সবুজ রং। তাতে সাদা জরির পাড়, মাঝে সাদা বুটি। মহুয়া যেন রূপকথার রাজকন্যা হয়ে গিয়েছে।

রঞ্জনাদির বিয়েতে জেঠুর বাড়িতে মহা-উৎসব। আলোর মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে বাড়ি। রঞ্জনাদি দোতলার হল-ঘরে বসে আছে : কনের সাজে আর চেনাই যাচ্ছে না। কনের গা ঘেঁষে সন্ধে থেকে বসে আছে মহুয়া। সবুজ বেনারসির থেকে উঁকি দিয়ে আছে ওর ছোট-ছোট চুলে ঢাকা ফর্সা গোলগাল মুখ।

অতিথিরা এসে রঞ্জনাদিকে **উপহার** দিয়ে যাচ্ছেন নানারকম। রঙ-বেরঙের শাড়িও আছে তার মধ্যে। মেজদি, মানে অঞ্জনা একটা খাতায় উপহারের লিস্টি রাখছে। আর ছোড়দি অনন্যা মাঝে-মাঝে উঠে নতুন খাটের চারপাশে ঝুলিয়ে দিচ্ছে নতুন-নতুন শাড়ি। বাব্বা, কত শাড়ি !

মহুয়া ভাবল, আমার তো মোটে একটা। এমন সময়ে রাঙাদিদু অঞ্জনাদিকে আশীর্বাদ করতে এসে মহুয়ার গাল টিপে বললেন, "ওমা, তুই বুঝি শাড়ি পরেছিস ? চিনতেই পারিনি। বাবা দিয়েছে ? বেশ, বেশ। তারপর তোর যখন বিয়ে হবে, দেখবি কত শাড়ি পাবি। দেখছিস্ না, রঞ্জুর মতো।"

নতুন শাড়ির গন্ধ, ফুলের গন্ধ সব মিশে মহুয়ার মনে কে যেন মায়াজাল বিছিয়ে দিয়েছে।

বিয়ে শুরু হয়েছে। পণ্ডিতমশাই কী সব মন্ত্রটন্ত্র বলছেন। যজ্ঞের আগুন থেকে ধোঁয়া উঠে মহুয়ার চোখ জ্বালা করছে। তবুও ও কনের কোল ঘেঁষে বসে আছে।

কে যেন বলছে, ঘুমিয়ে পড়ল যে, ওকে তুলে নিয়ে যাও। অমনি জেগে উঠে মহুয়া প্রতিবাদ করল, "না, আমার ঘুম পায়নি।"

কিন্তু একটু পরে মা যখন এসে আধ-ঘুমন্ত মহুয়াকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন, তখন ও স্বপ্নের দেশে। সেখানে পরিরা সবুজ বেনারসি-পরা মহুয়াকে ডাকছে, 'এসো খেলবে ? আমরা কখনও আড়ি করি না।'

পরদিন সকালে সানাইয়ের করুণ সুরে ঘুম ভাঙল মহুয়ার। বেলা বাড়তে লোকজন আর হইচই বাড়তে লাগল। রঞ্জনাদির শ্বশুরবাড়ির লোকেরা দুপুরে খেতে এলেন। মহুয়া আজ সাদা থাক্-থাক্ ফ্রিল দেওয়া ফ্রকটা পরেছে। ও বাড়ির কে যেন বলল, "কী খুকুমণি, আজ বুঝি শাড়ি পরা হয়নি।"

বা রে, আর শাড়ি থাকলে তো পরবে। তবে মহুয়া মনে-মনে ঠিক করে ফেলেছে রঞ্জনাদির মতো ও শিগগিরই বিয়ে করে ফেলবে। তা হলে কত শাড়ি হবে ! তখন রোজ একখানা করে পরবে।

সন্ধে হয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িতে কেমন যেন একটা বিষাদের ছায়া নেমে এল। রঞ্জনাদির কলেজের বন্ধুরা মিলে ওকে সাজাচ্ছে, একটু পরেই বর-বউ রওনা হয়ে যাবে। বড়-জেঠিমা মাঝে-মাঝে আড়ালে গিয়ে চোখ মুছছেন। অঞ্জনা, অনন্যা, ছোট বোনেরাও একটু লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।

ছোটকাকা একবার ঘরে ঢুকে বললেন, "এ কী ! সকলে মিলে এরকম 'গোমড়াথেরিয়াম' হয়ে আছ কেন ? এটা বিয়েবাড়ি না আর কিছু ? গান ধরো, গান ধরো।"

কে যেন গাইতেও শুরু করল একটা কিছু, কিন্তু গান তেমন জমল না।

রব উঠল, "ওঁরা এসে গেছেন, নিতে এসে গেছেন। তাড়াতাড়ি করো।"

মাঝের ঘরে কার্পেটের আসনে বর-বউ বসবার পর সবাই একে-একে আশীর্বাদ করলেন। বড়-জেঠিমা আশীর্বাদ করেই সোজা নিজের শোবার ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। মহুয়ার মা তাড়াতাড়ি ওঁর পিছনে উঠে গেলেন।

রঞ্জনাদি তো বেশ শক্তই ছিল অনেকক্ষণ। কিন্তু গাড়ি-বারান্দায় গিয়ে মোটরগাড়িতে ওঠার সময় একেবারে ভেঙে পড়ল। গাড়ির দরজা থেকে ফিরে এসে বড়-জেঠুকে জড়িয়ে ধরে ফুলে-ফুলে সে কী কান্না। সবাই জানে জেঠু বড় মেয়েকে ভীষণ ভালবাসেন। বর বেচারা খুবই অপরাধী মুখ করে জড়োসড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। আর ছোট্ট মহুয়া অবাক হয়ে দেখছে রঞ্জনাদির কান্না। শেষে ছোটকাকা আর পিসিমণি এগিয়ে এসে পিঠে-টিঠে হাত বুলিয়ে তাকে গাড়িতে তুলে দিলেন। সবাই বাড়ির মধ্যে ফিরে গেলেন। বাড়িটা কেমন খাঁখাঁ করছে। ছোটকাকা নানারকম মজার গল্প বলে সকলকে হাসাবার বৃথা চেষ্টা করছেন। থমথমে ভাবটা কিছুতে কাটছে না। মহুয়ার মা বিছানায় বসে হাতপাখা দিয়ে বড়-জেঠিমাকে হাওয়া করছেন। লোডশেডিং না, কিচ্ছু না, মাথার ওপর পাখা ঘুরছে, তবুও···। বড়রা মাঝে-মাঝে উলটোপালটা কাজ করতে ভালবাসেন। খাট ঘিরে আত্মীয়-পরিজনেরা খুব বিরস মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

মহুয়া ভিড় ঠেলে তার মায়ের কাছ ঘেঁষে বসল। মা হঠাৎ চমকে বললেন, "ও মা, তোর মুখটা শুকনো কেন ? খিদে পেয়েছে বুঝি ? ও অঞ্জনা, তত্ত্বর থালা থেকে ওকে একটা সন্দেশ তুলে দে তো।"

মহুয়া মৃদু গলায় বলল, "না, আমার একটুও খিদে পায়নি। আমি শুধু তোমাকে একটা কথা বলব।"

"কী কথা রে ?"

"কানে-কানে বলব মা।"

মা মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে বললেন, "বলো, কী ? কিছু তো শুনতে পাচ্ছি না, আর-একটু জোরে বলো।"

মা'র গলা জড়িয়ে ধরে মহুয়া কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস্ করে বলল, "মা, আমি না কক্ষনো বিয়ে করব না। বাবা তো আমাকে একটা শাড়ি দিয়েছেই।"

তাই না শুনে মা হেসে উঠে বললেন, "শোন শোন, মহুয়া কী বলছে !" অমনি সকলে মিলে 'মহুয়া কী বলছে, কী বলছে' বলে কলরব করে উঠল। 'ওমা তাই নাকি। মহুয়া না বলেছে, বাবা তো একটা শাড়ি দিয়েছেই।' ঘরসুদ্ধু হাসির ঢেউ বয়ে গেল।

মহুয়া তো অপ্রস্তুত। একটু রাগও হচ্ছিল। এমন একটা গুরুতর বিষয় ও মা'কে বলল, তাতে এত হাসাহাসির কী আছে ?

তবে বড়-জেঠিমা যখন চোখ মুছে উঠে বসে হাসিমুখে ওকে কোলে তুলে নিলেন, তখন মহুয়া ভাবল যাক্‌গে যাক্, ছোটকাকু তো কখন থেকে চেষ্টা করেও কাউকে হাসাতে পারছিল না, এখন সব পালটে গেছে, সবাই কেমন হাসিখুশি !

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

টিভি অনুষ্ঠানের শুরুতে 'দূরদর্শন' কথাটি বাংলায় লেখা হয় না

ভাষা আমাদের পক্ষে বেশ বড় একটা সমস্যা। আমাদের ঘরে যে টিভিটি আছে, তাতে কলকাতা এবং দিল্লি থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলিই শুনতে পাই, দেখতে পাই। কেউ কেউ বাংলাদেশের টিভির অনুষ্ঠানও দেখতে পান। ঢাকা থেকে মাত্র দুটি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। বাংলাদেশে ভাষা সমস্যা নেই বলেই এটা সম্ভব। ওঁরা হয় বাংলায় অনুষ্ঠান করেন, নয় ইংরেজিতে। এদিকে, আমাদের মুশকিল হল আমাদের তো তিনটে ভাষা। সময় তো সেই কয়েক ঘণ্টা, এর মধ্যে রবিবারে সংবাদের কয়েক মিনিট ছাড়া বাংলা অনুষ্ঠান প্রচারই হয় না। সোম থেকে শুক্রবার মোটামুটি আড়াই ঘণ্টা বাংলা অনুষ্ঠান দেখানোর কথা। এই আমাদের বরাদ্দ। তাও এক-একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি। এই সময়ের মধ্যেও হিন্দি এসে হানা দিচ্ছে। মাঝে-মাঝে ইংরেজিও।

সেদিন একটি অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীকে দীর্ঘ সময় ধরে বাঙালি শ্রোতাদের কাছে হিন্দিতে সাক্ষাৎকার দিতে দেখে অদ্ভুত লাগল। আবার দ্যাখো, টিভি অনুষ্ঠানের শুরুতে 'দূরদর্শন' কথাটিও বাংলায় লেখা হয় না। অদ্ভুত ব্যাপার তাই না ? সেদিন একটি নৃত্যসহ রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুন্দর অনুষ্ঠানে 'অদ্ভুত রস' লেখা হল 'উ' কার দিয়ে। টিভি-তে যাঁরা শিল্পীকে নির্দেশ দেন, তাঁরা একবার তো অভিধানটা দেখে নিতে পারেন ? যে-বানান লক্ষ লক্ষ লোকের চোখে পড়বে সেই বানানের দিকে নজর না দেওয়া মোটেই কাজের কথা নয়। এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা বলা দরকার। 'গল্ফ গ্রিন' কথাটিতে মূর্ধন্য ণ-এর প্রয়োজন কোথায় ? এর পর আসি আর একটি বিষয়ে। সেদিন দর্শকের দরবারে বর্ধমান থেকে একজন 'দর্শক'-এর চিঠির বক্তব্য থেকে জানা গেল। ওঁরা বর্ধমানে কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান দেখতে পান না ভাল করে। অথচ দিল্লি থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলি স্পষ্ট

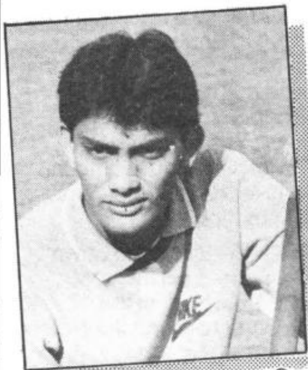

আজহারউদ্দিন

দেখতে পান। এও এক আজব ব্যাপার, নয় কি ? যেখানে ঢাকার অনুষ্ঠান কলকাতা থেকে এবং পশ্চিমবাংলার বহু জায়গা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, সেখানে এই পশ্চিমবাংলারই একটি জেলা থেকে—যেটা কলকাতা থেকে খুব দূরেও নয়, সেখান থেকে কলকাতার অনুষ্ঠান দেখতে কষ্ট হয়, এটা বড় দুঃখের ব্যাপার। এরকম আরও অনেক জায়গা আছে বলে শুনেছি। এসব কি করা যায় না যে যেখানে থাকুক না কেন সমস্ত রাজ্যের প্রোগ্রামই সেখান থেকে দেখা যাবে ? সেটা হলে বড় ভাল হয়।

আজ আরও একটা কথা নিয়ে আলোচনা করি। বাংলা ভাষায় প্রচারিত বহু অনুষ্ঠানেই দেখি, ইংরেজি অক্ষরে সেটা লেখা। বাংলা হরফগুলি বাঙালিরা দেখতে পান না। 'সাপ্তাহিকী'-তে ঘোষক বা ঘোষিকা বাংলায় বলে যান, আর ইংরেজি হরফে 'ভিজুয়াল' চালানো হয়। বুঝতে পারি, এটা বাংলা যাঁরা জানেন না তাঁদের সুবিধের জন্য করা হয়। কিন্তু যাঁরা বাংলা জানেন তাঁদের জন্য কেবলই কথা। একই কাগজে দুটি হরফেরই স্থান হতে পারে বোধহয়। আর এই সঙ্গে এটাও বলি, হরফগুলি লেখার জন্য ভাল শিল্পীর অভাব থাকে কি কলকাতায় ? অধিকাংশ সময়েই লেখায় থাকে পরিকল্পনার অভাব, এবং অযত্নের ছাপ। একটা দায়সারা কাজ বলে মনে হয়। কলকাতা বাঙালিদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সেখান থেকে পরিকল্পনাহীন এবং রুচিহীন ভিজুয়াল দেখানোর কোনও কারণ খুঁজে পাই না। একেবারে ছাপার অক্ষরে প্রচার করলেই সবচেয়ে ভাল হয়, তবে এ-ব্যাপারে বিশিষ্ট শিল্পীদের পরামর্শ নেওয়াই বোধহয় সঙ্গত।

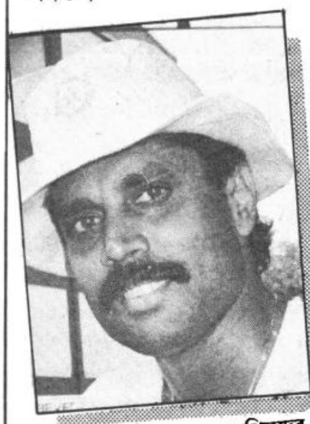

কপিলদেব

এবারে অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনার সময় কম পাচ্ছি। ৭ ডিসেম্বর শার্লক হোমসের 'দি ফাইনাল প্রবলেম' হয়ে গেল। বোধহয় সিরিজটাই শেষ হয়ে গেল। কোনও ঘোষণা না থাকায় 'বোধহয়' কথাটি ব্যবহার করতে হল। ১১ ডিসেম্বর অজয় চক্রবর্তীর পরিচালনায় গান শেখানোর আসর এককথায় চমৎকার। ৮ ডিসেম্বর দেখলাম দেশ-বিদেশের খেলা। নিয়মিত এই অনুষ্ঠানটি বেশ চমৎকার হচ্ছে। ১১ ডিসেম্বর দুপুরে ম্যাকবেথ নিয়ে ইউ· জি· সি·-র অনুষ্ঠান বেশ শিক্ষণীয় ছিল। তোমরা সুযোগ পেলে এই অনুষ্ঠানগুলি দেখবে। সবগুলি অবশ্য সকলের জন্য নয়। এবারে একটি আলোচনার উল্লেখ করি। কলকাতা নিয়ে আলোচনা করলেন সমর বসু, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, শ্রীমতী লীনা চক্রবর্তী এবং অচিন্ত্য সরকার। এঁরা প্রত্যেকেই কলকাতার উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। আলোচনা খুবই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল সমর বসুর সরস মন্তব্যে। এর সঙ্গে যেসব স্থিরচিত্র দেখানো হল, সেগুলির পরিচয় অবশ্য কেউ দিলেন না। প্রায়ই দেখা যায়, দূরদর্শনের অনুষ্ঠানে হঠাৎ-হঠাৎ কিছু দেখানো হয়, কিন্তু সেগুলির কোনও পরিচয় দেওয়া হয় না। একই ছবি বহুবার দেখানো হয়ে থাকে, অথচ কিছুই বলা হয় না। এটি পরিচালকদের পক্ষে খুব প্রশংসনীয় কাজ নয়। অনেক সময়েই মূল ছবিটি কখন তোলা হয়েছিল তাও বলা হয় না। কানপুরের ক্রিকেট ম্যাচ দেখলাম। গাওস্কর, আজহারউদ্দিন এবং কপিল দেবের সেঞ্চুরি ছাড়া আর কোনও উত্তেজনা ছিল না। অবশ্য এজন্য দূরদর্শনকে দায়ী করা যায় না। ভাল লাগল ২২ ডিসেম্বরে দেশ-বিদেশের খেলায় বিমান-মডেল প্রতিযোগিতা, এটা ছিল জাতীয় তৃতীয় প্রতিযোগিতা। অসাধারণ সব দৃশ্য দেখা গেল। প্রবীণ চিত্র-পরিচালক, নাট্য-পরিচালক, সঙ্গীতকার এবং আরও অনেক গুণের অধিকারী হীরেন বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানটি সুপরিচালিত হয়েছে। পুরনো আমলের একটা আমেজ ছিল সেদিনের অনুষ্ঠানে।

দিগ্‌দর্শক

কেন অসুবিধা হয়

চম্বলের ক্লাসের সদাশিব মণ্ডলের মেজোকাকা বিলেতে ডাক্তারি করেন। বাবা-মা'র সঙ্গে সদাশিব সেখানে বেড়াতে গিয়েছিল। সেদিন ক্লাসে সে তার বেড়ানোর গল্প করছিল। কথায়-কথায় সে ও-দেশের সাধারণ লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলার অসুবিধার প্রসঙ্গ তুলল।

"Much of the time," he was saying, "it was difficult for me to understand them. They were talking in English, of course, but it all sounded unfamiliar to my ears."

Chambal made a suggestion.

"Let's ask our English teacher today why it was so."

And Chambal did.

Mr. Rao, the English teacher, appeared to like the question.

"Yes," he said, "it's a common experience among people visiting foreign countries. You know their language, but you've learnt it in the class-room. In the class-room the language is

spoken clearly, in a systematic way, in neat, orderly sentences. But people do not ordinarily talk like that. They are often indistinct, and slur over parts of words. They begin a sentence and leave off in the middle."

Mr. Rao opened his bag and took out a magazine. "Here, in this magazine there's an article on this subject. The writer describes the kind of experience a foreigner may have in England.

In the class-room this is the kind of English you learn:

Philip: Excuse me.

Man: Yes?

Philip: Can you tell me the way to the Hotel International?

Man: Certainly. Go down the street past the post office, turn left at the cross-roads, and the Hotel International is on your right.

But in real life, in England, this is what you'll probably hear:

"Er, well, you see, I, er, don't know this area very well. Um...let me see now. Second left, third right. That's right. Then at the roundabout, er...you come to a roundabout, you see, and then, well, I think you'd better ask again."

প্রসাদ

নাবাল... আউশ...

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্ধেক চাষ—একথা আমরা সবাই বিশ্বাস করি। কিন্তু 'আমরা যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না।' সেই কারণেই আমাদের কৃষিলক্ষ্মীর এত দুরবস্থা। নীচের শব্দগুলি চাষবাসের ব্যাপার নিয়ে। শব্দগুলির প্রতিটির পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **নাবাল**—(ক) পতিত জমি, (খ) নিচু জমি, (গ), মাঠ, (ঘ) উঁচু চাষের জমি।

২। **উড়ি ধান**—(ক) বীজধান, (খ) উড়িষ্যার ধান, (গ) যে-ধান হাওয়ায় উড়ে পড়ে যায়, (ঘ) উড়ে পড়া বীজের ধান।

৩। **খিল জমি**—(ক) ঢালু জমি, (খ) কঠিন মাটির জমি, (গ) পতিত জমি, (ঘ) উর্বর জমি।

৪। **আউশ**—(ক) বর্ষাকালের ধান, (খ) হেমন্তের ধান, (গ) শালি ধান, (ঘ) বোরো ধান।

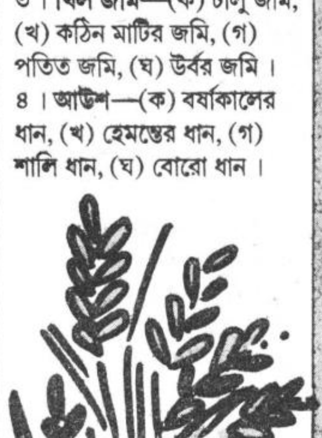

৫। **হাজাশুখা**—(ক) রুক্ষ-শুষ্ক, (খ) বৃষ্টি বা রোদ না পেয়ে নষ্ট, (গ) অতিবৃষ্টি বা রোদে নষ্ট, (ঘ) জলকাদায় ভরা।

উত্তর : ১। নাবাল—(খ) নিচু জমি। এই জমিতে চারদিক থেকে বৃষ্টির জল গিয়ে জমে এবং বছরের অধিকাংশ সময়ই জল থাকে। তার ফলে আমন ধান খুব ভাল হয়। যেমন, 'একটা নাবাল জমির ধারে বিশাল বটগাছ' (বিভূতিভূষণ)। ২। উড়ি ধান—(ঘ) উড়ে পড়া বীজের ধান। অকর্ষিত জমিতে উড়ে এসে পড়া বীজে এক ধরনের বন্য ধান। উড়কি ধান এর অন্য নাম। যেমন, 'উড়ি ধানের খেতে বক বসিয়া আছে।' (বিভূতিভূষণ)। ৩। খিল জমি—(গ) পতিত জমি। যেমন, 'দরকার হইল ফাল, খিল ভূমি লেখে লাঙ্গল।' ([illegible])। ৪। আউশ—(ক) বর্ষাকালের ধান। আশু অর্থ শীঘ্র। উচ্চারণের বিপর্যয়ে আশু হয়েছে আউশ। এই ধান শীঘ্র পাকে তাই আশু ধান্য বা আউশ ধান। যেমন, 'আউশের খেত জলে ভর-ভর' (রবীন্দ্রনাথ)। ৫। হাজাশুখা—(গ) অতিবৃষ্টি বা রোদে নষ্ট। হাজা মানে জলে ভিজে নষ্ট, শুখা অর্থ শুকনো। যেমন, 'সেটা নিতান্তই হাজাশুখা পতিত জমির চেহারা।' (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)।

দেবু-সেনাপতি

খাওয়াদাওয়ার কথা

বিস্তর চিঠি পাচ্ছি তোমাদের কাছ থেকে। বুঝতে পারছি, লেখাগুলো কাজে লাগছে। তোমরা অনেকে অনেকরকম রোগের কথা লিখেছ, নিশ্চয়ই সেগুলোর উত্তর দেওয়া হবে। বিশদভাবে না হলেও, সংক্ষিপ্ত উত্তর পাবে। অনেকে ওষুধের কথা জানতে চেয়েছ, কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, অকারণে ওষুধ খাওয়া ঠিক নয়। রোগ হলে ওষুধ তো খাবেই কিন্তু যাতে রোগ না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা অনেক বেশি দরকারি। স্বাস্থ্য কী করে ভাল রাখতে হয়, এ-কথা শুধু তোমাদের জানলেই হবে না, যারা জানে না, তাদেরও জানাতে হবে।

আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, আর আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে শর্করা বেশি থাকে, যাকে ইংরেজিতে বলে কার্বোহাইড্রেট। ভাত বা রুটি যাই খাই না কেন, আসলে কার্বোহাইড্রেট খাচ্ছি। ভাত হল স্টার্চ, আর রুটি হল ডেক্সট্রিন।

এবার খাবার কথায় আসা যাক। যেখানে বসে খাবে,তা সে মাটিতেই হোক বা টেবিলেই হোক, সেখানটা খুব পরিষ্কার হতে হবে। খেতে বসে বেশি কথা বলবে না। কথা না বলতে পারলে ভাল হয়, কারণ আমরা যখন চিবিয়ে খাদ্যমণ্ড গিলি, তখন সেই মণ্ড অন্ননালী (ইসোফেগাস) দিয়ে পাকস্থলীতে যায়। এই সময় একটা ঢাকনি শ্বাসনালীর (ল্যারিংস) মুখ ঢাকা দিয়ে রাখে। কথা বলার সময় ঢাকনিটা খুলে যায়, আর বাতাস শ্বাসনালীতে ঢুকে কণ্ঠস্বর ফুটে বেরোয়। খাবার সময় যদি কথা বলি তা হলে খাবার শ্বাসনালীতে ঢুকে যেতে পারে। সামান্য পরিমাণে ঢুকলে কাসি বা বমি হয়ে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু শক্ত খাবার বা অনেকটা খাবার ঢুকে গেলে ভয়ঙ্কর বিপদ হতে পারে, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে।

একেবারে প্রথমে খাওয়া শুরু করার আগে, তেঁতো খাওয়া উচিত। উচ্ছে, করলা, নিমপাতা ভাজা, যাই হোক না কেন, খেতে পারলে ভাল হয়। প্রথমেই তেতো খেলে মুখের মধ্যে লালাগ্রন্থিগুলি (স্যালিভারি গ্ল্যান্ডস) আছে, সেগুলি উত্তেজিত হয়ে ওঠে, মুখের মধ্যে অনেক বেশি লালারস আসে।

এরপর ফুটনো গাওয়া ঘি বা মাখন দিয়ে ভালভাবে ভাত মেখে খেও। ভালভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। মুখে দিয়েই গিলে ফেলবে না। ভাতের দলা যত চিবোবে লালারস তত বেশি ভাতের সঙ্গে মিশবে। লালারসের মধ্যে আছে টায়থিন বলে একরকমের এনজাইম। এই এনজাইম পলি-স্যাকারাইডকে ভেঙে ডাইস্যাকারাইড করে। হজমের প্রাথমিক কাজ মুখেই শুরু হয়, সেজন্য ভাত বা রুটি যত চিবোবে, তত বেশি হজম হবে। ভালভাবে চিবোলে দেখবে খাবার মণ্ড পিচ্ছিল হয়ে গেছে, কারণ লালারসের মিউসিন খাবারের সঙ্গে ভালভাবে মিশেছে। গিলতে তখন আর অসুবিধে হবে না। পাকস্থলীর জারক রসে হাইড্রোকলিক অ্যাসিড আছে, এ-কথা সকলেই জানো। অ্যাসিড মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট হজম হয় না। ঘি বা মাখনের প্রলেপ থাকলে অ্যাসিডের কাজ হতে একটু দেরি হয়, ফলে ভাত বা রুটির হজম আরও খানিকটা এগিয়ে যায়।

তারপর খাবার মধ্যপর্ব। এই পর্বে ডাল, তরকারি, যারা আমিষাশী তারা মাছ, ডিম, মাংস, যারা নিরামিষাশী তারা ছানার তরকারি, ছোলার তরকারি, সয়াবিনের তরকারি, ভাত দিয়ে মেখে খাবে। এই সময় যে ঋতুতে যে শাক হয়, সেই শাক খাবে। ডাঁটা চিবিয়ে চিবিয়ে তার রস খাবে। ডাঁটা চিবোলে লালারস বেশি তৈরি হবে, আর দাঁত শক্ত হবে। সজনে ডাঁটার রস তো অনেক জীবাণু মেরে ফেলে। এই সময় যা খেলে, সবই প্রায় প্রোটিন। প্রোটিনের হজম পাকস্থলী এবং অন্ত্রে হয়। স্নেহ-পদার্থ বা চর্বিজাতীয় খাদ্যও পাকস্থলী ও অন্ত্রে হজম হয়। অন্ত্রে যাবার পর যকৃৎ থেকে পিত্ত এবং অগ্ন্যাশয় বা প্যানক্রিয়াস থেকে জারক রস অন্ত্রে আসে। অন্ত্রের জারক রসের সঙ্গে মিশে এই রসগুলি আমাদের খাওয়া সবরকমের খাবারই হজম করিয়ে দেয়। অনেকে শেষ পাতে দই বা টক খায়। এ-ধরনের খাবার অন্ত্রে পৌঁছে অন্ত্রের ফ্লোরাগুলিকে সতেজ ও সক্রিয় করে তোলে, ফলে আমাদের হজম ভাল হয়।

কখনও তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ি করে খেতে নেই। পড়াশোনা যেমন মনোযোগের সঙ্গে করতে হয়, খাওয়াদাওয়া তেমনি।

(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায়

দূরপাল্লার

সাথী

বোরোলীন কাটাছড়া, ব্রণ, ফুসকুড়ি, ফাটা ও শুকনো চামড়ার ইনফেকশন সারিয়ে তোলে। বোরোলীনের অ্যান্টিসেপটিক গুণ ত্বককে সুরক্ষিত রাখে।

এটি প্রসাধন সামগ্রী নয়

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম বোরোলীন

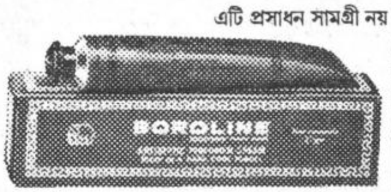

সাধারণ কাটাছড়ায় অসাধারণ কাজ দেয়

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস

Response

সেজোদাদু সেদিন আমাদের সঙ্গেই গিয়েছিলেন ডায়মণ্ড হারবারে। ওখানেই আমাদের পারিবারিক পিকনিক ছিল এবার। জায়গাটা একেবারে সমুদ্রের ধারে। সেখানেই সেজোদাদু আবিষ্কার করেন তাঁর পুরনো এক বন্ধুকে। আর সেই বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে এসে সেজোদাদু যা বললেন, তাতে দিব্য একটা ধাঁধা হয়ে যায়। তবে তফাত এই যে, ব্যাপারটা বানানো নয়, সত্যিকারের মানুষজন সম্পর্কে এমন কিছু খবর, যা আসলে সুন্দর একটি ধাঁধার উপাদান। কথাগুলো সেজোদাদু যেভাবে বলেছিলেন, সেভাবেই বলি বরং।

"প্রসাদের সঙ্গে এভাবে যে পিকনিকে এসে দেখা হয়ে যাবে, ভাবতেই পারিনি। সেই প্রসাদ, আমাদের সময় ইন্টার-কলেজ ডিবেট চ্যাম্পিয়ান। অনেক কথা হল। ওর কাছেই খবর পাওয়া গেল আমাদের আর-এক বন্ধুর। চম্পকের। চম্পক তখন কবিতা লিখত। এখন ছেড়ে দিয়েছে। জামালপুরে থাকে। রেলের মস্ত অফিসার। চম্পকের তিন ছেলে। চম্পকের এক ছেলে থাকে দিল্লিতে। খুব ভাল ক্রিকেট খেলে। ওদের ক্রিকেট টিমেই প্রসাদের ভাইপো রয়েছে। চম্পকের তিন ছেলেই খেলাধুলো নিয়ে আছে। একজন ক্রিকেট খেলে, একজন ফুটবল, আর টেনিস খেলে একজন। নামগুলো বেশ মিলিয়ে রেখেছে চম্পক। কবির ছেলে তো, তাই একজন চন্দন, একজন নন্দন, একজন স্পন্দন। তিনজন থাকে তিন শহরে। দিল্লি-বোম্বে-মাদ্রাজে।

"চন্দন দিল্লিতে নেই। নন্দন বোম্বেতে নেই। যে-ছেলেটি ফুটবল খেলে সে মাদ্রাজে থাকে না। ক্রিকেট যে খেলে তার নাম নন্দন নয়।"

সেজোদাদুর গল্প আর বলে লাভ নেই। এবার তোমরা বলো, চম্পকবাবুর কোন্ ছেলে ফুটবল খেলে, আর কোথায় থাকে? এটাই প্রথম ধাঁধা।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ দুটি ভারতীয় মুদ্রায় আমার হাতে রয়েছে ৫৫ পয়সা। এর মধ্যে একটি মুদ্রা আধুলি নয়। আমার হাতে কী কী মুদ্রা রয়েছে?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়ালেই সত্যজিৎ রায়ের বই। কী বই?

যখছিটছোলামন

গতবারের উত্তর ॥ (১) (ক) YESTERDAY (খ) CRITIC (গ) MINIMUM (ঘ) EAGLE (ঙ) OSLO (চ) REAR (ছ) LAYREL (২) সব থেকে বেশি তোলা যায় সাতটি পুঁতি। (৩) মেহেরবানি।

সত্যসন্ধ

হাসিখুশি

"আপনারা কি লাইফ সাইজ ছবি তৈরি করেন?"

"হ্যাঁ স্যার। ওটাই তো আমাদের বিশেষত্ব।"

"ঠিক আছে, আমাকে হুগলি নদীর একটা ছবি করে দেবেন।"

"শুনলাম, বাংলার মাস্টারমশাইয়ের কাছে তুমি খুব বকুনি খেয়েছ?"

"হ্যাঁ মা। মাস্টারমশাই আমাকে 'অলসতা'র উপর প্রবন্ধ লিখতে দিয়েছিলেন। আমি সাদা খাতা জমা দিয়েছি।"

"গল্পটা তিরিশ পাতা পর্যন্ত মোটামুটি ভালই লিখেছি। এবার এটা কী করে শেষ করা যায় বলো তো?"

"একটু উঠে গিয়ে দ্যাখো না, মা বোধহয় উনুন ধরিয়েছে।"

"আপনাদের রেস্তরাঁর ম্যানেজার তো দেখছি ভয়ঙ্কর লোক।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, যা বলেছেন। আমাদের রেস্তরাঁর খাবারের মতোই।"

ছবি : প্রবীর সেন

মজার খেলা

তিনটে দশ পয়সা আর তিনটে পাঁচ পয়সা আগে থেকে জোগাড় করে রাখতে হবে এবারের মজার খেলার জন্য। কেননা, আজকাল খুচরো পয়সার যা আকাল, তাতে চট করে কেউ দিতেও পারবে না হয়তো। সুতরাং নিজের কাছে পয়সা ছ'টা রেখে দেওয়াটাই সুবিধাজনক।

যা হোক, পয়সা রয়েছে, বন্ধুরাও হাজির, এই অবস্থায় পয়সা ছ'টাকে নীচের ছবির মতো করে টেবিলে সাজাও—

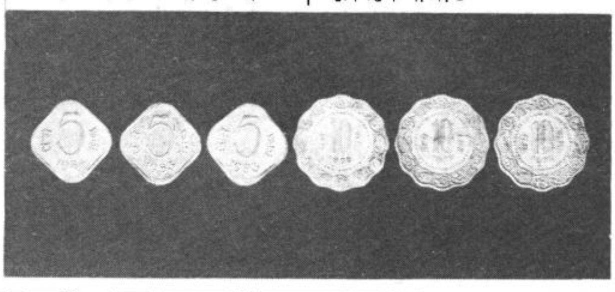

একদিকে পরপর তিনটে পাঁচ পয়সা, অন্যদিকে দশ পয়সা তিনটে পরপর।

এবার কোনও বন্ধুকে বলো, দুটো পয়সাকে জায়গা বদল করিয়ে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে টেবিলে পাঁচ পয়সা ও দশ পয়সা থাকে পালাক্রমে। অর্থাৎ পাঁচের পর দশ, তারপর পাঁচ, ফের দশ, এইভাবে। সময় মাত্র দু'মিনিট।

ব্যাপারটা কিন্তু শক্ত নয়। তবে দু'মিনিটের মধ্যে সমাধানটা মাথায় খেলে কি না সেটাই দেখার।

তুমি নিজেই করে দ্যাখো না। না পারলে তো সমাধান রইলই—

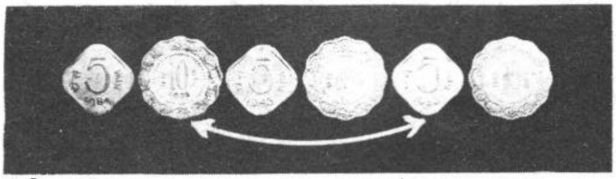

কোন্ দুটো পয়সা জায়গা বদলাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ। কী, সহজ নয় এই মজার খেলাটা?

মজারু

নিজেই আঁকো আগে

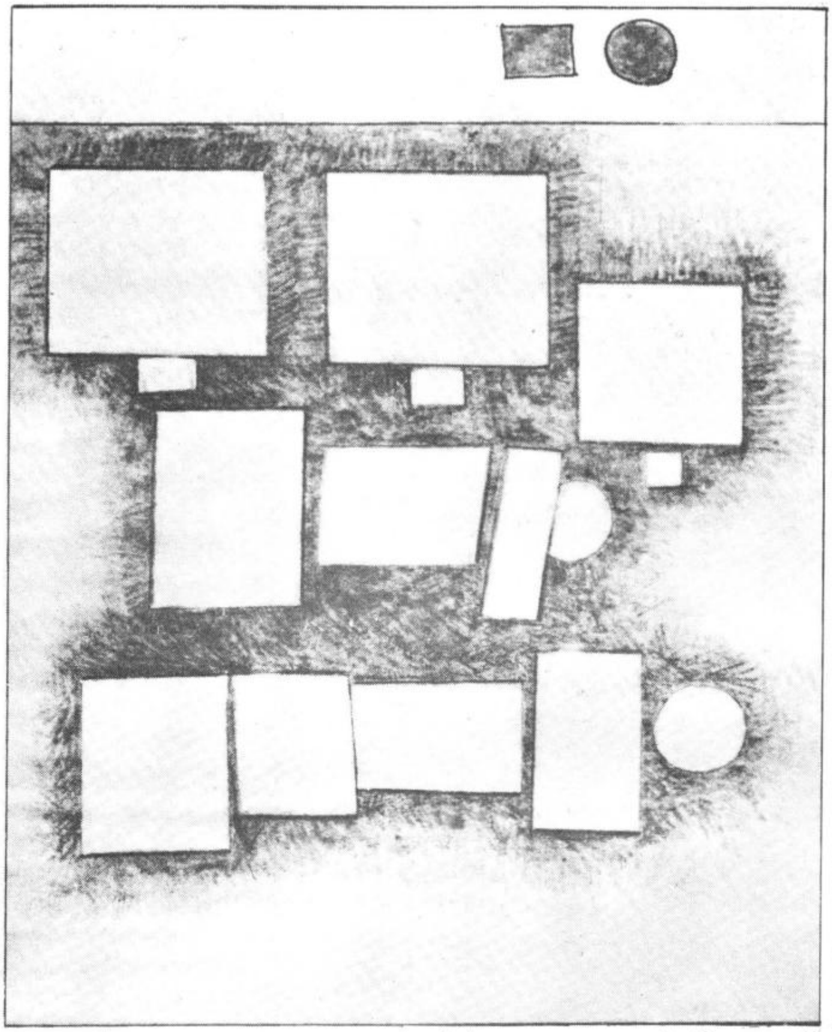

এবারের চৌকোর সমাবেশ লক্ষ করো, কেমনভাবে ছড়িয়েছিটিয়ে সব পড়ে আছে। দেখে মনে হয়, কারও সঙ্গে কারও সম্পর্ক নেই। কিন্তু প্রত্যেকটিই হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ ছবিরই অংশ। এরা সবাই মিলে আগামী সংখ্যায় নড়েচড়ে উঠবে, আর সেটি দেখবার আগে নিজেই আঁকতে চেষ্টা করো না!

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিসের ফোটো

ফোটো : রবিন বিশ্বাস

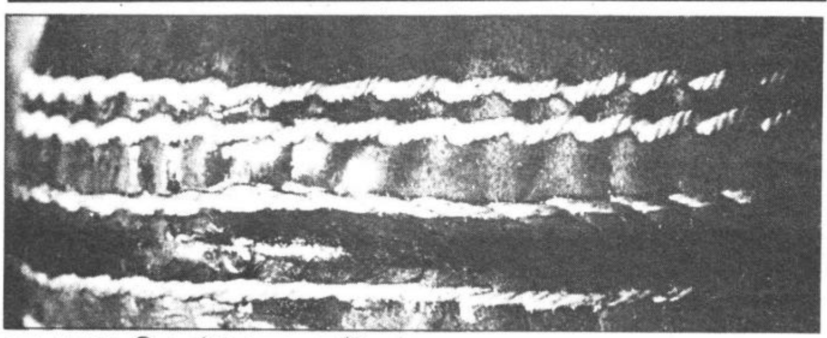

গত সংখ্যায় ছিল স্টেপলারের ফোটো

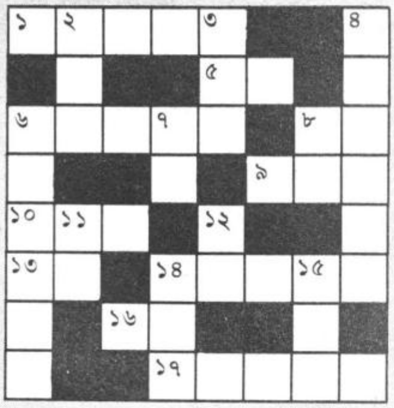

সংকেত: পাশাপাশি : (১ গান-শেখার প্রথম পাঠে যা সাধতে হয়। (৫) শাস্তি বা লাঠি। (৬) একই বস্তুর ভিন্ন রকম। (৮) যা দিয়ে জমাটি খেলা, তা-ই দিয়েই আবার মজার ম্যাজিক। (৯) হাজির হবার হুকুম। (১০) বৃক্ষবিশেষ। (১৩) লোক, আবার লোক-এর লেজুড়। (১৪) সপ্তাহের প্রথম দিন। (১৬) ধান। (১৭) প্রধান সরকারি দফতর থাকে এই বাড়িতে।

উপর-নীচ : (২) রক্ষাকর্তা। (৩) শূন্য স্থান পূরণ : গুণী বোঝে গুণীর —। (৪) নবাব-বাদশাদের আমলে জায়গিরপ্রাপ্ত সেনাপতিদের উপাধিবিশেষ। (৬) পঁচিশ বছর পূর্তিতে যে-উৎসব হয়। (৭) শেয়াল। (৮) রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কোন্ গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে? (১১) উৎকর্ষ বা অপকর্ষের পরিমাণ। (১২) পুরাণের দানশীল রাজা। (১৪) পরম করুণাময়। (১৫) দেশভ্রমণ।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

মৃ	গ	শি	রা		ফু	লে	ল
গ		বি			র		বে
য়া		কা	লি	দা	স		জা
	পি		চু		ত	প	ন
বা	লু	কা		টো		রি	
হা		না	গ	পা	শ		হ
দু		কা			ব		রি
র	প্তা	নি		প	রী	ক্ষি	ৎ

রঞ্জন

গোমুখাসন

পায়ের উপর পা তুলে হাঁটু মুড়ে এমনভাবে বসতে হবে, যেন গোমুখাকৃতি মনে হয়। এই বিশেষ ভঙ্গির আসনটির নামই গোমুখাসন।

অনুশীলনবিধি : সামনের দিকে পা দুটি ছড়িয়ে দিয়ে মাটিতে বোসো, এবার প্রথমে ডান পা'টিকে দু'হাতের সাহায্যে হাঁটুর কাছে মুড়ে বাঁ পায়ের উপর ওপর দিয়ে টেনে এনে ডান পায়ের গোড়ালিটিকে বাঁ পায়ের নিতম্বের পাশে ঠেকিয়ে দাও। ডান পায়ের কব্জিটি মাটিতে লেগে থাকবে। তারপর শরীরটাকে একটু পেছন দিকে হেলিয়ে নিয়ে বাঁ পা'কে হাঁটুর কাছ থেকে মুড়ে মাটির উপর দিয়ে ঘষে টেনে এনে বাঁ পায়ের গোড়ালিটিকে ডান পায়ের নিতম্বের পাশে আনতে হবে। বাঁ পায়ের সমস্তটা মাটিতে ঠেকে থাকবে। এবার দ্যাখো, বাঁ হাঁটু ঠিক ডান হাঁটুর তলায় এসে গেছে। এবার বাঁ হাতটিকে পেছনে পিঠের ওপর এমনভাবে আনতে হবে যাতে বাঁ হাতের আঙুলগুলি উপরের দিকে ফেরানো অবস্থায় থাকে এবং হাতের তালুর পেছন দিকটা পিঠের সঙ্গে লেগে থাকে। এবার ডান হাতটিকে ওপরে উঁচু করে কানের পাশে নিয়ে গিয়ে কনুইয়ের কাছে মুড়ে ডান হাতের তালুটিকে পিঠের ওপর নিয়ে এসো। এবং ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেইভাবে ডান হাতের আঙুল দিয়ে বাঁ হাতের আঙুলগুলিকে আটকে ধরো। তা হলে ডান হাতের কনুইটি উপরের দিকে ফেরানো থাকবে। দেখো, তোমার শরীর যেন পেছনে অথবা পাশে হেলে না যায়। এভাবে মেরুদণ্ড ও ঘাড় সোজা করে ৩০ সেকেন্ড ধরে বসে আসনটি করতে হবে।

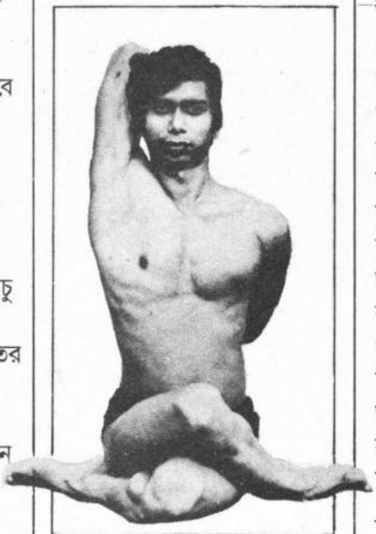

শ্বাস-প্রশ্বাস সরল ও স্বাভাবিক থাকবে। দ্বিতীয়বার আসনটি করবার সময় পা এবং হাত দুটির অবস্থান অদল-বদল হয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রথমবারে যে হাঁটুটি ওপরে ছিল সেটি এবার নীচে আসবে, আর নীচেরটি যাবে উপরে। আর-একটা জিনিস খেয়াল রেখো, যে পা ওপরে থাকবে, সেই দিকের হাতটিও ওপরে উঠবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে একবার ডান পা, তারপর বাঁ পা এরকম করে মোট ডান পায়ে দু'বার ও বাঁ পায়ে দু'বার আসনটি করতে হবে। তবে প্রত্যেক পায়ে প্রত্যেকবার করার পর একবার করে শবাসনে শুয়ে ৩০ সেকেন্ড করে অবশ্যই বিশ্রাম নেবে। কয়েক দিন অভ্যাসের পর ক্রমশ সময় বাড়িয়ে আসনটি ১ মিনিট পর্যন্ত সময় দিয়ে করতে পারো।

বিশ্বনাথ ঘোষ
প্রেমসুন্দর দাস

ফোটো : দিব্যসুন্দর দাস

অনুষ্ঠান

একটি সুন্দর নাচের আসর

সম্প্রতি কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে 'স্পেকট্রাম, '৮৬ হয়ে গেল। অশোক হল, এম· বি· গার্লস হাইস্কুল ও মহাদেবী বিড়লা শিশুবিহার স্কুলের ছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি হাই কমিশনার অভ ব্রিটিশ কাউন্সিল মিঃ ডোবেল।

প্রথমেই অশোক হলের সাদা ও গেরুয়া পোশাক পরা ছোট্ট মেয়েরা নাচের মাধ্যমে সরস্বতী ও গণেশকে প্রণাম জানাল। এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে স্তোত্রপাঠের মধ্য দিয়ে তারা প্রার্থনা জানাল মানুষের ভাল হোক, কল্যাণ হোক, হিংসা দ্বেষ বৈষম্য ঘুচে গিয়ে পৃথিবীতে শান্তি নেমে আসুক।

পরের নাচটি এম. বি. গার্লসের বাচ্চা মেয়েরা পরিবেশন করল। নাচটির নাম গ্রামের মেলা।

ছেলে-মেয়েদের নাচ, হইচই আনন্দ, কলরব আর পাখির ডাকে মুখরিত স্টেজটিকে সত্যিই মনে হচ্ছিল যেন আনন্দের হাট বসে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশতম জন্মদিন উপলক্ষে অশোক হল টালিগঞ্জের মেয়েরা রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে নাচল ছয় ঋতুর নাচ।

যখন 'আজি কমল মুকুল দল ফুটিল' গানের সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠছিল হাজার হাজার গোলাপি ফুল, তখন দেখতে ভারী ভাল লাগছিল।

মহাদেবী বিড়লা শিশুবিহার স্কুলের মেয়েরা পরিবেশন করেছিল মৌমাছির নাচ। একদল মৌমাছি গুনগুন করে ফুলের মধু খাচ্ছিল, এমন সময় তেড়ে এল এক ভালুক। মৌমাছিরা ভয়ে জড়োসড়, কিন্তু রানি মৌমাছি দমবার পাত্রী নয়। সেই এগিয়ে এসে হাল ধরল। এবার মানুষ মৌমাছিদের তাড়া করল। কিন্তু মৌমাছিরা আর হারল না। দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল মানুষের ওপর। একতাই যে শ্রেষ্ঠ বল, খুদে মেয়েরা এই সুন্দর নাচের মাধ্যমে তা জানিয়ে দিল।

নাগারা যোদ্ধার জাত। বন্য পশু শিকার করে খায়। শিকারে সফল হলে নাগারা খুব খুশি হয়। নাগা নাচের মধ্য দিয়ে এই বক্তব্য ফুটিয়ে তুলেছিল অশোক হলের মেয়েরা।

'সাউন্ড অভ মিউজিকের' বিখ্যাত গান 'সো লঙ ফেয়ার ওয়েলের' তালে তালে ড্রিল করে অনুষ্ঠান শেষ হল। ড্রিলের মাধ্যমে মেয়েরা লিখল 'ফেয়ার ওয়েল'। এই অপূর্ব ড্রিল পরিবেশন করেছিল অশোক হলের ছাত্রীরা।

এই পরিচ্ছন্ন. সুন্দর নাচের আসরে অংশ নিয়েছিল তিন হাজার পাঁচশো জন ছাত্রী।

শোভনা মুখোপাধ্যায়

ফোটো : অশোক মজুমদার

স্টার ওয়ারস
লেখা : আর্চি গুডউইন ছবি : আল উইলিয়ামসন
ছবি কাটো, খাতায় সাঁটো
সি' বিল ডাইনি
বহুকাল আগে, 'স্টার ওঅরস' ও পাল্টা আঘাতের ঘটনার মাঝামাঝি কোনও সময়ে, সুদূর এক নক্ষত্রলোকে…
…লুক, হান ও চিউইবাক্কা এক অ্যাডভেঞ্চার থেকে সরাসরি আর এক অ্যাডভেঞ্চারে গিয়ে পড়ছে !
দস্যু রাস্কারের সঙ্গে যখন আমাদের ব্যাপার-স্যাপার ভালভাবেই মিটে যাচ্ছে…
আমি এটা বিশ্বাস করি না…
…ধনরত্নলোভী এই দস্যুদল ওর মহাকাশযানটি দখল করে নিচ্ছিল !
রত্নলোভী যে দস্যুকে তুমি প্রায় খতম করতে চলেছিলে, তার কাছ থেকে সাহায্যের ব্যাপারটা বিশ্বাস হয়, সোলো ?
সহজ ব্যাপার, স্কর… ! এটা ববা ফেট-এর কাজ । সে চায় সোলোকে যেন জ্যান্ত ধরে আনা হয় ! যেন ওর গায়ে আঁচড়টি না লাগে !
আমি জলজ্যান্ত ধরে আনতে রাজি হয়েছি… বাকিটা বোনাস !
1-1-84

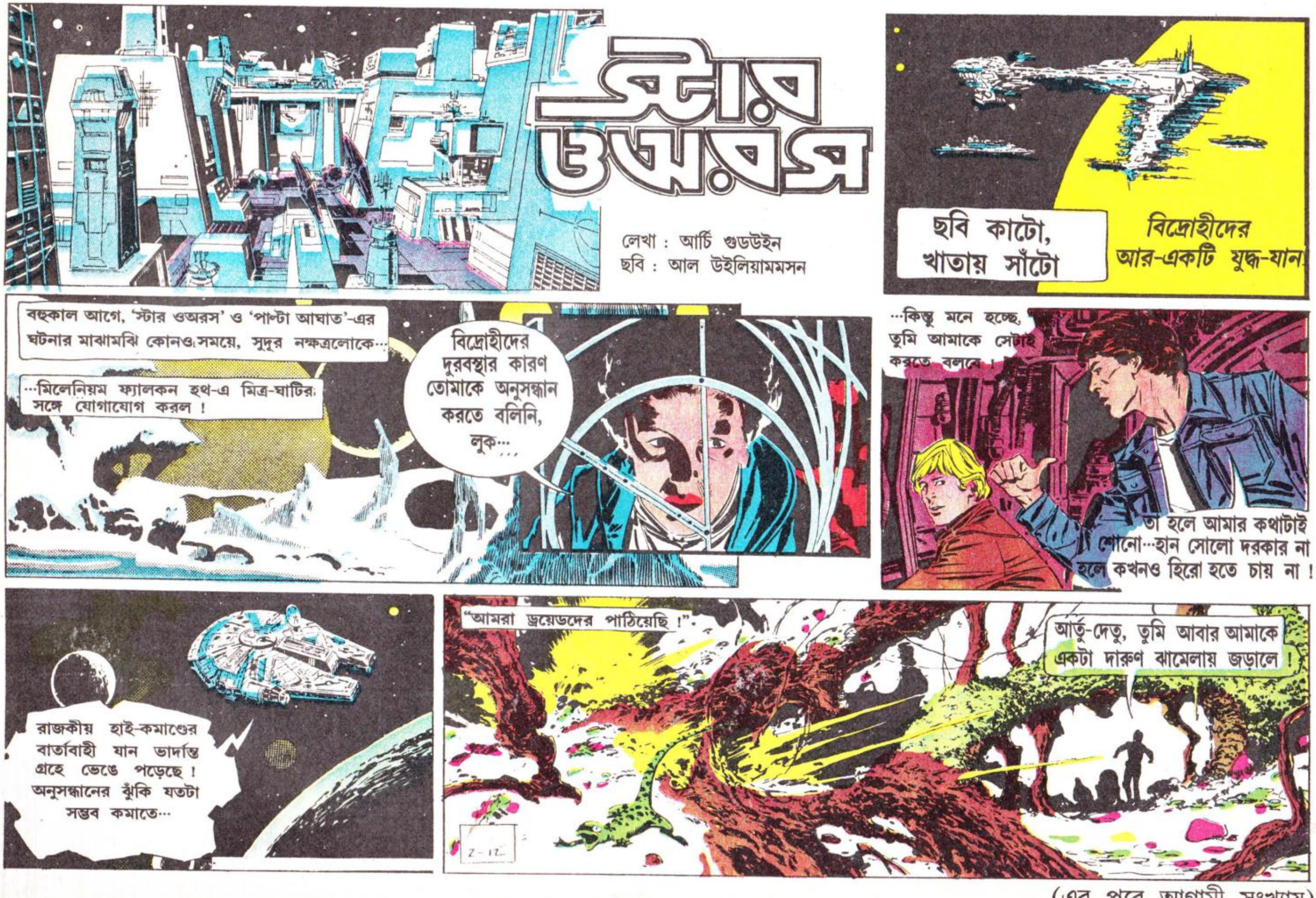

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

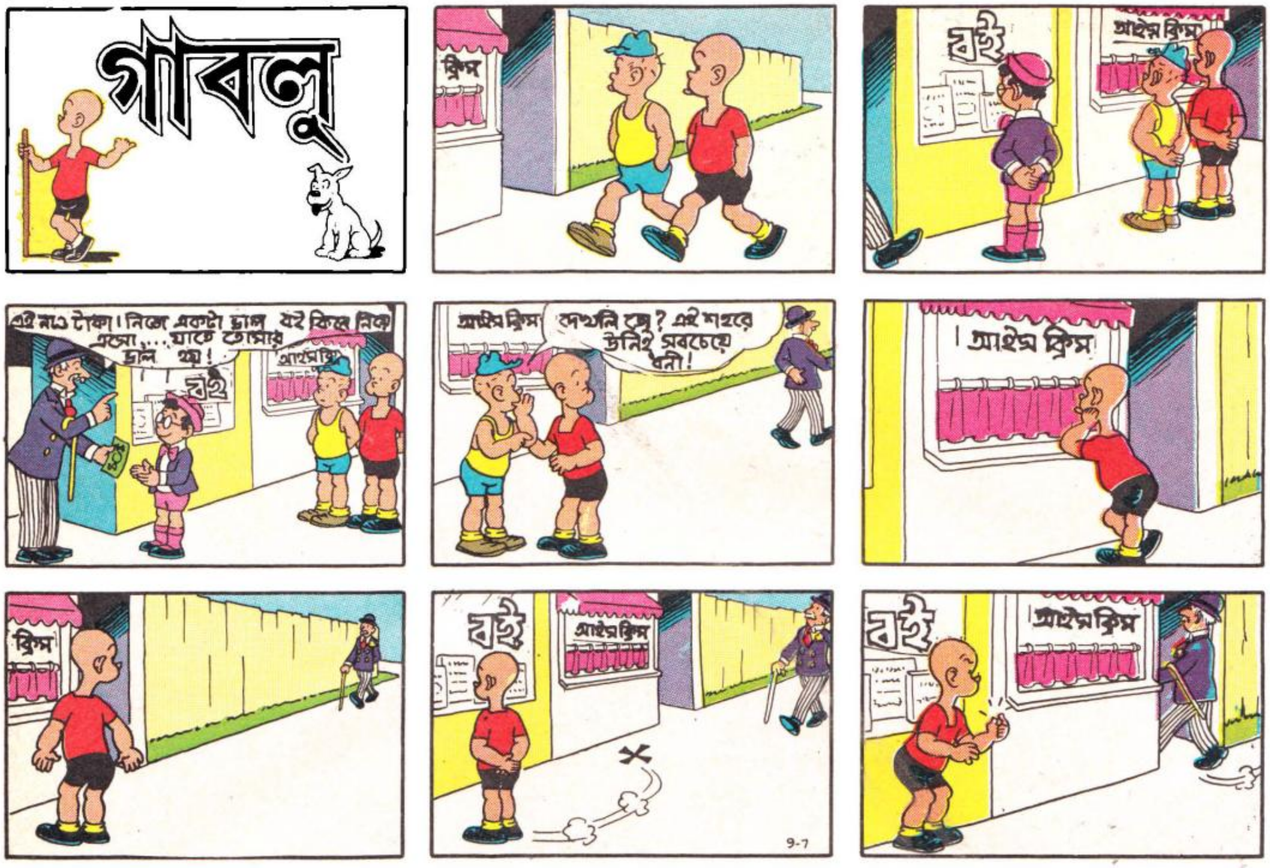
গাবলু
ক্রিম
বই
আইসক্রিম
এই নাও টাকা। নিজে একটা ভাল বই কিনে নিয়ে এসো.... যাতে তোমার ভাল হয়!
দেখলি বন্ধু? এই শহরে উনিই সবচেয়ে ধনী!
আইসক্রিম
9-7

গাবলু
9-14

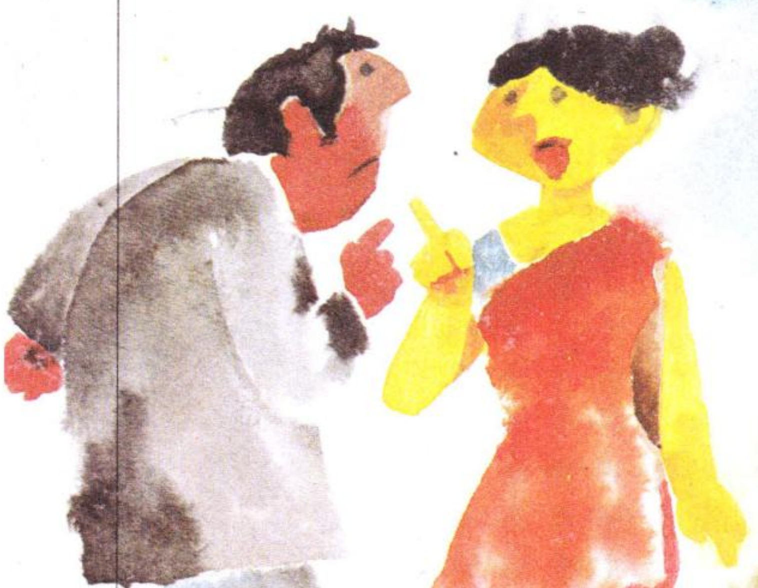

টঙ্গোর ক্যালকেশিয়ান

শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

পড়তে পড়তে সবে একটু তন্দ্রামতন এসেছে তপুর, এমন সময় ফের সেই পাশের বাড়ির কুকুরটার ঘেউ-ঘেউ। লাল হয়ে আসা চোখ মুহূর্তে আরও লাল হল তার। ঘড়ঘড় করে চেয়ারটা ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েই দরজার কাছে গিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, "মা, যখন-তখন কুকুরটা এমন ষাঁড়ের মতো চেঁচালে কি পরীক্ষার পড়া হয় ? তোমরা কিছু বলবেও না, কিছু না।"

মা নিচু গলায় রান্নাঘর থেকে বললেন, "কী করবি বল। অবলা জীব, বলা তো যায় না কিছু। হয়তো অন্ধকারে কোনও ছায়া-টায়া নড়ে উঠেছে, তাই দেখে অমন আচমকা চেঁচিয়ে উঠেছে।"

কিন্তু তিনি ভাল করেই জানেন, ব্যাপারটা তা নয়। কুকুরকে উশকে দেয় তার রক্ষাকর্তা। গিন্নির একপাল বেড়াল নিয়ে সংসার।

উঠোন, বারান্দা, ঘর, বিছানা, ঠাকুরঘর সর্বত্র তাদের অবাধ গতিবিধি। সারাদিন-রাত মিঁউ-মিঁউ ম্যাও-ম্যাও লেগেই আছে, তার ওপর আছে ঘাড়-গলা-লেজ সর্বাঙ্গের রোম ফুলিয়ে দীর্ঘস্থায়ী ঝগড়া। কান ঝালাপালা হবার জোগাড়। শুধু কি তাতেই রেহাই আছে? সুযোগ পেলেই এ-বাড়িতে হামলা। চুরি করে এটা-ওটা খাওয়া তো আছেই, তার ওপর আবার বড় উৎপাত উঠোন, সিঁড়ি, ছাদ, এমনকী ঘর পর্যন্ত নোংরা করে যাওয়া। কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই, বেশি বললেই ঝগড়া।

ওদিকে কর্তাটির আবার বেড়াল দু'চক্ষের বিষ। ধারেকাছে পেলেই তিনি তেড়ে ফুটবলের কিক ঝাড়েন। তাই নিয়ে ঝগড়া, অশান্তি। নিঃসন্তান দম্পতির মধ্যে যেদিন তাই নিয়ে লাগে, সেদিন ছোটখাটো কুরুক্ষেত্র ঘটে যায়। তখন পাড়ার লোকদের গিয়ে তা থামাতে হয়।

তারপরেই একদিন সন্ধেবেলা দেখা গেল হরিবাবু একটি সদ্য-কৈশোর পেরোনো কুকুরকে হিড়হিড় করে টেনে আনছেন বাড়ির দিকে। মুখে একগাল হাসি। রসময়বাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই পুলকিত হয়ে বললেন, "নিয়ে এলুম ব্যাটাকে উটরাম ঘাট থেকে কিনে। দেখাশুনো করতে হবে কিন্তু আপনার তপুকেই।"

কিন্তু তখন কি এ-বাড়ির লোক জানত যে, এ-কুকুর আনার উদ্দেশ্য অন্য, নিজের গৃহিণীকে টিট করা?

সে রাত্রে এ-বাড়ি থাক, পাড়ার কাছের দূরের কোনও বাড়ির লোকই দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি মুহূর্তের জন্য। এদিকে কুকুরটার চিৎকার, ওদিকে একপাল বেড়ালের মড়াকান্না আর হুটোপাটি। তার সঙ্গে গিন্নির হুঙ্কার, কর্তার হোহো হাসি। সে-এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার।

পরদিন সকালে তাই নিয়ে নরম কণ্ঠে রসময়বাবু কিছু বলতে চেষ্টা করতেই হরিবাবু সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে সগৌরবে বললেন, "আরে মশাই, এ কি আর যে-সে কুকুর পেয়েছেন? এ হচ্ছে খাঁটি ক্যালকেশিয়ান কুকুর। ওর বাপ-পিতামহ হচ্ছে আফ্রিকার টঙ্গো রাজার বডি-গার্ড। রাজাকে রক্ষা করা থেকে শত্রুর সঙ্গে লড়াই পর্যন্ত করত এরা। যেমন দুঃসাহসী, তেমনি ফেথফুল। আর ওদের মা'র দেশ হচ্ছে উটোপা। তা হলেই বুঝতে পারছেন কীরকম উচ্চ বংশ। সবেই জাহাজ থেকে নেমেছে। আমিও মওকা বুঝে দরদস্তুর না করেই নিয়ে এসেছি। অ্যালসেশিয়ান, গ্রেহাউন্ড, ভুটিয়া কুকুর এর কাছে কোথায় লাগে। আর সাহস কাকে বলে! তেমন তেজ দেখালে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাবে।"

কিন্তু ক'দিন যেতে না যেতেই পাড়ার লোকের বিস্ময় কেটে গেল। আগে বেড়ালগুলি, বাড়িতে একটা কাকাতুয়া ছিল, তার সঙ্গে দলবদ্ধভাবে ঝগড়া করত, কাকাতুয়াটাকে একদিন থাবা দিয়ে মেরে ফেলার পর সেই ঝগড়া থেমেছিল, এবার শুরু হল কুকুরটার সঙ্গে।

প্রথম-প্রথম পাড়ার লোক তাই নিয়ে অনুনয়-বিনয় করত, তারপর ঝগড়া। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু শিয়রে বিপদ তপুদের। মাঝে একটা দেওয়াল রেখে এপাশে-ওপাশে বাড়ি, ও-বাড়ির দেওয়াল-ঘড়িতে ঘন্টা বাজলে মনে হবে এ-বাড়িতে বাজছে, ও-বাড়িতে ফোঁস করলে এ-বাড়িতে তার শেষ রেশটুকু পর্যন্ত স্পষ্ট শোনা যায়। তপুর আবার বড় ঝামেলা, তার জানলার মুখোমুখি ও-বাড়ির বড় ঘরের জানলা। মাঝে বড়জোর দু'হাত দু'হাত চার হাতের ব্যবধান।

তপু বলল, "ব্যাটা দিলে আমার পরীক্ষার পড়ার বারোটা বাজিয়ে। ভূগোলটা একদমই মুখস্থ হয়নি। অথচ ক'দিন বাদেই পরীক্ষা।"

তপু বলল বটে, কিন্তু সে ভাল করেই জানে, ভূগোল নয়, ভূগোল বইয়ের আড়ালে সে 'কাউন্ট অব মন্টেক্রিস্টো' পড়ছিল। সেই বই পড়তে পড়তেই কখন তার দু'চোখের পাতা বুজে এসেছিল।

সেদিন রাত্রে খেতে বসে রসময়বাবুর উদ্দেশে তপুর মা বললেন, "তুমি এবার একটু কড়া হও। নইলে তো ছেলেটার পরীক্ষা-টরিক্ষা সব মাথায় উঠবে। কাল তুমি হরিবাবুকে কুকুরটার একটা কিছু গতি করতে বলো। এদিকে সারা দিনরাত বেড়ালগুলোর অলক্ষুনে মড়াকান্না, ওদিকে নেড়িকুত্তাটার খ্যাঁকখেঁকানি। জ্বলে গেলাম।"

রসময়বাবু রসিকতা করে বললেন, "নেড়িকুত্তা-নেড়িকুত্তা কোরো না, খাস টঙ্গো রাজার বডিগার্ডের বংশধর। হরিবাবু বলেছেন, ক্যালকেশিয়ান নাম হলেও আসলে বিলিতি কুকুর।"

তপুর মা তাই শুনে বললেন, "তবু যদি কুকুর না চিনতুম। আমাদের দেশের বাড়ির বাঘাও এই কুকুরটার চেয়ে ভদ্র আর সাহসী।"

রসময়বাবু ফের রসিকতা করে বললেন, "ওইজন্যেই তো হরিবাবুদের সঙ্গে তোমাদের বনিবনা হয় না। সব ব্যাপারেই তোমরা ভাল।"

সেদিন রাত্রে তপুর মেজাজ গরম হয়েই রইল। সবে বইটা শুরু করেছিল। কাল সকালেই স্কুলে নিয়ে যেতে হবে যার বই তাকে ফেরত দেবার জন্যে।

এক সময় রাগের মাথায় ইচ্ছে হল, দেওয়াল টপকে ওপারে গিয়ে কুকুরটার গলা টিপে দিয়ে আসে। অবশ্য তাতে বিপদ আছে সে জানে। গলা যে টিপতেই পারবে, তার তো নিশ্চয়তা নেই। তার আগে কুকুরটাই হয়তো তাকে কামড়ে দেবে। তখন আবার আরেক বিপদ। চোদ্দটা ইনজেকশন নাও, অথবা ওঝা ডেকে এনে বিষ ঝাড়াও। তার ওপর কুকুরটার সঙ্গে তার আদৌ বনিবনা নেই। একদিন বারান্দায় পেয়ে লাথি কষাতে গিয়ে নিজেই পায়ে চোট খেয়েছে। সেই থেকে তাকে দেখলেই কুকুরটা কেমন গরগর করে ওঠে।

শেষ পর্যন্ত তপু ঠিক করল, ন'মামাকে অফিসে ফোন করে ব্যাপারটা বলবে। জব্দ করার ব্যাপারে ন'মামা মাস্টার।

পরদিন স্কুলের টিফিনের সময় পোস্ট অফিস থেকে ফোন করে ন'মামাকে বলল, "খুব জরুরি দরকার। তুমি একবার অবিশ্যি-অবিশ্যি অফিস ছুটির পর আমাদের বাড়ি আসবে।"

কিন্তু তপু স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই অবাক। নসুমামা তার আগেই কখন এসে গেছেন। চা খেতে-খেতে চেয়ারে হাত-পা গুটিয়ে বসে মা'র সঙ্গে গল্প করছেন।

তাকে দেখেই বললেন, "কী ব্যাপার ভাগিনেয়। মা তো কিছুই জানে না ফোনের কথা। তোমার আবার এমনকী দরকার পড়ল যে, জরুরি ফোন করে আমাকে ডেকে আনতে হল?"

নসুমামাকে দেখেই পুলক দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল তপুর। বলল, "উঃ মামা, তুমি এসে গেছ? এইবার হরিবাবুকে উচিত শিক্ষা দেব।"

সব শুনেটুনে নসুমামা বললেন, "এই ব্যাপার! কালকের দিনটা অপেক্ষা কর। পরশু আমি আসছি। দিদি, আমার জন্যে চাট্টি চাল নিবি। দু'বেলা খাব। পর দিন এখান থেকেই অফিসে যাব।"

তপু বলল, "কুকুরটাকে তুমি একবার দেখবে না? নইলে কী করে শায়েস্তা করবে?"

নসুমামা বললেন, "গলা শুনেছি, ওতেই হবে। ব্যাটা মদ্দা কুকুর। আর কিছু জানবার দরকার নেই।"

পরশু নয়, পরদিনই নসুমামা সন্ধেবেলা এলেন। সঙ্গে একটা টেপ-রেকর্ডার। বললেন, "রাত্রে ওই ক্যালকেশিয়ানের চেঁচানি টেপ

করে শুনতে হবে ওটা কী বলে।"

তাই শুনে রসময়বাবু এবং তপুর মা উদ্দাম হাসলেও, তপু কিন্তু রোমাঞ্চিত হল। মামার প্রতি ভক্তিও যেন চতুর্গুণ বেড়ে গেল। ন'মামা কি কুকুরের ভাষা বুঝতে পারে ? নাকি কুকুরটার গলা শুনে সেইমতো তাকে তুকতাক করবে ?"

ন'মামা নতুন একটা ব্ল্যাঙ্ক ক্যাসেট এনেছিলেন। সেটায় প্রথমে নিজের আবৃত্তি, তপুর ছ'লাইন কাঁপা-কাঁপা ইংরেজি পড়া, রসময়বাবুর চটুল লেকচার এবং সবশেষে তপুর মা'র উদ্দাম হাসি টেপ করে সবাইকে সেটা বাজিয়ে শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়ে বললেন, "রাত্রে খেয়েদেয়ে শোবার আগে কুকুরটার ভিতু গলার স্বর টেপ করে রাখব। তারপর আর-সব কাজ কাল দুপুরে।"

সে রাত্রে তাই হল, খাওয়াদাওয়ার পর চারদিক একটু নিস্তব্ধ হয়ে আসতে তপুর পড়ার ঘরের জানলার পাশে ও-বাড়ির কুকুরটার প্রায় মুখোমুখি ঘাপটি মেরে বসে সারমেয় জীবটির বিভিন্ন সুরের চেঁচানি টেপ করা শেষ করে নসুমামা শিস দিতে-দিতে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন একটু বেলা করে উঠেই দিদিকে ব্যতিব্যস্ত করে প্রথমে চা-জলখাবার, পরে চান-টান সেরে দুপুরের খাওয়া খেলেন কি খেলেন না, টেপ-রেকর্ডার ও তপুকে বগলদাবা করে বেরিয়ে পড়লেন। পথে নেমে বললেন, "চ, প্রথমে যাব ডগ-রেসকোর্সে। আজ ওখানে ডগ-শো আছে। নানা জাতের নানা রাজ্যের দিশি বিলিতি কুকুরের রেস আর কম্পিটিশন হবে ওখানে। খবরের কাগজ তো পড়িস না, কেবল বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে-লুকিয়ে ছাই-পাঁশ নবেল পড়িস। এসব জানবি কী করে!"

তপু লজ্জা পেয়ে শুধু বলল, "যাঃ, যতসব বাজে কথা। পড়ার বইও পড়ি।"

সেদিন প্রথমে ডগ-রেসকোর্স, তারপর ক্রমে গড়ের মাঠ, আউটরাম ঘাটের যাযাবরদের কুকুরের আড্ডা, উত্তর দক্ষিণ মধ্য কলকাতার বস্তি, ফুটপাথ, ধাপার মাঠ, কেওড়াতলা নিমতলা শ্মশান, হাওড়ার পুলের স্ট্র্যান্ড রোডের দিকের নীচের রাস্তা, গোটাকয়েক কবরখানা গোরস্থান ইত্যাদি ঘুরে যখন বাড়ি ফিরল, তখন দু'জনেরই ঝোড়ো কাকের মতো অবস্থা।

এর মধ্যে তারা ময়দানের ঝালমুড়ি, আইসক্রিম, ফুচকা, ভেজিটেবিল চপ, ভেলপুরি, ঠাণ্ডা জিলিপি, বাদাম ভাজা খায়নি, এমন জিনিস দুর্লভ।

বাড়ি ফিরেই ন'মামা বললেন, "তুই ভাল করে হাত-পা ধো। আমি আরাম করে চান করে আসি।" বলে টাওয়েল নিয়ে শিস দিতে-দিতে বাথরুমে ঢুকে পড়লেন।

সেদিন রাত্রে, চারদিকে ফুটফুট করছিল জ্যোৎস্না। নসুমামা পরিপাটি চান করে ডিমের ডালনা দিয়ে তৃপ্তি করে ভাত-টাত খেয়ে, আড়ালে একটা পুরো সিগারেট খেয়ে, তপুর ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ করে যখন টেপ-রেকর্ডারটা নিয়ে বসলেন, তখন পাড়া প্রায় নিস্তব্ধ, জ্যোৎস্নার আলোয় তকতক করছে চারদিক।

ঘরে তখন উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে তপু, তার বাবা-মা। রসময়বাবু ঠিক উদ্‌গ্রীব নন, অনেকটা যেন মজা দেখার জন্যই ঘরে এসে বসেছেন।

নসুমামা তপুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী ভাগিনেয়, টেপ কি আমার ব্যাটারি পুড়িয়েই বাজানো হবে, না কারেন্টে। তোমার পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ তো আবার যা কৃপণ, কারেন্ট পুড়লেই বলবে, দিলে ইলেকট্রিকের বিল বাড়িয়ে।"

সেই কথা শুনে রসময়বাবু ফিকফিক করে হেসে বললেন, "তুমি কুকুর-বেড়ালের ডাক বাজাবে আর আমি তার খরচা জোগাব, এটা কেমন কথা ? তবে তোমরাই ভাই দলে ভারী, মামা-ভাগনে, তার ওপর দিদি। ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে বাধা দেব, পোড়াও কারেন্ট।"

পাশের বাড়ির বেড়ালের সম্মিলিত আওয়াজ, গৃহিণীর বেড়াল নিয়ে আদুরেপনা, হরিবাবুর কুকুরকে শাসন ও শিক্ষাদান ইত্যাকার ব্যাপার এখন অনেকটা স্তিমিত, শুধু হঠাৎ হঠাৎ কুকুরটার কিঁউ-কিঁউ কিংবা ঘেউ-ঘেউ শব্দ ভেসে আসছে।

নসুমামা বললেন, "এইবার তা হলে পরীক্ষাটা হয়ে যাক।" বলেই টেপ-রেকর্ডারটা কোলের ওপর তুলে নিলেন।

তপু বলল, "ও মামা, কারেন্টে চালাবে না ?"

নসুমামা গম্ভীর হয়ে বললেন, "পাগল হয়েছিস ভাগিনেয়। তোর বাবাকে আমি চিনি না ? আজ কিছু বলবে না, কিন্তু পরে তোর মা'কে কথা শোনাবে।" তারপর রসময়বাবুকে সে-কথার উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে কানের কাছে টেপটা তুলে সেটা চালিয়ে দিতেই আচমকা ঘরে যেন বাজ পড়ল। গঁকগঁক করে বেজে উঠল টেপটা। তার সঙ্গে উচ্চগ্রামে সম্মিলিত সারমেয় কণ্ঠের ঘেউ-ঘেউ ডাক।

তপুর মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কমা, কমা। আওয়াজে এক্ষুনি পাড়ার লোক আর কুকুরের দল তেড়ে আসবে।"

কিন্তু নসুমামার যেন সেদিকে কান নেই। টেপটা টেবিলের ওপর

রেখে তপুকে হুকুম করলেন, "দে এবার ঘরের ওদিককার জানলাটা খুলে।"

তপুর সবে একটু ঘুম-ঘুম এসেছিল। মুহূর্তে সেটা কেটে গেল। খুশিতে একটা লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে নেমে গিয়ে ও-বাড়ির দিককার জানলাটা খুলে দিল সে। আর তখনই মনে পড়ল, এগুলি ডগ-শো'র কুকুরের গলা। কুকুরগুলির যেমন ভয়ানক চেহারা, তেমনি গলার আওয়াজ।

রসময়বাবু কী বলতে যাবেন, এমন সময় টেপের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল।

তপু উৎকর্ণ হয়ে বলল, "কী হল ন'মামা?"

ন'মামা বললেন, "একটুতেই ঘাবড়ে যাস। দাঁড়া, এইবার গড়ের মাঠের সেই পালোয়ান-কুকুরটা চেঁচাবে। জানিস না, কত রকমের কুকুরের ডাক টেপে ধরা আছে? আমি তোর ওই হরিবাবুর কুকুরটাকে ভিটেমাটি ছাড়া করে তবে ছাড়ব।"

বলতে বলতেই ঘরে যেন প্রচণ্ড শব্দে আবার একটা বোমা ফাটল। গুরুগম্ভীর কণ্ঠের ঘেউ-ঘেউ শব্দে সমস্ত ঘরটা কেঁপে উঠল। সে-শব্দ আর থামতেই চায় না।

সেও মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। পরক্ষণেই পাশের বাড়িতে যেন প্রলয় কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। একঝাঁক বেড়ালের ভয়ার্ত শব্দে

লাফালাফি, দাপাদাপি, ছুটোপাটি, তাদের সামাল দেবার জন্য হরিবাবুর স্ত্রীর উৎকণ্ঠিত চিৎকার, কুকুরটার চেন-ছেঁড়া ঊর্ধ্বশ্বাস হাউ-হাউ রব, হরিবাবুর ব্যতিব্যস্ত আস্ফালন, সব মিলে সে এক হুড়োহুড়ি ব্যাপার শুরু হয়ে গেল।

আর এ-ঘরে, টেপ যত এগোচ্ছে তত কুকুরের কণ্ঠস্বর পালটাচ্ছে, ডাকের ভঙ্গি বদলাচ্ছে। তাই শুনতে-শুনতে তপুর মা-বাবা কানে আঙুল দিয়ে যত বলছেন, "টেপ থামা, টেপ থামা," তপু তত লাফাচ্ছে আর নিঃশব্দে বড়-বড় চোখ করে হাসির দমক সামলাচ্ছে।

কিন্তু নসুমামা নির্বিকার। বললেন, "থামব কী, দ্যাখোই না শেষ পর্যন্ত কী কাণ্ড হয়। সবে তো শুরু। বড্ড কুকুর-বেড়াল পোষার শখ হয়েছে।"

ও-বাড়ি তখনও হরিবাবুর গৃহিণীর আর্ত চিৎকারে মাথায় উঠেছে। করুণ সুরে তিনি বেড়ালদের ডেকে বলছেন, "বকু আয়, মেনি আয়, পুষি আয়, দ্যাখ দিকি কাণ্ড। রাত-বিরেতে কোথায় সব পালাল। অন্য দিকে কুকুরের ত্রাহি চিৎকারের সঙ্গে হরিবাবুও পাল্লা দিয়ে চেঁচাচ্ছেন, "থামবি না, জুতোপেটা করব, ভিতু কাঁহাকা।"

এইসব কথার মাঝেই এক সময় আবার একটা দুদ্দাড় শব্দ শুরু হয়ে গেল ও-বাড়িতে। তারপরেই সশব্দে বাইরের দিকের দরজা খোলার আওয়াজ, ধুপধাপ করে দেওয়ালে ধাক্কা লাগা ও মেঝেতে আছাড় খাওয়ার ভারী শব্দ হল, এবং সবশেষে বাইরের লোহার গেট খোলার ঝনঝন শব্দ।

ন'মামা এবার লাফ দিয়ে উঠে হাত বাড়িয়ে টেপের চাবি বন্ধ করে দিয়ে বললেন, "নে, কেল্লা ফতে। চ, এবার বাইরে গিয়ে দেখি কী সিনেমা হচ্ছে।"

টেপটা বন্ধ হয়ে যেতে হঠাৎই যেন ঘরটা শান্ত আর ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। তপুর মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "আঃ শান্তি। এতক্ষণ যেন ঝড় বইছিল ঘরে। নে, এবার ক্ষ্যামা দে, খুব হয়েছে। বেশি বাড়াবাড়ি ভাল নয়। এই নিয়েই কাল কত কথা শুনতে হবে।"

রসময়বাবু সেই থেকেই হাসছিলেন। হাসতে-হাসতে তাঁর মুখচোখ লাল হয়ে গেছে। বললেন, "তোমাদের আর কী। বিপদ তো আমার। হরিবাবু কাল একবার আমাকে হাতে পেলে হয়।"

কিন্তু সেসব কোনও কথায় কান দিলেন না নসুমামা। তপুকে বললেন, "চ, এবার বাইরের দৃশ্যটা দেখি। আমার মনে হয়, হরিবাবুর পেয়ারের কুকুরটা ভেগেছে। এতরকম কুকুরের হুঙ্কার, ও কি আর থাকে এ-পাড়ায়?"

কিন্তু বাইরেও একটা চরম বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তখন তাদের জন্য। তপু পরম বিস্ময়ে দেখল, হরিবাবু তাদের লোহার গেটের সামনে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে, পরনের কাপড়ের কাছাকোঁচা মাটিতে লুটোচ্ছে, দু'হাত বাড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে কী যেন বিড়বিড় করে বলছেন করুণ সুরে। একবিন্দুও বোঝা যাচ্ছে না। আর সামনে, মাঠের প্রায় শেষ প্রান্তে হরিবাবুর টঙ্গোর ক্যালকেশিয়ান কুকুরটা ক্যাঙ্গারুর মতো দাঁড়িয়ে, ভঙ্গিটা হাতজোড় করার মতো। গলার শেকলটা রুপোলি লকেটের মতো লম্বা হয়ে ঝুলে থেকে চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে।

নসুমামা বললেন, "দৃশ্যটা কীরকম, বল দিকি তপু? যেন জোড়হস্ত গরুড়। হাতজোড় করে প্রভুকে বলছে, 'খুব হয়েছে স্যার, এবার আমায় বিদায় দিন!'" বলেই, যেই প্রচণ্ড শব্দে নসুমামা বার-দুই ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠলেন, অমনি পেছনে প্রকাণ্ড একটা লাফ দিয়ে হরিবাবুর টঙ্গো-ফেরত ক্যালকেশিয়ান হাওয়া।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

সব প্রতিকূলতা জয় করেছিলেন আশুতোষ

আশুতোষের ছাত্রজীবন । সম্পাদনা : উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯ । দাম : বারো টাকা ।

এফ· এ· পরীক্ষা দিচ্ছেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । সারা বছর তাঁর কেটেছে রোগ-যন্ত্রণায় । তখনও শরীর পুরোপুরি সুস্থ নয় । তবু তাঁকে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে । পরীক্ষা চলার সময় আশুতোষ নির্ধারিত সময় পর্যন্ত লিখতে পারতেন না । প্রথম তিন ঘণ্টা লেখার পর তাঁর হাত অবশ হয়ে যেত । তাঁর পিতা গঙ্গাপ্রসাদ বাড়ি থেকে ইলেকট্রিক ব্যাটারি নিয়ে গিয়ে টিফিনের সময় আশুতোষের হাতে লাগিয়ে দিতেন । বিদ্যুৎ-প্রবাহে আশুতোষের হাতে আবার কিছুক্ষণের জন্য বল সঞ্চার হত । এভাবে পরীক্ষা দিয়েও তিনি তৃতীয় স্থানটি দখল করেছিলেন । নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও মনোবল থাকলে, বড় হওয়ার পথে সব প্রতিকূলতাই যে এক সময় জয় করা যায়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আশুতোষের জীবনী । তাঁর শরীর ছিল দুর্বল । নানা রোগে ভুগতেন । সেই সব রোগ-ব্যাধিও তিনি জয় করেছিলেন । প্রতিটি পরীক্ষায় দিয়েছিলেন কৃতিত্বের পরিচয় । সেই সঙ্গে গঠনমূলক নানা কাজেও

রেখেছিলেন নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি অন্যতম রূপকার । তাঁর জীবনী সব বয়সের পাঠককেই উদ্বুদ্ধ করবে । বিশেষ করে, ছাত্র ও ছাত্রীদের কাছে আশুতোষের ছাত্রজীবন আদর্শ ও অনুকরণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে । হয়তো এই কথা ভেবেই অতুলচন্দ্র ঘটক বেশ কয়েক বছর আগে আশুতোষের ছাত্রজীবনের কথা লিখেছিলেন । তাঁর সেই মূল বইটি অবলম্বন করেই এই পরিবর্ধিত গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছে । সম্পাদনা করেছেন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । দীনেশচন্দ্র সেন যে-ভূমিকাটি লিখেছিলেন তা এই গ্রন্থে আছে । আশুতোষ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র লিখেছিলেন : 'এই বহুকর্মচঞ্চল, অবিচ্ছিন্ন আদর্শমূলক জীবন তা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি । যে রূপ দেখিয়াছি, এরূপ ত আর দ্বিতীয়টি দেখিব না ।' আজকের ছাত্রছাত্রীরা এই বইয়ের মধ্যেই আশুতোষকে দেখতে পাবেন । চোখের সামনে থেকে যখন আদর্শব্যক্তির সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে, তখন এই বইটিই অনেকের প্রেরণা হয়ে থাকবে ।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আবিষ্কারের রোমাঞ্চ

আবিষ্কারের কাহিনী । ডাঃ বিশ্বনাথ রায় । সন্ধানী, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩ । দাম : দশ টাকা

এক-একটি আবিষ্কারের পেছনে থাকে এক-একজন মানুষের সারা জীবনের অক্লান্ত সাধনা ও অধ্যবসায় । বিজ্ঞানের ইতিহাসে আবিষ্কারের কাহিনীগুলি বেশ রোমাঞ্চকর । ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের এই 'আবিষ্কারের কাহিনী' বইটির বেশির ভাগ কাহিনীই চিকিৎসা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত ।

আমাদের সমাজে প্রথম কেমন করে তৈরি হল চিকিৎসক, ল্যাজারো স্প্যালানজানি কেমন করে জীবাণু আবিষ্কার করলেন, ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে জেম্‌স ওয়াই সিম্পসন কেমন করে অপারেশন করলেন প্রথম, কী করে কালাজ্বরের ওষুধ ইউরিয়া

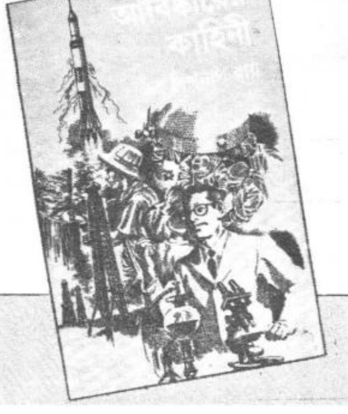

স্টিবামাইন বা ডায়াবিটিসের ওষুধ হরমোন ইনসুলিন আবিষ্কৃত হল—এরকম চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বারোটি মূল্যবান কাহিনী বলেছেন লেখক । বেশ সহজভাবে তিনি কাহিনীগুলি লিখেছেন । বাস্তব ঘটনার সঙ্গে অল্পবিস্তর দিয়েছেন কল্পনারও মিশেল । কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বারোটি আবিষ্কারের কাহিনীর সঙ্গে লেখক গুডইয়ারের রাবার তৈরির এবং পেট্রোল আবিষ্কারের কাহিনী দুটি জুড়ে দিলেন কেন ? যদিও বইটির নাম 'আবিষ্কারের কাহিনী', তবু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কাহিনীর সঙ্গে এই দুটি ভিন্ন আবিষ্কারের কাহিনী জুড়ে না দিলেই হয়তো ভাল হত ।

রতনতনু ঘাটী

সন্ধানী মানুষের এগিয়ে যাওয়ার কাহিনী

সিন্দবাদের অভিযান । অজয় চক্রবর্তী । পুথিপত্র, কলকাতা-৯ । দাম : দশ টাকা

আরব দেশে যখন খলিফা হারুন অল রসিদের রাজত্ব, সে সময় বাগদাদ শহরে বাস করত এক দরিদ্র কুলি । লোকের মোট বয়ে যার দিন চলত । সবাই জানত না তার নাম হিন্দবাদ । অথচ গল্পটা শুরু হয়েছে তাকে নিয়েই । সেই হিন্দবাদের গান শুনেই চমকে গিয়েছিলেন এক অভিজাত বৃদ্ধ । যার বিশাল প্রাসাদ আর ঐশ্বর্যের তুলনা মেলা ভার । তিনিই সিন্দবাদ । সিন্দবাদের কাহিনী জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে রহস্য সন্ধানী এবং নিরলস সংগ্রামী মানুষের এগিয়ে যাওয়ার কাহিনী ।

ছোটদের জন্যে আগেও অনেক লেখা হয়েছে আরব্য রজনীর গল্প । 'সিন্দবাদের অভিযান' সে ক্ষেত্রে নতুন প্রয়াস । কারণ, ছোটদের উপযোগী করে লেখা হলেও, বড়রাও বইটি একবার হাতে নিলে ছাড়তে পারবেন না সহজে । গল্প বলার গুণে গ্রন্থকার অজয় চক্রবর্তী অবশ্যই হাততালি পাবেন ছোটদের । প্রচ্ছদ এবং ভেতরের ছবি আরও আকর্ষণীয় হতে পারত ।

অমিয় ঘোষ

"একটুখানি খাটিয়ে মাথা জুড়ে পরের পর ওকে দিয়ে সাজিয়ে তোলো তোমার খেলাঘর!"—

ফেভি ফেয়ারী

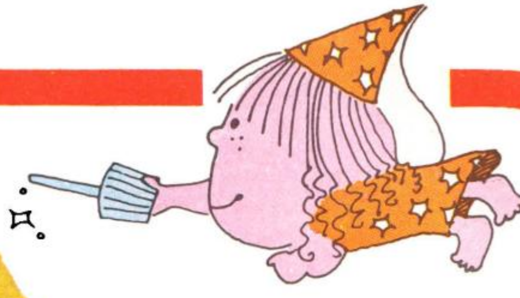

চটপট্ করতে
কোনোকিছু গড়তে
এট-ওটা সাঁটানোর
সময়টা কাটানোর
সবসেরা মজাদার
ফেভিকল **এম-আর**।
আমোদই শুধু নাই
হাত বসে যাওয়া চাই
বড় হয়ে দেখো ঠিক
হবে বড় যান্ত্রিক।
আজ শুধু মণিহারী
খেলনার রকমারি
পুতুলের ঘরদোর
বাঘা–হাতি–বান্দর
ছোটদের হাতে দাও
আলমারিতে সাজাও
টিকে যাবে বরাবর
নিখুঁত যে এর জোড়
একেবারে নয়া হয়ে
চিরকাল যাবে র'য়ে
চিরসাথী যে তোমার
ফেভিকল **এম-আর**।

বিনামূল্যে সূর্য্যমুখী ফুলগুলো কিভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে সে বিষয়ের তথ্যের জন্য এই কুপনটি পাঠাও অথবা এই ঠিকানায় লেখো: "ফেভি ফেয়ারী", পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০।

বিনামূল্যে সূর্য্যমুখী ফুলগুলো কিভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে সে বিষয়ের তথ্যের জন্য কুপনটি এই ঠিকানায় পাঠাও: "ফেভি-ফেয়ারী", পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০।

নাম: ______
বয়স: ______
ঠিকানা: ______
শহর: ______
রাজ্য: ______ পিনকোড: ______

তুমি কি আমাদের ফেভিক্র্যাফট্ পত্রিকাটি পেয়েছো? হাঁ/না

ফেভিকল এম-আর
সিন্থেটিক অ্যাডহীসিভ

সেরা জিনিষ গড়তে চাও সেরাটি দিয়েই জুড়ে নাও

® এইটি ও **ফেভিকল** ব্র্যাণ্ড, এই দুটিই পিডিলাইট ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রাঃ লিঃ, বোম্বাই-৪০০ ০২১-র রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

OBM-8527 BN

ANANDAMELA 4 FEBRUARY 1987 REGD. NO. WB/CC/264. MH [illegible] TH 683 TN/MS(C)/[illegible]

স্ন্যাক্‌স-এ কী রকম স্বাদ আপনার পছন্দ ?

টক-মিষ্টি?

কিসান টম্যাটো সস্‌* । রসালো টম্যাটোর টকমিষ্টি এ এক আলাদা নতুন স্বাদ! পেঁয়াজ-রসুন দেওয়া নেই। গরম গরম সিঙ্গারা ও পাকোড়া তো বটেই—বড়া, ইডলি বা দোসার সঙ্গে যা জমে-না, কী বলব!

ঝাঁঝ-ঝাঁঝ?

কিসান টম্যাটো কেচাপ*। স্যান্ডউইচ, বার্গার বা হট ডগ, যা মন চায় নিয়ে বসুন। মিশিয়ে নিন চনমনে স্বাদের এই চমৎকার কেচাপ। আহ্‌—কী অপূর্ব স্বাদ। বলে বোঝানো যায় না।

ঝাল-ঝাল?

কিসান টম্যাটো চিলি সস্‌। লঙ্কার স্বাদে-গুণে টইটম্বুর। যখন মন বলছে একটু ঝাল-ঝাল খাবার হলে বেশ জমতো তখন চীনে স্ন্যাকস, খাবার অথবা দিশি রান্নার সঙ্গে মিশিয়ে নিন। দেখুন, কী দারুণ লাগে!

মশলাদার?

কিসান টম্যাটো গার্লিক সস্‌। আহ্‌—রসুনের সেই খোশবু। প্রতিটি খাবার করে এত মুখরোচক যে চেটেপুটে খেতে ইচ্ছে হয়। বিশেষ করে ককটেল মেনু হলে তো কথাই নেই-কাবাব, চিজ, টোস্ট বা অন্যকিছু-সবেতেই দারুণ!

সব সময় সবার পছন্দ!

Kissan

* এখন নতুন "দারুণ-দেখতে" লেবেলে।

OBM 2484 Ben